সাহিত্যকথা

উচ্চ মাধ্যমিক বাংলা সাহিত্য সংকলন

বাংলা খ । একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণি

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আর্থিক আনুকূল্যে একাদশ শ্রেণির (বাংলা দ্বিতীয় ভাষা-খ) ছাত্র-ছাত্রীদের বিনামূল্যে বিতরণের জন্য। বিক্রয়যোগ্য নয়।

পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ

প্রথম উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ সংস্করণ
এপ্রিল, ২০১৬

প্রকাশক
অধ্যাপক সুব্রত ঘোষ
সচিব, পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ

মুদ্রক
ওয়েস্ট বেঙ্গল টেক্সট বুক কর্পোরেশন লিমিটেড
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগ)

सत्यमेव जयते

ভারতের সংবিধান

প্রস্তাবনা

আমরা, ভারতের জনগণ, ভারতকে **সার্বভৌম, সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক, সাধারণতন্ত্র** রূপে গড়ে তুলতে এবং তার সকল নাগরিকই যাতে **সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায়বিচার, চিন্তা, মতপ্রকাশ, বিশ্বাস, ধর্ম** এবং **উপাসনার স্বাধীনতা; সামাজিক প্রতিষ্ঠা অর্জন ও সুযোগের সমতা প্রতিষ্ঠা** এবং তাদের সকলের মধ্যে **ব্যক্তির মর্যাদা** এবং **জাতীয় ঐক্য ও সংহতি** সুনিশ্চিতকরণের মাধ্যমে তাদের মধ্যে যাতে **ভ্রাতৃত্বের ভাব,** গড়ে ওঠে তার জন্য সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে শপথ গ্রহণ করে, **আমাদের গণপরিষদে,** আজ, ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর, এতদ্দ্বারা এই **সংবিধান গ্রহণ, বিধিবদ্ধ** এবং **নিজেদের অর্পণ** করছি।

THE CONSTITUTION OF INDIA

PREAMBLE

WE, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a **SOVEREIGN SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC REPUBLIC AND TO SECURE TO ALL ITS CITIZENS :**

JUSTICE, social, economic and political;

LIBERTY of thought, expression, belief, faith and worship;
EQUALITY of status and of opportunity and to promote among them all;

FRATERNITY assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the Nation;

IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY this twenty-sixth day of November 1949, do **HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVE TO OURSELVES THIS CONSTITUTION.**

মুখবন্ধ

পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যালয় শিক্ষাদপ্তরের 'বিশেষজ্ঞ কমিটি'-কর্তৃক নির্মিত এবং পশ্চিমবঙ্গ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ প্রকাশিত 'সাহিত্যকথা' সংকলনটি নবকলেবরে পরিবেশন করা হল। একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য নির্মিত এই সংকলনটি বাংলা দ্বিতীয় ভাষা (খ)-এর পাঠ্যপুস্তক। নতুন পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি অনুযায়ী প্রকাশিত 'সাহিত্যকথা' সংকলনটির মূল উদ্দেশ্য হল বর্তমান প্রজন্মের ছাত্র-ছাত্রীদের বাংলা সাহিত্যের সমৃদ্ধ ভাণ্ডারের সঙ্গে পরিচয় করানো। আমাদের সেই উদ্দেশ্য কিছুটা হলেও সফল হয়েছে। একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীরা এই সংকলনের মাধ্যমে শুধু বাংলা সাহিত্যই নয়, ভারতীয় এবং আন্তর্জাতিক সাহিত্যেরও আস্বাদ পাচ্ছে। এখানে গতানুগতিকতা বা একঘেয়েমি এড়াতে বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যের দিকে লক্ষ রাখা হয়েছে। একই মলাটের মধ্যে আনা হয়েছে সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা অর্থাৎ গদ্য, পদ্য, প্রবন্ধ, বড়ো গল্প ইত্যাদি।

মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ড. পার্থ চ্যাটার্জীর উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষাদপ্তরের অনুদানে এই বইটি ২০১৬ সাল থেকে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করা হবে।

সংকলনটিতে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির বানানবিধি অনুসৃত হয়েছে। সংকলনটি প্রকাশে যাঁরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সাহায্য করেছেন তাঁদের প্রত্যেককে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

এপ্রিল, ২০১৬
বিদ্যাসাগর ভবন

ড. মহুয়া দাস
সভাপতি
পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ

প্র স্তা ব না

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে গঠিত বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের ‘বিশেষজ্ঞ কমিটি’ এবং উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাসংসদের যৌথ প্রচেষ্টায় নির্মিত এবং রাজ্য সরকার দ্বারা অনুমোদিত ‘বাংলা : দ্বিতীয় ভাষা’ পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি অনুযায়ী একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির জন্য নির্বাচিত গদ্য, প্রবন্ধ, কবিতা ও নাটক ইত্যাদির সংকলন প্রকাশিত হল।

বাংলা সাহিত্যের বিপুল বৈচিত্র্যের প্রতিফলনের পাশাপাশি ভারতের অন্যান্য ভাষাসাহিত্য ও আন্তর্জাতিক সাহিত্যের বিষয়ও এ সংকলনে স্থান পেয়েছে। একই সঙ্গে রয়েছে পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ হিসেবে পাঠ্য ‘রবীন্দ্রনাথের গল্প’। ছাত্রছাত্রীদের বয়সের কথা মাথায় রেখে জোর দেওয়া হয়েছে আধুনিকতম সাহিত্যের উপর, কিন্তু তা বাংলা সাহিত্যের ঐতিহ্যকে ভুলে নয়।

সম্পূর্ণ নতুন ‘সাহিত্যকথা’ সংকলনটির সঙ্গে প্রশ্নকাঠামো আর নম্বর বিভাজনেও এসেছে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন। শুরু হয়েছে প্রকল্প রচনার অভ্যাস। ২০১৩ সাল থেকে এই নতুন পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যবই শ্রেণিকক্ষে প্রযুক্ত হওয়ার পর থেকে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে দ্বিতীয় ভাষা বাংলার ক্ষেত্রে কিছু ইতিবাচক পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। এই পরিবর্তনকে আরো গভীরতর ও সর্বাঙ্গীন করার লক্ষ্যে রাজ্য সরকার এই বইটি ছাত্রছাত্রীদের কাছে বিনামূল্যে পৌঁছে দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে। এই প্রয়াসের জন্য রাজ্য সরকারের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ড. পার্থ চ্যাটার্জীর কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। কৃতজ্ঞতা জানাই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিদ্যালয়ের শিক্ষা দপ্তরকেও।

‘সাহিত্যকথা’ সংকলনটি প্রকাশের ক্ষেত্রে কৃতজ্ঞতা জানাই অধ্যাপিকা ড. মহুয়া দাস এবং অধ্যাপক ড. সুব্রত ঘোষ মহাশয়কে। এছাড়াও যাঁরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সাহায্য করেছেন তাঁদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

এপ্রিল, ২০১৬
নিবেদিতা ভবন

অভীক মজুমদার
চেয়ারম্যান
বিশেষজ্ঞ কমিটি, বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

বিশেষজ্ঞ কমিটি পরিচালিত পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন পর্ষদ

অভীক মজুমদার
(চেয়ারম্যান, বিশেষজ্ঞ কমিটি)

মহুয়া দাস
(সভাপতি, পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ)

রথীন্দ্রনাথ দে
(সদস্য-সচিব, বিশেষজ্ঞ কমিটি)

সুব্রত ঘোষ
(সচিব, পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ)

স দ স্য

ঋত্বিক মল্লিক   রুদ্রশেখর সাহা

প্র চ্ছ দ

সুব্রত মাজী

রূ পা য় ণ

বিপ্লব মণ্ডল

সূ|চি|প|ত্র

একাদশ শ্রেণি

গল্প		**৩-১৪**
পৌরাণিক-আধুনিক	বনফুল	৫
ঈর্ষা	আশাপূর্ণা দেবী	৮
প্রবন্ধ		**১৫-২৬**
আড্ডা	বুদ্ধদেব বসু	১৭
মুনশিজি	শ্রীপান্থ	২১
কবিতা		**২৭-৪০**
কপোতাক্ষ নদ	মাইকেল মধুসূদন দত্ত	২৯
প্রকৃতি	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৩০
মানুষের নামে	বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৩১
জনমদুখিনী	সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়	৩২
আন্তর্জাতিক গল্প		**৩৩-৪০**
বুমবুম	জুল ক্লারেতি	৩৫
আন্তর্জাতিক কবিতা		**৪১-৪৪**
আফ্রিকা (আমার মাকে)	ডেভিড দিয়োপ	৪৩
পূর্ণাঙ্গ সহায়ক গ্রন্থ : রবীন্দ্রনাথের গল্প		**৪৫-৬৪**
দেনাপাওনা		৪৯
কাবুলিওয়ালা		৫৪
চিত্রকর		৬১

দ্বাদশ শ্রেণি

গদ্য		**৬৫-৮৬**
অপরিচিতা	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৬৯
নাম নেই	সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়	৮০
সম্প্রদায়ের ভাষা	শঙ্খ ঘোষ	৮৪
কবিতা		**৮৭-৯৪**
কান্ডারি হুঁশিয়ার !	কাজী নজরুল ইসলাম	৮৯
কাজ	অন্নদাশংকর রায়	৯১
মেয়েটা	নবনীতা দেবসেন	৯২
নাটক		**৯৫-১১৮**
সূক্ষ্ম বিচার	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৯৭
কাকচরিত্র	মনোজ মিত্র	১০১
ভারতীয় গল্প		**১১৯-১২৮**
নেমকের দারোগা	মুনসি প্রেমচন্দ	১২১
ভারতীয় কবিতা		**১২৯-১৩২**
পৃথিবী আমার কবিতা	হীরেন ভট্টাচার্য	১৩১
পূর্ণাঙ্গ সহায়ক গ্রন্থ : রবীন্দ্রনাথের গল্প		**১৩৩-১৬৩**
গুপ্তধন		১৩৬
দর্পহরণ		১৪৯
খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন		১৫৭
সুভা		১৬৩
পূর্ণাঙ্গ পাঠ্যসূচি		১৬৯

একাদশ শ্রেণি

গল্প

পৌরাণিক-আধুনিক

বনফুল

শুনে আমি বললাম, 'ওকে হাসপাতালেই নিয়ে যান—'

'কেন, আপনি পারবেন না?'

পাঠকমশাই সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করলেন।

'পারব। কিন্তু হাসপাতালেই এ-সব করা ভালো। আজকাল যিনি লেডি ডাক্তার এসেছেন তাঁর খুব হাত-যশ।'

চুপ করে রইলেন পাঠকমশায় কয়েক মুহূর্ত।

তারপর মুচকি হেসে বললেন, 'একটি গল্প শুনবেন?'

'কী গল্প—'

'পৌরাণিক গল্প। যদি শোনেন তো বলি—'

যদিও খুব বিরক্ত লাগছিল, তবু প্রবীণ পাঠকমশায়কে বলতে পারলাম না যে শুনব না।

'বলুন।'

'পুরাকালে একজন ব্রাহ্মণ ছিলেন। বিবাহ করবার কিছুদিন পরে তিনি অনুভব করলেন যে, তিনি পথ-ভ্রষ্ট হয়েছেন, ব্রহ্ম থেকে ক্রমশ সরে যাচ্ছেন, মায়াতে জড়িয়ে পড়ছেন, অবিলম্বে সাবধান না হলে অকূলপাথারে ডুবতে হবে। অবিলম্বেই সাবধান হলেন তিনি। বাড়ি থেকে অন্তর্ধান করলেন একদিন। হিমালয়ে গিয়ে শুরু করলেন কঠোর তপস্যা। বহুদিন তপস্যা করবার পর ভগবান তাঁর সামনে আবির্ভূত হয়ে বললেন, 'বৎস, তোমার তপস্যায় আমি তুষ্ট হয়েছি—বর দিচ্ছি। যে-কোনও লোককে তুমি অমর করে দিতে পারবে। এবার বাড়ি যাও।' ব্রাহ্মণ বাড়ি ফিরে এলেন। এসে দেখলেন তাঁর পত্নী বৃদ্ধা হয়েছেন এবং একটি সুদর্শন যুবক তাঁর পরিচর্যা করছে। পত্নী বললেন, 'এটি আমাদের পুত্র। তুমি চলে যাওয়ার কিছুদিন পরেই এ ভূমিষ্ঠ হয়েছিল। একে অবলম্বন করেই আমি এতকাল তোমার পথ চেয়ে বসে আছি। পুত্রটি কর্তব্যপরায়ণ এবং বিদ্বান হয়েছে, ওর চরিত্রও নির্মল। কিন্তু সেদিন ভৃগু মুনি ওর হস্তরেখা বিচার করে বললেন যে, আর এক বছর মাত্র ওর পরমায়ু আছে। শুনে থেকে আমি বড়ো বিমর্ষ হয়ে আছি। এর কি কোনও উপায় নেই?'

তপস্বী উত্তর দিলেন, 'তুমি চিন্তা কোরো না, ওকে আমি অমর করে দিতে পারি। সে-শক্তি আমি অর্জন করেছি।'

বৃদ্ধা এততা প্রত্যাশা করেনি।

'ও তাই না কি। তাহলে ওকে অমরই করে দাও।'

তপস্বী ক্ষণকাল চিন্তা করলেন। তারপর বললেন, 'আমি এখনই করে দিতে পারি, কিন্তু আমি করলে সেটা ভালো দেখাবে না, কারণ ও আমার ছেলে। আমি বিষ্ণুকে স্মরণ করছি। তিনিই এসে করে দিন।

স্মরণ করা মাত্র বিষ্ণু এলেন।

সব শুনে বললেন, 'তা এর জন্য আমাকে ডাকলে কেন। তুমি তো নিজেই ওকে অমর করে দিতে পার।'

তপস্বী বললেন, 'তা পারি। কিন্তু আপনি করে দিলে আরও ভালো হয়। আপনি স্বয়ং বিষ্ণু—'

বিষ্ণু বললেন 'আরও ভালোর কথা যদি তুললে তাহলে ব্রহ্মার কাছে চলো। পিতামহ যদি একে অমর করে দেন তাহলে কারও কিছু বলবার থাকবে না।'

'বেশ চলুন।'

তপস্বী, বিষ্ণু এবং সেই যুবক তখন ব্রহ্মার কাছে গিয়ে হাজির হলেন। ব্রহ্মা সব শুনে বললেন, 'এর জন্যে আমার কাছে আসা কেন। তোমাদের মধ্যে যে-কোনও একজনই তো একে অমর করে দিতে পারতে।'

'কিন্তু আপনি করে দিলে দেখতে শুনতে সব দিক দিয়েই ভালো হয়।'

'দেখতে শুনতে ভালো হয় যদি মহেশ্বর করে দেন। চলো তাঁর কাছেই যাই।'

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, তপস্বী আর সেই যুবক মহেশ্বরের কাছে গেলেন।

সব শুনে মহেশ্বর বললেন, 'এর জন্যে এতদূর এলে? তোমাদের তিনজনের মধ্যে যে-কেউ একজন তো করে দিতে পারতে।'

ব্রহ্মা বললেন, 'কিন্তু আপনি করে দিলে কাজটা একেবারে পাকা হয়।'

'পাকা হয় ভাগ্যবিধাতা যদি নিজের খতিয়ানে ওকে অমর বলে লিখে নেন। বেশ, চলো, ভাগ্যবিধাতার কাছেই চলো, পাকাই করে ফেলা যাক ব্যাপারটাকে—'

পাঁচজনে ভাগ্যবিধাতার দপ্তরের দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন। একটি প্রকাণ্ড পাথরে তৈরি সিংহদ্বারের ভিতর দিয়ে সে-দপ্তরে ঢুকতে হয়। সিংহদ্বারে ঢুকছেন এমন সময় একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল। সিংহদ্বারের উপর থেকে প্রকাণ্ড একটা পাথর খসে পড়ল যুবকটির মাথায়। সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু হল তার। হাহাকার করে উঠলেন তপস্বী।

ভাগ্যবিধাতা তাঁকে সম্বোধন করে বললেন, 'মুনিবর, এখন হাহাকার করে কী হবে। ওর মৃত্যুর জন্যে আপনিই দায়ী।'

'আমি?'

'হ্যাঁ আপনি। আপনি ওকে অনায়াসেই অমর করে দিতে পারতেন কিন্তু তা না করে আপনি ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরকে নিয়ে আমার কাছে এলেন। এই দেখুন আমার খাতায় লেখা রয়েছে, ওই যুবক যখন ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর আর তার বাবাকে নিয়ে আমার সিংহদ্বারের ভিতর ঢুকবে তখনি একটি পাথর পড়ে ওর মৃত্যু হবে। এই অসম্ভব যোগাযোগ আপনিই করেছেন—।'

গল্পটি বলে পাঠকমশায় বললেন, 'উষার প্রথম যখন ব্যথা ধরল তখন গেলাম নার্স আভার কাছে। সে বললে, 'আমি পারি, কিন্তু আমার চেয়ে ভালো হবে শশীবাবু ডাক্তার যদি ভার নেন।' শশীবাবুর কাছে গেলাম, তিনি আপনার কাছে আসতে বললেন। আপনি এখন বলছেন হাসপাতালের লেডি ডাক্তারের

কাছে যেতে—।’

আমি হেসে বললাম, ‘উষার ভালোর জন্য বলছি। পরীক্ষা করে দেখলাম ছেলেটা ঠিক সোজাভাবে নেই, ট্রান্সভার্স প্রেজেনটেশন। এ সব হাসপাতালেই ভালো হয়। তা ছাড়া উষার শরীরে রক্তও কম, পা দুটো ফোলা। হয়তো ব্লাড দেওয়ার দরকার হবে, হাসপাতালেই নিয়ে যান ওকে—’

পাঠকমশায় হাসপাতালেই নিয়ে গেলেন ওকে।

হাসপাতালে উষা মারা গেল।

মাস দুই পরে ঠিক এই রকম একটা কেস আমার হাতে এল।

মফস্‌সলের এক জমিদারের পুত্রবধূ। আমাকে ডেকে নিয়ে গেল।

আমি বললাম, ‘প্রসব করিয়ে দেব, কিন্তু হাজার টাকা চাই।’

রাজি হলেন তাঁরা।

নির্বিঘ্নে প্রসব হয়ে গেল। প্রসূতি সন্তান উভয়কেই সুস্থ অবস্থায় রেখে, ফি নিয়ে চলে এলাম। কিছুদূর এসেছি, এমন সময় গাড়ির টায়ার গেল ফেটে। ড্রাইভার টায়ার মেরামত করতে লাগল, আমি নেমে পায়চারি করতে লাগলাম মাঠে। চারিদিকে গাঢ় অন্ধকার। কিছু দেখতে পাচ্ছি না। হঠাৎ চমকে উঠলাম। আমার কানের কাছে কে যেন বলে উঠল, ‘আমাকে তাহলে হাসপাতালে পাঠিয়েছেন কেন কাকাবাবু, আমার বাবা আপনাকে অত ফিস্ দিতে পারবেন না বলে—’

দ্রুতপদে ফিরে এলাম মোটরের কাছে। ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করলাম, ‘কোথায় আমরা রয়েছি বল তো? অন্ধকারে বোঝা যাচ্ছে না কিছু।’

‘আজ্ঞে, এটা শ্মশান।’

ভাবতে লাগলাম, কথাগুলি কে বললে, উষা না আমার বিবেক?

বনফুল (১৮৯৯-১৯৭৯) : সাহিত্যিক বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের ছদ্মনাম ‘বনফুল’। তাঁর জন্ম বিহারের পূর্ণিয়া জেলার মণিহারিতে। সাহেবগঞ্জ হাইস্কুলে পড়ার সময় ১৯১৫ তে তাঁর লেখা প্রথম কবিতা ‘মালঞ্চ’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এরপর ‘প্রবাসী’ ও ‘ভারতী’ পত্রিকায় তিনি ‘বনফুল’ ছদ্মনামে কবিতা লেখেন। পাটনা মেডিকেল কলেজ থেকে ডাক্তারি পাস করেন। পেশায় ছিলেন চিকিৎসক। অতিক্ষুদ্র গল্প রচনায় বাংলা সাহিত্যে তিনি পথিকৃৎ। বাংলা সাহিত্যের এই প্রখ্যাত ছোটোগল্পকার ও ঔপন্যাসিক ‘চোখ গেল’, ‘আত্ম-পর’, ‘খেঁদি’, ‘এক ফোঁটা গল্প’, ‘বুধনী’, ‘কালো’,‘গণেশ—জননী’, ‘অর্জুন মণ্ডল’, ‘তাজমহল’, ‘ছোটলোক’, ‘শ্রীপতি সামন্ত’, ‘ক্যানভাসার’, ‘জাগ্রত দেবতা’, ‘নিমগাছ’, ‘শেষছবি’, ‘মেয়েটি’, ‘শেষ কিস্তি’, ‘রূপ-রূপান্তর’ এমনই অজস্র ছোটোগল্পের সঙ্গে ‘ডানা’, ‘অগ্নীশ্বর’, ‘স্থাবর’, ‘জঙ্গম’, ‘হাটেবাজারে’ প্রভৃতি জনপ্রিয় উপন্যাস লিখেছেন। তাঁর লেখা প্রথম উপন্যাস ‘তৃণখণ্ড’। ‘শ্রীমধুসূদন’, ‘বিদ্যাসাগর’ প্রভৃতি জীবনীমূলক নাটক রচনা করে তিনি প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর আত্মজীবনী ‘পশ্চাৎপট’ রবীন্দ্র পুরস্কারে সম্মানিত। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘জগত্তারিণী পদক’ আর ভাগলপুর ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি.লিট উপাধি লাভ করেন।

ঈর্ষা

আশাপূর্ণা দেবী

সুজাতার ঘরের বড়ো আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সুমন্ত একটা ছোট্ট চিরুনি দিয়ে জোরে চুল আঁচড়াচ্ছিল, অথবা বলা যায় আঁচড়েই চলছিল। কারণ তার মাথায় চুলের যা চাপ, তাতে দাঁত বসাবার মতো দাঁত ওই খুদে চিরুনিটার নেই। গায়ে হাত বুলোনোর মতো ভেসে যাচ্ছিল সুমন্তর প্রবল চেষ্টাতেও।

সুজাতা মোমাবাতি নিতে ঘরে ঢুকে, ছেলের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, ওটা কী হচ্ছে? চিরুনিটা ভেঙে যাবে যে? তোর চুলে ওই চিরুনি!

সুমন্ত একইভাবে হাত চালাতে চালাতে অগ্রাহ্যের গলায় বলল, তোমার চিরুনি নেওয়া হয়নি।

সুজাতা ভুরু কুঁচকে বলল, চমৎকার। খুব 'ম্যানার্স' শেখা হচ্ছে।

সুমন্তদের স্কুলে 'ম্যানার্স' সম্পর্কে বিশেষ নজর রাখার ব্যবস্থা আছে এবং সুমন্ত না কি তাতে একটা সার্টিফিকেটও পেয়েছে। কিন্তু স্কুলের ব্যবহার স্কুলে, তাকে বাড়িতেও নিয়ে আসতে হলে পেরে উঠবে কেন? হাত পা খোলাবার জন্য খেলামাঠের দরকার হয় না?

সুমন্ত মায়ের থেকেও অধিকভাবে ভুরুজোড়া কুঁচকে একবার মার মুখের দিকে তাকাল। কোনও কথা বলল না। আবার একই কাজ করতে লাগল। আজকাল এই এক বাহাদুরি হয়েছে সুমন্তর, ক্লাস ইলেভেন-এ উঠে পর্যন্তই বোধহয় হয়েছে, ইচ্ছে করে মা-বাপকে আগ্রাহ্য দেখান। বাহাদুরি ছাড়া আর কি? তবে বাবা বলে, তুমি শাক দিয়ে মাছ ঢেকো না সুজাতা। বাহাদুরি নয় লায়েক হাওয়া। দেখো তোমার ওই ছেলে কদিন পরে কী মূর্তি ধরে।...

এরকম সময় 'তোমার ছেলে' বলাই বিধি।

সুজাতা অবশ্য বাহাদুরি বলেই ধরে আছে এখনও। নতুন বড়ো হওয়ার সুখে এটা একটা নতুন সখ। এই আর কি। তবু ছেলের ওই ভুরু কোঁচকানো দেখে রাগে গা জ্বলে গেল। এবং মাতৃঅধিকারের শক্তিটা কাজে লাগাতেই জোরে জোরে বলল, বেরোচ্ছিস কোথায়?

বেরোচ্ছে, এটা সাজ সঙ্গতেই বোঝা যাচ্ছে।

সুমন্ত তখন চিরুনিখানা প্যান্টের হিপ্ পকেটে পুরে ফেলে ধীরে-সুস্থে বলল, কোনও একদিকে নিশ্চয়ই। কেন, কিছু আনতে হবে?

কিছু আনার ব্যাপারে অবশ্য সুমন্ত এখনও একপায়ে খাড়া। আট-দশ বছর বয়েস থেকে হরদম ছেলেকে দোকানে পাঠিয়ে এই নেশাটি ধরিয়ে দিয়েছে সুজাতা।

সুজাতা কঠিন গলায় বলল, না। কিছু আনতে হবে না, জানতে হবে।

কী জানতে হবে?

এই সন্ধের মুখে, লোডশেডিংয়ের মধ্যে যাচ্ছিস কোথায় সেটাই জানতে হবে।

কেন? আমি কি হাজতের আসামি? তাই এক পা বেরোলেই বলে যেতে হবে?

বাঃ চমৎকার! ক্রমশই বোলচাল শেখা হচ্ছে। তোর বাবা এখনো কোথাও বোরোলে বলে বেরোয় দেখিস না?

স্রেফ স্লেভ মেন্টালিটি। বলে সুমন্ত সিঁড়ি দিয়ে নেমে যায় তরতরিয়ে।

কিন্তু মায়ের মতো জাতবেহায়া আর কে আছে? তাই সুজাতাও সঙ্গে সঙ্গে নেমে যায় দু'চার সিঁড়ি। চেঁচিয়ে বলে বেশি দেরি করবি না কিন্তু। আকাশটা দেখ। দারুণ বৃষ্টি আসছে।

কথার জবাব অবশ্য পায় না সুজাতা।

ঘুরে এসে রাস্তার দিকের বারান্দাটায় সুজাতা দাঁড়ায়। তরতরিয়ে হেঁটে যাচ্ছে সুমন্ত, নেহাত 'ছেলে' বলেই বুঝতে পারছে, নইলে দেখার কথা নয়। সত্যিই আকাশ কালো মেঘে ঢেকে গেছে। তার সঙ্গে চন্দ্র-সূর্যের অমোঘ নিয়মের মতো লোডশেডিংয়ের অবদান তো আছেই। তবু হাঁটার ওই পরিচিত ভঙ্গিটা থেকেই হঠাৎ আবিষ্কার করে বসে সুজাতা, ওর গতিভঙ্গিটা ঠিক ওর বাপের মতো, গঠনভঙ্গিও। এই বয়সেই বাপের মতো লম্বা হয়ে উঠেছে। অর্থাৎ পুরো দৈর্ঘ্যটাই এসে গেছে ওর এখনই।... এই তো কটা মাস হল ক্লাস নাইন পার করেছে। বড়ো তাড়াতাড়ি বড়ো হয়ে গেল ছেলেটা।

ঘরে এসে জানলা-টানলাগুলো বন্ধ করতে করতে ভাবল সুজাতা, বাপের মতো আকৃতি পাচ্ছে। কই প্রকৃতিটা তো পাচ্ছে না?

শ্রীমন্তর মধ্যে কত শান্ত সভ্য নির্বিরোধী ভাব। কাউকে উঁচু কথাটি বলতে জানে না। অথচ নতুন বাহাদুরিতে ছেলে তো শুধু মাকে নয়, বাপকেও 'ডোন্ট কেয়ার' ভাব দেখিয়ে মজা পায়। সুজাতার ভয় হয় ফট্ করে না ধাড়ি ছেলের গালে একটা চড় কষিয়ে দেয় শ্রীমন্ত, কিন্তু তেমন ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটে না। বড়োজোর স্বগত মন্তব্য করে কিছু। মন্তব্য করে সরে যায়, 'ভালো! ভালো! শিক্ষাদীক্ষা ভালোই হচ্ছে। ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল তো—'

এই ব্যঙ্গটুকু অবশ্য সুজাতার উদ্দেশ্যে।

চারবছর বয়সে ছেলেকে পাড়ার স্কুলে ভরতি করে দিয়েছিল শ্রীমন্ত, যে স্কুলে নিজে পড়ে বড়ো হয়েছে। তখন তো শ্রীমন্তর মা দিব্যি ডাঁটো।...'পাড়ার ইস্কুল' বলে সুজাতা একটু খুঁৎ খুঁৎ করায় সতেজে বলেছিলেন, কেন? ওই পাড়ার ইস্কুলে পড়ে কি মন্তু আমার 'অমানুষ' হয়েছে? তোমার ছেলে যদি আমার ছেলের মতো হয়, তাহলেই বর্তে যেও বাছা।

তবু দু'বছর পর থেকেই সুজাতা 'ইংলিশ মিডিয়াম, ইংলিশ মিডিয়াম' বলে এমন অস্থির হল, শাশুড়ি নিজেই বললেন, 'তবে দে বাবা, ছেলেকে সাহেবের ইস্কুলে ভরতি করে দে। বৌমার যখন এত ভয় ভাবনা, বাংলা ইস্কুলে পড়লে ছেলে বিলেত যেতে পারবে না, দিল্লি মুম্বাইয়ের চাকরি পাবে না।—শেষে আবার হয়তো তোকে দুষবে, মা বুড়ির প্ররোচনায় পড়ে ছেলেটার পরকাল খেয়ে রেখেছ তুমি।'

চোস্ত সতেজ কথাবার্তা ছিল মহিলার।

হয়তো সেজন্যই শ্রীমন্তর স্বভাবটা এত শান্ত শান্ত। বলতে গেলে মায়ের আওতাতেই তো জীবনটা কাটল। মহিলা মারা গেছেন তো এই সেদিন। যখন সুমন্ত বেশ বড়ো হয়ে গেছে। আড়ালে মায়েতে ছেলেতে শ্রীমন্তর 'মাতৃভক্তির' প্রাবল্য নিয়ে হাসাহাসি করেছে। সুজাতা বলত, ঠাকুমা বলেছেন? ও বাবা! মাতৃভক্ত বিদ্যাসাগর ওর আর নড়চড় করতে পারেন?

সুমন্ত হাসত হি হি করে।

আবার মায়ের অসুখের সময় শ্রীমন্তর অস্থিরতা দেখে চিন্তাও প্রকাশ করেছে, মা-বাপ তো মানুষের চিরদিন থাকে না। ঠাকুমা গেলে তোর বাবা যে কী করবে।

কিন্তু আশ্চর্য! মায়ের মৃত্যুর পর কোনও অধীরতা দেখা গেল না শ্রীমন্তর মধ্যে। বরং আরও বেশি শান্ত হয়ে গেল। পরিবর্তনের মধ্যে, সাতজন্মে পুজোপাঠ সন্ধ্যাগায়ত্রীর দিক দিয়ে যেত না, সেটাই হয়েছে। অবশ্য মায়ের ঠাকুরঘরের দুর্দশা দেখতে পারবে না বলেই।

অশৌচান্তের পর থেকেই শ্রীমন্ত সকাল-সঙ্গে দু'বেলা মায়েরই পুরোনো একখানা গরদের থান জড়িয়ে উঠে যায় তিনতলায় মায়ের ঠাকুর ঘরে। কী করে না করে সুজাতা দেখতে যায় না, তবে সকালে পুজো করে নেমে আসা শাশুড়ির কপালে যেমন ছোট্ট একটি চন্দনের টিপ দেখতে পেত, তেমনি ছোট্ট একটি টিপ শ্রীমন্তর কপালেও দেখতে পায়। ভাত খেতে বসেও রয়ে যায় সেটা, অফিস যাবার সময় মুছে ফেলে।

সুমন্ত এক একদিন হেসে বলে, বাবা নির্ঘাৎ একদিন বোষ্টম হয়ে যাবে মা, দেখো তুমি।

সুজাতা তো ছেলের কথায় সায় দেবেই, ছেলেকে নিজের পক্ষে না রাখতে পারলে পৃষ্ঠবল কোথায়? শ্রীমন্তকে তো কোনোদিনই ঠিক 'নিজপক্ষ' করে তুলতে পারেনি। মরে গিয়েও যেন ছেলের জীবনের বেশ খানিকটা নিজের দখলে রেখে দিয়েছেন সেই পরলোকগতা। অথচ কী বুদ্ধিসুদ্ধিহীন গ্রাম্য মহিলাই ছিলেন! আশ্চর্য লাগে। শ্রীমন্তকে তো বুড়ো বয়েস পর্যন্ত বকে 'ধুড়ধুড়ি' নেড়ে দিতেন।' (এটি তারই ভাষা) পান থেকে চুন খসলে রক্ষে রাখতেন না।

শ্রীমন্তর ছোটোবোন খুকুর শ্বশুরবাড়ি ভবানীপুরে। এই ঢাকুরিয়ার বাড়ি থেকে নেহাত কম দূর নয়, তবু প্রতি সপ্তাহে বোনকে দেখতে যাওয়া চাইই চাই। কোনও কারণে একটা সপ্তাহ বাদ গেলেই মহিলা অনায়াসে বলতেন, তোর যে একটা বাপমরা ছোটবোন আছে সেটা বোধহয় এবার ভুলতে চেষ্টা করছিস মন্তা?

আর আশ্চর্য, শ্রীমন্ত রেগে দু'কথা শুনিয়ে দেওয়ায় বদলে পরদিনই বোনের প্রিয় খাদ্য গড়িয়াহাটার দোকানের ডালমুট আমসত্ত্ব শোন্‌পাপড়ি নিয়ে ছুটত তার কাছে।

মাতৃশক্তির পরাকাষ্ঠাতেই বোধহয় এখনও হপ্তায় হপ্তায় 'খুকুর বাড়ি' যাওয়াটি অব্যাহত আছে। আজই তো যাবার সময় বলে গেছে, 'খুব সম্ভব খুকুর বাড়ি হয়ে আসব, দেরি হলে ভেবো না।'

সুজাতা বলে ফেলেছিল, 'এই তো গেলে সেদিন—'

শ্রীমন্ত কিছু বলেনি, জুতোর ফিতে বেঁধে হাত ধুতে চলে গিয়েছে। তা বলে সুজাতার ছেলের মতো ভুরুও কোঁচকায়নি।

দেরি হলে ভাবতে বারণ করেছিল শ্রীমন্ত, তবে দেরি করল না। এসেই গেল ঠিক সময়ে। বলল খুব বৃষ্টি আসছে মনে হল, তাই আর নামলাম না, টানা চলে এলাম।

এসেই যথারীতি মায়ের ছেঁড়া গরদ গায়ে জড়িয়ে সবে ঠাকুর ঘরে গিয়ে উঠেছে। আর তখনই নেমে এল সেই বৃষ্টি যে নাকি এতক্ষণ 'নামব নামব' করে ভয় বাড়াচ্ছিল।

কিন্তু ভয়ের কি থাকত যদি সুমন্তও বাড়ি থাকত। বাড়ির লোকেরা যদি বাইরে না থাকে, বেদম বৃষ্টির মতো মজার কী আছে? কিন্তু এখন বাড়ির আসল লোকটাই তো বাইরে।

এখন ক্রমশ যত বাজ বিদ্যুৎ আর মেঘের দাপট বাড়ছে, ততই সুজাতার প্রাণের মধ্যে হু হু করছে। আর আপন মনে ছেলের উদ্দেশ্যে বলে চলেছে—পাজি হতভাগা ছেলে। এত করে বললাম, শোনা হল না কথা। কোথায় গিয়ে পড়েছিস, কীভাবে ভিজে ঢোল হয়ে ফিরবি ভগবান জানেন। দেখতেই লম্বা হয়েছ, আর মনে করছ মস্ত লায়েক হয়েছি। আসলে তো পটকা। সে হুঁস আছে? এক্ষুনি কাশতে শুরু করবি।

আপন মনে অনুপস্থিত ছেলেকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে বকেই চলে সুজাতা। সামনাসামনি তো একটা কথা বলার সাহস নেই।

বৃষ্টি কমবার নাম নেই। বরং বাজ বিদ্যুতের সমারোহ বাড়ছে। আশ্চর্য শ্রীমন্ত দিব্যি নিশ্চিন্ত মনে 'টঙে' চড়ে বসে আছে।

একবার বুক দুরদুর করছে না, কোথায় কী ঘটছে ভেবে। সুজাতার তো মনে হচ্ছে এটা প্রলয়ের সূচনা। ভাবল ছুটে ঠাকুরঘরে উঠে গিয়ে বলে, তুমি কি মানুষ না পাথর? যেতে হল না। যথাসময়েই নেমে এল শ্রীমন্ত। থান গরদ ছেড়ে সুতি ধুতি পরে চায়ের টেবিলে এসে বলল, বাবু বুঝি এখনও ফেরেননি?

সুজাতা ক্ষুব্ধ উত্তেজিত গলায় বলে ওঠে, দেখো না, এত করে বললাম, ভীষণ মেঘ করেছে, দেরি করিসনি,—তবু এইটুকু ছেলে, এত কীসের আড্ডা। তুমিও তো কিছু বলো না। মায়ের শত কথায় কাজ হয় না, বাপের একটা ধমক দিলে—কাজ হয়।

ধমক?

শ্রীমন্ত চায়ের কাপটাই কপালে ঠেকিয়ে নমস্কারের ভঙ্গি করে বলে তোমার ওই 'হিরো' ছেলেকে আমি দেব ধমক?

বলে নিশ্চিন্তভাবে চায়ের কাপে চুমুক দিতে থাকে।

কড়কড় করে আবার বাজের শব্দ!

সুজাতা অস্থির হয়ে জানলা খুলে দেখতে যায়, শ্রীমন্ত বলে, ওটা কী হচ্ছে? ঘর যে ভেসে যাবে।

খুব নিশ্চিন্দি মানুষ বাবা। ছেলেটা কোথায় কী করছে—

কী আশ্চর্য! পাগল তো নয় যে এই সময় রাস্তায় থাকবে। আছেই কোথাও বন্ধুর বাড়ি-টাড়ি। আটকে পড়েছে। এত ভাবনা করছ কেন?

একথায় আবার রাগ এসে যায় সুজাতার। মনে হয়, খুব একটা বিপদে পড়ে ভিজে নেয়ে বাড়ি আসে সুমন্ত, তবে জব্দ হয় লোকটা।...আর তা যদি না হয়, তো আজ ছেলেকেই সুজাতা দেখে নেবে একহাত। ওইটুকু ছেলেকে এত ভয়ই বা পাব কেন আমি? .... মনে দুঃখ পাবে বলেই না কিছু বলি না। রাত বাড়তে বাড়তে ক্রমে বৃষ্টি কমে। থামে মেঘের ডাক, বাজের ডাক, বিদ্যুৎ চমকানি। ঝিরিঝিরি বৃষ্টি, যেন জেরটা বজায় রাখতে চেষ্টা করে।

অতঃপর বাড়ি ফেরে সুমন্ত। ফেরে একখানা রিকশা করে।

কোথায় ছিলি এতক্ষণ?

কোথাও না এই ঢাকুরিয়ার মধ্যেই, সুধাময়দের বাড়ি।

সুজাতা এতক্ষণ মনে মনে ভাঁজছিল ছেলে যদি শুকনো গায়ে মাথায় ফেরে তো দেখে নেবে তাকে। কিন্তু কী করে নেবে দেখে? কোন কথার পিঠে? ছেলে যদি বলে, তা' তুমি যদি ভাবতে বসো আমি বাজ পড়ে মারা গেছি, তা কষ্ট তো পাবেই। আমি কি কচি খোকা যে, তুমি একেবারে অস্থির হয়ে উঠলে?

সুজাতা ভারী মুখে বলে, অস্থির কী সাধে হই? কচিখোকা নও বুঝলাম ধাতটি তো খোকারই মতো। এই যে জোলো হাওয়াটি লাগিয়ে এলি এতক্ষণ, রাতেই কাশতে শুরু করবি। বলছিস তো ভিজিসনি, কই দেখি মাথাটা! যা চুলের রাশ—মুছে দিই ঘষে।

সুজাতা ছেলের মাথায় হাত দিয়ে দেখতে আসে, এক ঝটকায় মার হাতটা ঠেলে দিয়ে বলে ওঠে সুমন্ত, আঃ! ভেবেছ কি তুমি? বাড়াবাড়ির একটা সীমা আছে, বুঝলে?

নিজেই তোয়ালে দিয়ে ঘষে ঘষে মাথাটা মুছে নিয়ে জামা বদলে শুয়ে পড়ে গিয়ে।...সুজাতা স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকে।

শ্রীমন্ত ওর ঘরের দরজায় এসে একটু হেসে বলে, কী রে? মার ওপর রাগ করে না খেয়ে শুয়ে পড়লি?

রাগ আবার কি!

সুমন্ত পাশ ফিরে বলল, সুধাময়ের মা ছাড়লেন না, জোর করে ওদের সঙ্গে খিচুড়ি বেগুনি ডিমভাজা খাইয়ে দিলেন।

ওঃ তাহলে তো আজ তোর মজার দিন গেল।

শুনলে তো?

শ্রীমন্ত বলে উঠল, বন্ধুর বাড়ি খিচুড়ি বেগুনি ডিমভাজা—যাক বেচারি আমরা আমাদের রুটি তরকারি নিয়ে বসিগে। যথেষ্ট রাত হয়ে গেছে।

এখন আর লোডশেডিং নেই। দালানের দুটো আলোই জ্বালা। খাবার টেবিলের সামনে দেয়ালে শ্রীমন্তর মার যে মস্ত ফোটোখানা টাঙানো রয়েছে, তার উপর আলো এসে পড়েছে...খেতে বসে শ্রীমন্ত যথানিয়মে আগে সেই ছবির দিকে নীরব প্রণামের ভঙ্গিতে একটু চোখ ফেলে খাবারে হাত দেয়। আর কেন কে জানে সেই মুহূর্তে একটা জ্বালায় সুজাতার ভিতরটা তোলপাড় করে দু'ঝলক গরমজল এসে যায় দুচোখের কোলে।

ওই অতি সাধারণ প্রায় অশিক্ষিত গ্রাম্য চেহারার মহিলাটির উপর ভয়ানক একটা ঈর্ষা অনুভব করে সুজাতা!

আশাপূর্ণা দেবী (১৯০৯-১৯৯৫) : অন্যতম প্রধান বাঙালি লেখিকা। জন্ম কলকাতায়। স্কুল-কলেজে পড়ার সুযোগ ঘটেনি। অথচ অসামান্য সূক্ষ্ম দৃষ্টি, সংবেদনশীলতা ও পরিচিত সমাজের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তিনি বাঙালি মধ্যবিত্ত জীবনকে আশ্চর্য দক্ষতায় তার গল্প-উপন্যাসে তুলে ধরেছিলেন। তিনি দীর্ঘ জীবনে অসংখ্য উপন্যাস, গল্প এবং ছোটোদের জন্য অজস্র বই লিখেছেন। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য — 'ছোট ঠাকুরদার কাশীযাত্রা', 'প্রথম প্রতিশ্রুতি', 'সুবর্ণলতা', 'বকুলকথা', 'অগ্নিপরীক্ষা', 'সাগর শুকায়ে যায়', 'শশীবাবুর সংসার', 'সোনার হরিণ' ইত্যাদি। তাঁর রচিত অন্তত ৬৩টি গ্রন্থ বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে। তিনি 'রবীন্দ্র পুরস্কার', 'সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার', 'জ্ঞানপীঠ পুরস্কার', একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ডি. লিট' এবং নানা সরকারি খেতাবে ভূষিত হয়েছেন।

প্রবন্ধ

আড্ডা

বুদ্ধদেব বসু

পণ্ডিত নই, কথাটার উৎপত্তি জানি না। আওয়াজটা অ-সংস্কৃত, মুসলমানি। যদি ওকে হিন্দু করে বলি সভা, তাহলে ওর কিছুই থাকে না। যদি ইংরেজি করে বলি পার্টি, তাহলে ও প্রাণে মরে। মিটিঙের কাপড় খাকি কিংবা খাদি; পার্টির কাপড় ফ্যাশন-দুরস্ত কিন্তু ইস্ত্রি বড়ো কড়া; সভা শুভ্র, শোভন ও আরামহীন। ফরাশি সালঁর অস্তিত্ব এখনো আছে কিনা জানি না, বর্ণনা পড়ে বড্ড বেশি জমকালো মনে হয়। আড্ডার ঠিক প্রতিশব্দটিই পৃথিবীর অন্য কোনো ভাষাতেই আছে কি? ভাষাবিদ না-হয়েও বলতে পারি, নেই; কারণ আড্ডার মেজাজ নেই অন্য কোনো দেশে, কিংবা মেজাজ থাকলেও যথোচিত পরিবেশ নেই। অন্যান্য দেশের লোক বক্তৃতা দেয়, রসিকতা করে, তর্ক চালায়, ফূর্তি করে রাত কাটিয়ে দেয়, কিন্তু আড্ডা দেয় না। অত্যন্ত হাসি পায় যখন শুভানুধ্যায়ী ইংরেজ আমাদের করুণা করে বলে—আহা বেচারা, ক্লাব কাকে বলে ওরা জানে না! আড্ডা যাদের আছে, ক্লাব দিয়ে তারা করবে কী? আমাদের ক্লাবের প্রচেষ্টা কলের পুতুলের হাত-পা নাড়ার মতো, ওতে আবয়বিক সম্পূর্ণতা আছে, প্রাণের স্পন্দন নেই। তারা আড্ডাদেনেওলা জাত, তারা যে ঘর ভাড়া নিয়ে, চিঠির কাগজ ছাপিয়ে, চাকরদের চাপরাশ পরিয়ে ক্লাবের পত্তন করে, এর চেয়ে হাস্যকর এবং শোচনীয় আর-কিছু আছে কিনা জানি না।

আড্ডা জিনিসটা সর্বভারতীয়, কিন্তু বাংলাদেশের সজল বাতাসেই তার পূর্ণবিকাশ। আমাদের ঋতুগুলি যেমন কবিতা জাগায়, তেমনি আড্ডাও জমায়। আমাদের চৈত্রসন্ধ্যা, বর্ষার সন্ধ্যা, শরতে জ্যোৎস্না-ঢালা রাত্রি, শীতের মধুর উজ্জ্বল সকাল—সবই আড্ডার নীরব ঘণ্টা বাজিয়ে যায়, কেউ শুনতে পায়, কেউ পায় না। যে-সব দেশে শীত-গ্রীষ্ম দুই অতি তীব্র, বা বছরের ছ-মাস জুড়েই শীতকাল রাজত্ব করে, সেগুলো আড্ডার পক্ষে ঠিক অনুকূল নয়। বাংলার কমনীয় আবহাওয়ায় যেমন গাছপালার ঘনতা, তেমনি আড্ডার উচ্ছ্বাসও স্বাভাবিক। ছেলেবেলা থেকে এই আড্ডার প্রেমে আমি মজে আছি। সভায় যেতে আমার বুক কাঁপে, পার্টির নামে দৌড়ে পালাই, কিন্তু আড্ডা! ও না-হলে আমি বাঁচি না। বলতে গেলে ওরই হাতে আমি মানুষ। বই পড়ে যা শিখেছি তার চেয়ে বেশি শিখেছি আড্ডা দিয়ে। বিশ্ববিদ্যাবৃক্ষের উচ্চশাখা থেকে আপাতরমণীয় ফলগুলি একটু সহজেই পেড়েছিলুম—সেটা আড্ডারই উপহার। আমার সাহিত্যরচনায় প্রধান নির্ভররূপেও আড্ডাকে বরণ করি। ছেলেবেলায় গুরুজনেরা আশঙ্কা করেছিলেন যে আড্ডায় আমার সর্বনাশ হবে, এখন দেখছি ওতে আমার সর্বলাভ হল। তাই শুধু উপাসক হ'য়ে আমার তৃপ্তি নেই, পুরোহিত হয়ে তার মহিমার প্রচার করতে বসেছি।

যে কাপড় আমি ভালোবাসি আড্ডার ঠিক সেই কাপড়। ফর্সা, কিন্তু অত্যন্ত বেশি ফর্সা নয়, অনেকটা ঢোলা, প্রয়োজন পার হয়েও খানিকটা বাহুল্য আছে, স্পর্শকোমল, নমনীয়। গায়ে কোথাও কড়কড় করে

না, হাত-পা ছাড়তে হলে বাধা দেয় না, লম্বা হয়ে শুয়ে পড়তে চাইলে তাতেও মানা নেই। অথচ তা মলিন নয়, তাতে মাছের ঝোল কিংবা পানের পিক লাগেনি; কিংবা দাওয়ায় বসে গা-খোলা জটলার বেআব্রু শৈথিল্য তাকে কুঁচকে দেয়নি। তাতে আরাম আছে, অযত্ন নেই; তার স্বাচ্ছন্দ্য ছন্দোহীনতার নামান্তর নয়।

শুনলে মনে হয় যে ইচ্ছে করলেই আড্ডা দেয়া যায়। কিন্তু তার আত্মা বড়ো কোমল, বড়ো খামখেয়ালি তার মেজাজ, অতি সূক্ষ্ম কারণেই উপকরণের অবয়ব ত্যাগ করে সে এমন অলক্ষ্যে উবে যায় যে অনেকক্ষণ পর্যন্ত কিছু বোঝাই যায় না। আড্ডা দিতে গিয়ে প্রায়ই আমরা পরাবিদ্যার—মানে পড়াবিদ্যার আসর জমাই, আর নয়তো পরচর্চার চণ্ডীমণ্ডপ গড়ে তুলি। হয়তো স্থির করলুম যে সপ্তাহে একদিন কি মাসে দু-দিন সাহিত্যসভা ডাকব, তাতে জ্ঞানীগুণীরা আসবেন, এবং নানা রকম সদালাপ হবে। পরিকল্পনাটি মনোরম তাতে সন্দেহ নেই; প্রথম কয়েকটি অধিবেশন এমন জমলো যে নিজেরাই অবাক হয়ে গেলাম, কিন্তু কিছুদিন পরেই দেখা গেল যে সেটি আড্ডার স্বর্গ থেকে চ্যুত হয়ে কর্তব্যপালনের বন্ধ্যা জমিতে পতিত হয়েছে। নির্দিষ্ট সময়ে কর্মস্থলে যাওয়ার মতো নির্দিষ্ট দিনে যেখানে যেতে হয়, তাকে, আর যা-ই হোক, আড্ডা বলা যায় না। কেননা আড্ডায় প্রথম নিয়ম এই যে তার কোনো নিয়মই নেই; সেটা যে অনিয়মিত, অসাময়িক, অনায়োজিত, সে বিষয়ে সচেতন হলেও চলবে না। ও যেন বেড়াতে যাবার জায়গা নয়, ও যেন বাড়ি; কাজের শেষে সেখানেই ফিরব এবং কাজ পালিয়ে যখন-তখন এসে পড়লেও কেউ কোনো প্রশ্ন করবে না।

তাই বলে এমন নয় যে এলোমেলোভাবেই আড্ডা গড়ে ওঠে। নিজে অভিজ্ঞতায় দেখেছি যে তার পিছনে কোনো-একজনের প্রচ্ছন্ন কিন্তু প্রখর রচনাশক্তি চাই। অনেকগুলি শর্ত পূরণ হলে তবে কতিপয় ব্যক্তির সমাবেশ হয়ে ওঠে সত্যিকার আড্ডা—ক্লাব নয়, পার্টি নয়, সভা কিংবা সমিতি নয়। একে-একে সেগুলি পেশ করছি।

আড্ডায় সকলেরই মর্যাদা সমান হওয়া চাই। ব্যবহারিক জীবনে মানুষে-মানুষে নানা রকম প্রভেদ অনিবার্য, কিন্তু সেই ভেদবুদ্ধি আপিসের সঙ্গে-সঙ্গেই যারা ঝেড়ে ফেলতে না জানে, আড্ডার স্বাদ তারা কোনোদিন পাবে না। যদি এমন কেউ থাকেন যিনি এতই বড়ো যে তাঁর মহিমা কখনো ভুলে থাকা যায় না, তাঁর পায়ের কাছে আমরা ভক্তের মতো বসব, কিন্তু আমাদের আনন্দে তাঁর নিমন্ত্রণ নেই, কেননা তাঁর দৃষ্টিপাতেই আড্ডার ঝরনাধারা তুষার হয়ে জমে যাবে। আবার অন্যদের তুলনায় অনেকখানি নিচুতে যার মনের স্তর, তাকেও বাইরে না-রাখলে কোনো পক্ষেই সুবিচার হবে না। আড্ডায় লোকসংখ্যার একটা স্বাভাবিক সীমা আছে; ঊর্ধ্বসংখ্যা দশ কি বারো, নিম্নতম তিন। দশ-বারোজনের বেশি হলে অ্যালবার্ট হল হয়ে ওঠে, কিংবা বিয়ে-বাড়িও হতে পারে; আর যদি হয় ঠিক দু-জন তাহলে তার সঙ্গে কূজনই মিলবে—পদ্যেও, জীবনেও। উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে স্বভাবের উপর-তলায় বৈচিত্র্য থাকা চাই, কিন্তু নীচের তলায় মিল না-থাকলে পদে-পদে ছন্দপতন ঘটবে। অনুরাগ এবং পারস্পরিক জ্ঞাতিত্ববোধ স্বঃতই যাদের কাছে টানে, আড্ডা তাদেরই জন্য, এবং তাদেরই মধ্যে আবব থাকা উচিত; চেষ্টা করে সংখ্যা বাড়াতে গেলে আড্ডার প্রাণপাখি কখন উড়ে পালাবে কেউ জানতেও পাবে না।

কিন্তু এমনও নয় যে ওই ক-জন এক-সুরে-বাঁধা মানুষ একত্র হলেই আড্ডা জমে উঠবে। জায়গাটিও অনুকূল হওয়া চাই। আড্ডার জন্য ঘর ভাড়া করা আর শোক করার জন্য কাঁদুনে ভাড়া করা একই কথা।

অধিগম্য বাড়িগুলির মধ্যে যেটির আবহাওয়া সবচেয়ে অনুকূল, সেই বাড়িই হবে আড্ডার প্রধান পীঠস্থান। সেই সঙ্গে একটি-দুটি পারিপার্শ্বিক তীর্থ থাকাও ভালো, মাঝে মাঝে জায়গা বদল করাটা মনের ফলকে শান দেয়ার শামিল; ঋতুর বৈচিত্র্য এবং চাঁদের ভাঙা-গড়া অনুসারে ঘর থেকে বারান্দায়, বারান্দা থেকে ছাতে, এবং ছাত থেকে খোলামাঠে বদলি হলে সেই সম্পূর্ণতা লাভ করা যায়, যা প্রকৃতিরই আপন হাতের সৃষ্টি। কিন্তু কোনো কারণেই, কোনো প্রলোভনেই ভুল জায়গায় যেন যাওয়া না হয়। ভুল জায়গায় মানুষগুলোকেও ভুল মনে হয়, ঠিক সুরটি কিছুতেই লাগে না।

আড্ডার জায়গাটিতে আরাম থাকবে পুরোপুরি, আড়ম্বর থাকবে না। আসবাব হবে নিচু, নরম, অত্যন্ত বেশি ঝকঝকে নয়; মরজি-মতো অযথাস্থানে সরিয়ে নেবার আন্দাজ হালকা হলে তো কথাই নেই। চেয়ার-টেবিলের কাছাকাছি একটা ফরাশ গোছেরও কিছু থাকা ভালো—যদি রাত বেড়ে যায়, কিংবা কেউ ক্লান্ত বোধ করে, তাহলে শুয়ে পড়ার জন্য কারো অনুমতি নিতে হবে না। পানীয় থাকবে কাচের গেলাসে ঠান্ডা জল, আর পাতলা শাদা পেয়ালায় সুগন্ধি চা; আর খাদ্য যদি কিছু থাকে তা হবে স্বাদু, স্বল্প এবং শুকনো, যেন ইচ্ছেমতো মাঝে-মাঝে তুলে নিয়ে যাওয়া যায়, আর খাবার পরে হাত-মুখ ধোবার জন্য উঠতেও হয় না। বাসনগুলো হবে পরিচ্ছন্ন—জমকালো নয়; এবং ভৃত্যদের ছুটি দিয়ে গৃহকর্ত্রী নিজেই যদি খাদ্যপানীয় নিয়ে আসেন এবং বিতরণ করেন তাহলেই আড্ডার যথার্থ মানরক্ষা হয়।

কথাবার্তা চলবে মসৃণ স্বচ্ছন্দ — স্রোতে, তার জন্য কোনো চেষ্টা কি চিন্তা থাকবে না; যে-সব ভাবনা ও খেয়াল, সংশয় ও প্রশ্ন মনের মধ্যে সব সময় উঠছে পড়ছে—কেজো দিনের শাসনের তলায় যা চাপা পড়ে থাকে, এবং যার অনেকটা অংশই হয়তো আকস্মিক কিন্তু তাই বলে অর্থহীন নয়, তারই মুক্তি-পাওয়া ছলছলানি যেন কথাগুলো। এখানে সংকোচ নেই, বিষয়-বুদ্ধি নেই, দায়িত্ববোধ নেই। ভালো কথা বলার দায় নেই এখানে । ভালো কথা না আসে, এমনি কথাই বলব; এমনি কথারও যদি খেই হারিয়ে যায়, মাঝে-মাঝে চুপ করে থাকতে ভয় কীসের। মুহূর্তের জন্যও চুপ করে থাকাকে যাঁরা বুদ্ধির পরাভব কিংবা সৌজন্যের ত্রুটি বলে মনে করেন, আড্ডা জিনিসটা তাঁরা বোঝেন না। তার্কিক এবং পেশাদার হাস্যরসিক, আড্ডায় এই দুই শ্রেণির মানুষের প্রবেশ নিষেধ। যাঁরা প্রাজ্ঞজন, কিংবা যাঁরা লোকহিতে বদ্ধপরিকর, তাঁদেরও সসম্মানে বাইরে রাখতে হবে। কেননা আড্ডার ইডেন থেকে যে-সূক্ষ্ম সর্প বার বার আমাদের ভ্রষ্ট করে, তারই নাম উদ্দেশ্য। যত মহৎই হোক, কিংবা যত তুচ্ছই হোক, কোনো উদ্দেশ্যকে ভ্রমক্রমেও কখনো ঢুকতে দিতে নেই। আড্ডার মধ্যে তাসপাশার আমদানি যেমন মারাত্মক, তেমনি ক্ষতিকর তার দ্বারা কোনো জ্ঞান লাভের সচেতন চেষ্টা। ধরে নিতে হবে যে আড্ডা কোনো উদ্দেশ্যসাধনের উপায় নয়, তা থেকে কোনো কাজ হবে না, নিজের কিংবা অন্যের কিছুমাত্র উপকার হবে না। আড্ডা বিশুদ্ধ ও নিষ্কাম, আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ। তা যদি নিজেরই জন্য আনন্দদায়ক না-হতে পারে তাহলে তার অস্তিত্বেরই অর্থ নেই।

শুধু পুরুষদের নিয়ে, কিংবা শুধু মেয়েদের নিয়ে, আড্ডা জমে না। শুধু পুরুষরা একত্র হলে কতার গাড়ি শেষ পর্যন্ত কাজের লাইন ধরেই চলবে; আবার কখনো লাইন থেকে চ্যুত হলে গড়াতে গড়াতে সুরুচির সীমাও পেরিয়ে যাবে হয়তো। শুধু মেয়েরা একত্র হলে ঘরকন্না, ছেলেপুলে, শাড়ি-গয়নার কথা কেউ ঠেকাতে পারবে না। আড্ডার উন্মীলন স্ত্রী-পুরুষের মিশ্রণে। মেয়েরা কাছে থাকলে পুরুষের এবং

পুরুষ কাছে থাকলে মেয়েদের রসনা মার্জিত হয়, কণ্ঠস্বর নিচু পর্দায় থাকে, অঙ্গভঙ্গি শ্রীহীন হতে পারে না। মেয়েরা দেন তাঁদের স্নেহ ও লাবণ্য, ন্যূনতম অনুষ্ঠানের সূক্ষ্মতম বন্ধন; পুরুষ আনে তার ঘরছাড়া মনের দূরকল্পনা। বিচ্ছিন্নভাবে মেয়েদের দ্বারা এবং পুরুষের দ্বারা পৃথিবীতে অনেক ছোটো-বড়ো কাজ হয়ে থাকে; ছন্দ হয় দুয়ের মিলনে।

আড্ডা স্থিতিশীল নয়, নদীর স্রোতের মতো প্রবহমান। সময়ের সঙ্গে-সঙ্গে তার রূপের বদল হয়। মন যখন যা চায় তাই পাওয়া যায় তাতে। কখনো কৌতুকে সরস, কখনো আলোচনায় উৎসুক, কখনো প্রীতির দ্বারা সুস্নিগ্ধ। বন্ধুতা ও অন্তবীক্ষণ, হৃদয়বৃত্তি ও বুদ্ধির চর্চা, উদ্দীপনা ও বিশ্রাম—সব একসঙ্গে শুধু আড্ডাই আমাদের দিতে পারে, যদি সত্যি তা ওই নামের যোগ্য হয়। বিশ্বসভায় অখ্যাতির কোণে আমরা নির্বাসিত; যারা ব্যস্ত এবং মস্ত জাত, যাদের কৃপাকটাক্ষ প্রতি মুহূর্তে আমাদের বুকে এসে বিঁধছে, তারা এখনো জানে না যে পৃথিবীর সভ্যতায় আড্ডা আমাদের অতুলনীয় দান। হয়তো একদিন নব-যুগের দুয়ার খুলে আমরা বেরিয়ে পড়ব, অস্ত্র নিয়ে নয়, মানদণ্ড নিয়ে নয়, ধর্মগ্রন্থ নিয়েও নয়, বেরিয়ে পড়ব বিশুদ্ধ বেঁচে থাকার মন্ত্র নিয়ে, আনন্দের উদ্দেশ্যহীন ব্রত নিয়ে, আড্ডার দ্বারা পৃথিবী জয় করব আমরা, জয় করব কিন্তু ধরে রাখব না;—কেননা আমরা জানি যে ধরে রাখতে গেলেই হারাতে হয়, ছেড়ে দিলেই পাওয়া যায়। পৃথিবীর রাষ্ট্রনীতি বলে, কাড়ো; আমাদের আড্ডা-নীতি বলে, ছাড়ো।

বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪) : জন্ম অধুনা বাংলাদেশের কুমিল্লায়। ছাত্রজীবন কেটেছে নোয়াখালি এবং ঢাকায়। বাংলা সাহিত্যের কবি, ঔপন্যাসিক, ছোটোগল্পকার, নাট্যকার, প্রাবন্ধিক, শিশুসাহিত্যিক ও সমালোচক হিসেবে সমাদৃত। ইংরেজি সাহিত্যের যশস্বী অধ্যাপক বুদ্ধদেব বসু 'উত্তর তিরিশ', 'কালের পুতুল', 'সাহিত্য চর্চা', 'রবীন্দ্রনাথ : কথাসাহিত্য', 'স্বদেশ ও সংস্কৃতি', 'কবি রবীন্দ্রনাথ', 'আমার ছেলেবেলা', 'আমার যৌবন', 'কবিতার শত্রু ও মিত্র', 'মহাভারতের কথা' প্রভৃতি বিখ্যাত প্রবন্ধ গ্রন্থ রচনা করেছেন। An Acre of Green Grass তাঁর লেখা একটি বিখ্যাত গ্রন্থ। তাঁর কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য *বন্দীর বন্দনা, কঙ্কাবতী, দ্রৌপদীর শাড়ি, যে আঁধার আলোর অধিক, শীতের প্রার্থনা: বসন্তের উত্তর*। তিনি *প্রগতি* এবং *কবিতা* পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন। শিশুদের জন্য লিখেছেন *কান্তিকুমারের পঞ্চকাণ্ড, ঘুমপাড়ানি, এলোমেলো* প্রভৃতি রচনা। *বাংলা শিশুসাহিত্য, রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক* প্রভৃতি প্রবন্ধ, *অনাম্নী অঙ্গনা ও প্রথম পার্থ, কলকাতার ইলেকট্রা ও সত্যসন্ধ, তপস্বী ও তরঙ্গিনী* তাঁর রচিত খ্যাতনামা নাটক। কালিদাসের *মেঘদূত* কাব্যের অনুবাদ ও সম্পাদনা তাঁর বিশিষ্ট কীর্তি।

মুনশিজি

শ্রীপান্থ

সাহেবের পায়ে একটি রুপোর টাকা রেখে হাতজোড় করে ধনুকের মতো নিজেকে বাঁকিয়ে ফেলল লোকটি। তারপর ধীরে ধীরে সোজা হয়ে দাঁড়াল। সাহেব মুখ থেকে গড়গড়ার নল নামিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—

'—তুমি কে হও ও এ টাকা কেন?

—সাহেব আমি মুনশি আমি এদেশীয় ভাষা শিক্ষা করাই এ টাকা নজর এদেশের দস্তুর এই।

—তুমি মুনশি তুমি কী লোক!

—সাহেব আমি এ দেশীয় কায়স্থ।

—তুমি কোন কোন ভাষা জান।

—সাহেব আমি তিন চারি প্রকার ভিন্ন ভিন্ন ভাষা জানি।

—তবে তো তুমি অনেক জান কিন্তু কী কী জান বিশেষিয়া কহ।

—সাহেব আমি পারসি ও আরবি ও হেন্দোস্থানি ও বাঙ্গালা এবং ইংরেজিও কতক কতক এই সকল পৃথক পৃথক ভাষা জানি।

—তুমি আমার চাকর থাকিয়া শিক্ষা করাইবা আমাকে।'

ব্যাস, সাহেবের বাংলোয় বহাল হয়ে গেল বাঙালি মুনশি। অবশ্য বাবুদের বাড়িতেও মুনশি রাখা তখন রেওয়াজ। এখনকার প্রাইভেট টিউটারের মতোই সেসব মুনশি সম্বন্ধে চট করে ভালোমন্দ কিছু বলা শক্ত। উপরের উদ্ধৃতিটুকু কেরি সাহেবের 'কথোপকথন' থেকে। এবার শুনুন ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নববাবু বিলাস' থেকে 'মুনশি' বৃত্তান্ত।

'বাবুদের লেখাপড়া শেখাবার জন্য বাড়ির কর্তা প্রথমে একজনকে ডেকে পাঠালেন। বললেন—তুমি আমার সন্তানদিগকে ফরাসি পড়াইবা এবং বহির্দ্বারে থাকিবা। যে দিবস বাবুরা কোনো স্থানে নিমন্ত্রণে থানা রূঢ় হইয়া গমন করিবেন সঙ্গে যাইবা মায় খোরাকি তিন তঙ্কা পাইবা।' বাবুর প্রস্তাব শুনে যশোহর নিবাসী প্রস্থান করলেন। 'তৎপরে নাটুর ফরিদপুর ঢাকা ছিল হট্ট কুমিল্লা বড়ন বরিশাল ইত্যাদি দেশি মুনশি প্রায় মাসেক দুই গমনাগমন করিলেক' কিন্তু কেউ ইনটারভিউ উত্তীর্ণ হতে পারল না। অবশেষে

হাজির ‘চট্টগ্রাম-নিবাসী অপূর্ব মিষ্টভাষী এক উপযুক্ত মুনশি।’ সে বোট অফিসে কাজ করত। একখানা মলিন কাগজে সাহেবের হাতে লেখা সার্টিফিকেটও রয়েছে। সে কর্তার হাতে সেটি তুলে দিল। কর্তা মোটে ইংরাজি জানেন না। চোখ বুলিয়ে বললেন—‘অনেক দিবসাবধি এ-ব্যক্তি মুনশিগিরি কর্ম করিয়াছে... এ ব্যক্তি মাঝি বড়ো ভালো মনুষ্য।’ ইত্যাদি। কর্তা লোকটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—‘কোন সাহেবের কর্ম করতে?—আজ্ঞা বালবর কোম্পানি। কোম্পানির মুনশি শুনিয়া (কর্তা) মহা সন্তুষ্ট হইলেন পরে মাঝি পুর্বলিখিত বেতনে সেই সকল কর্ম স্বীকার করিল। পরদিবস বাবুদিগের পাঠ আরম্ভ হইল।’

সাহেব বাড়ির ব্যাপার-স্যাপার অন্যরকম। তারা সস্তায় মুনশি ধরে শেষটায় পস্তায় না। কেননা, মুনশির হাতে তাদের সৌভাগ্যের চাবিকাঠি। অষ্টাদশ শতকেই কোম্পানির কর্তাদের কড়া হুকুম—স্থানীয় ভাষা শিখতে হবে। তা না হলে, বুঝতেই পারছ, ব্যবসা বাণিজ্য চালানো শক্ত হবে। যারা দেশীয় ভাষা শিখতে পারবে তারা গ্র্যাচুইটি পাবে বছরে কুড়ি পাউন্ড। কুড়ি পাউন্ড তখন অনেক টাকা। যারা কোম্পানির চাকুরে নন, স্বাধীন ব্যবসায়ী, ভাষা শেখার জন্য ব্যাকুল তাঁরাও। তা না হলে এদেশের মানুষের সঙ্গে কথাবার্তা চালাবেন কেমন করে? আর, বাক্য ছাড়া অন্য কাজ যদিবা সম্ভব, বাণিজ্য অসম্ভব। সুতরাং, ইংরাজিটোলার ঘরে ঘরে তখন মুনশি। শব্দটির আড়ালে কিছু টিকিধারী পন্ডিতও থাকা সম্ভব। একজন সাহেব লিখেছেন, মুনশি আর পন্ডিত একই বস্তু। একদল আল্লার উপাসক, অন্যদল ঈশ্বরের—এই যা। কথাটা ঠিক নয়। পন্ডিতেরা, মেনে নেওয়া গেল, সবাই প্রায় ব্রাহ্মণ। কিন্তু মুনশি হিন্দু মুসলমান দুই-ই হতে পারেন। সাধারণত জৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণেরা ম্লেচ্ছদের পড়াতে রাজি হতেন না। হিন্দুদের মধ্যে মুনশি হতেন প্রধানত কায়স্থ এবং বৈদ্যরা। তাছাড়া শুধু সংস্কৃত জানলে মুনশির কাজ পাওয়া ভার। রাজভাষা তখনও ফারসি। আর, হিন্দুদের মধ্যে সে ভাষা মনোযোগ দিয়ে আয়ত্ত করেছিলেন বৈদ্য এবং কায়স্থরাই। সুতরাং, ফারসিনবিশ মুসলমানদের মতো সাহেব কুঠিতে তাঁদেরও বিলক্ষণ খাতির। অন্তত ১৮০০ সনে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে পর্যন্ত। কোম্পানির নতুন কর্মচারীদের ভাষা শেখানোর জন্যই সে কলেজের প্রতিষ্ঠা। ফলে প্রাইভেট টিউটার হিসাবে মুনশির খাতির কিছুটা কমে গেল। তবু যাঁরা ভাল রেজাল্ট করতে চান তাঁরা বাড়িতেও মুনশি পুষতে লাগলেন। আর, যাঁরা চাকুরে নন, তাঁদের কাছে খাতির তো আগের মতোই। তাছাড়া মুনশি প্রসঙ্গে আরও একটা কথা মনে রাখতে হবে। মুনশি শুধু ভাষা শিক্ষক নন, ‘হবসন-জবসন’-এর মতে সে সাহেবের সচিব, কেরানি, দোভাষী এবং একাধারে আরও অনেক কিছু। এহেন করিৎকর্মা মানুষটি মাইনে কিছু বেশি চাইবে বইকি। শ্রীরামপুর থেকে ‘কথোপকথন’ প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮০১ সনে। প্রাথমিক কথোপকথনের পর সাহেব বললেন—‘তুমি আজি অবধি আমার মুনশিগিরিতে প্রবর্ত হইলা তোমার মাহিনা কি হবে।

—সাহেব আমাদের মাহিনার বরাওর্দ একটা ঠেকানো নাই, ত্রিশ টাকা চলন, তবে মনিবে মেহেরবানি করিয়া জেয়াদাও দিতেছেন।

—ভালো তোমার মাহিনা যাহা আমি প্রকৃত বুঝিব তাহা দিব তোমাকে।’

তারপর কাজের কথা।

‘—মুনশি লেখাপড়া শিক্ষণের কোন সময় উপযুক্ত।

—সাহেব প্রাতঃকালে হাজারির পরে দুই প্রহর পর্যন্ত ও সেই মতো রাত্রেও চাহা পিয়নের পর দশ ঘড়ি তক।

—আচ্ছা তুমি সময়ানুযায়ী যাতায়াত করিয়া শিক্ষাও আমাকে আমি কাল হাজারির পরে পড়িতে প্রবর্ত হইব।'

ব্যাস, শুরু হয়ে গেল পড়াশুনা।

কেরি সাহেবের মুনশি বিখ্যাত রামরাম বসুকে কেরি কত দিতেন জানেন? কুড়ি টাকা। পরে অবশ্য ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে সেকেন্ড মুনশির চাকুরি পাওয়ায় রামরাম বসুর মাইনে হয় একশো টাকা। ওয়েলেসলির কলেজে মাইনের হার তখন রীতিমতো উঁচু। হেড মুনশির মাস মাহিনা ২০০ টাকা, সেকেন্ড মুনশির ১০০ টাকা, অন্যদের ৮০ টাকা থেকে ৪০ টাকা। সার্টিফায়েড মুনশির মাইনে কিছু কম—৩০ টাকা! ফারসি, হিন্দুস্থানি, সংস্কৃত এবং বাংলা সব বিভাগেই নানা মাপের অনেক মুনশি। তাঁদের মধ্যে হিন্দু মুসলমান দুইই ছিলেন। বিভাগীয় কর্তা হিসাবে ছিলেন দু'চারজন সাহেব। সম্ভবত সেই থেকে সাহেবদের চোখে শিক্ষিত ভারতীয় মাত্রই মুনশি। 'হবসন জবসন' বলছে—সাহেব আমলে মুনশির সেটাও এক অর্থ। এমন কী বইয়ের নামও তখন মুনশি। ফ্রান্সিস গ্ল্যাডউইন তাঁর ফারসি ভাষার ব্যাকরণটির (১৭৯০-১৮০০) নাম রেখেছিলেন—'দি পার্সিয়ান মুনশি'!

মুনশি না হলে তখন কারও চলে না। ছোটো বড়ো মেজো সেজো সব সাহেবের মুনশি চাই। প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদ স্যার উইলিয়াম জোন্সের মুনশি ছিলেন বিখ্যাত পণ্ডিত রামলোচন। তাঁকে তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন কৃষ্ণনগরে। এই রামলোচনের সাহায্যেই 'শকুন্তলা' নাটক অনুবাদের খসড়া তৈরি করেন। চার্লস উইলকিনস্-এর মুনশি ছিলেন কাশীনাথ। তিনি নানা কাজে জোন্সকেও সাহায্য করেছিলেন। হালেদ সাহেবের মুনশি ছিলেন নাকি পূর্ববঙ্গের একজন মুসলমান। হালেদ অবশ্য চিঠিপত্রে একজন বৈদ্য পণ্ডিতকেও স্মরণ করেছেন। অন্যরা, বিশেষত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা যখন কিছুতেই বিদেশিদের কাছে তাঁদের শাস্ত্র, এমনকী ভাষাশাস্ত্রের গোপন চাবিকাঠি তুলে দিতে রাজি নন, তখন এই বৈদ্য সন্তানই নাকি এগিয়ে এসেছিলেন তাঁর সাহায্যে। বাংলাদেশের প্রথম নাট্যকার গেরাসিম লেবেডেফের মুনশি ছিলেন গোলকনাথ দাস। ভারতচন্দ্রের অনুবাদ তাঁরই সাহায্যে। নেপথ্যে এই সব মুনশি পণ্ডিতেরা সেকালে কতভাবে যে সাহেবদের হাত ধরে খ্যাতির আলোক এনেছেন ইতিহাসে তার ইঙ্গিত আছে মাত্র, পুরো স্বীকৃতি নেই। অথচ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিত এবং মুনশিদের রচনাবলির পাতা ওল্টালে বোঝা যায় তাঁরা মোটেই অবহেলাযোগ্য ছিলেন না।

বড়ো মাপের সাহেবদের কথা স্বতন্ত্র। অন্যরা কিন্তু মুনশিদের নিয়ে ব্যঙ্গ বিদ্রুপই করে গেছেন বেশি। তাদের চলনবলন হাবভাব নিয়ে নানা রসিকতা। তাঁদের নিয়ে লঘু মেজাজে পদ্যও লিখেছেন কেউ কেউ। অথচ একটু চিন্তা করলেই বোঝা যায় পুব আর পশ্চিমের ভাবের আদান প্রদানে তাদের ভূমিকা কত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রসঙ্গত একজন ভাগ্যবান মুনশির কথা মনে পড়ছে যিনি আঙুল ফুলে কলাগাছ। তিনি মুনশিকুল-চূড়ামণি নব মুনশি, ওরফে রাজা নবকৃষ্ণ বাহাদুর। কলকাতায় সফলতম প্রাইভেট টিউটার তিনি। নিয়োগের সময় মাইনে ছিল মাসে ষাট টাকা। তিনি হেস্টিংস সাহেবের মুনশি। বছর তিনেক কলকাতায় কাটিয়ে হেস্টিংস যখন কাশিমবাজারে চললেন তখন পার্শ্বচর হিসাবে সঙ্গে নিলেন মুনশি নবকৃষ্ণকে। নবকৃষ্ণ এরপর আর কখনও কোম্পানির সঙ্গ ছাড়েননি। শুরু হল মুনশি নবকৃষ্ণের দিগ্বিজয়ের পালা। ক্লাইভ তাঁকে 'রাজা' করে দিলেন। মুনশি নবকৃষ্ণ অতঃপর পরিচিত হলেন রাজা নবকৃষ্ণ হিসাবে। শোনা যায় হেস্টিংস সাহেবকে তিনি ধার দিয়েছিলেন তিন লাখ টাকা। আর মায়ের শ্রাদ্ধে খরচ করেছিলেন নয় লাখ!

সাহেব সংসর্গে আরও অনেক মুনশি সেদিন বিস্তর রোজগার করেছেন। স্যার জন শোর দেশে যাওয়ার সময় তাঁর মুনশি তাঁকে ১৬০০ পাউন্ড উপহার দিতে চেয়েছিলেন। কেননা, তিনি জানেন, তাঁর সাহেব এই লুটের দেশে বাস করলেও হাত তাঁর শূন্য।

সব মুনশি ওঁদের মতো ভাগ্যবান নয়। ছাত্রসহ তৎকালের একজন মুনশির একখানা ছবি দেখেছিলাম একবার। পুরানো দিনের ছবি। শিল্পীর নাম মনে নেই। কিন্তু ছবিখানা এখনও চোখের সামনে ভাসছে। রাইটার সাহেব জুতোসুদ্ধ পা দুখানি টেবিলের ওপর তুলে দিয়ে কেদারায় এলিয়ে পড়ে আছেন। হাতে তাঁর হুঁকোর নল। টেবিলে লালজলের গ্লাস। মাথার ওপর টানা পাখা। সামনে একটা চেয়ারে হাত জোড় করে বসে আছেন মুনশি। বাটলার নতুন বোতল খুলছে। নীচে লেখা না থাকলে কে বলবে মুনশি? ভাববেন খিদমতগার হয়তো।

খুব কম মুনশিই তাঁদের প্রাপ্য মর্যাদা পেয়েছেন সাহেব কুঠিতে। তিনি যেন সাধারণ ভৃত্যদেরই একজন! সেকালের সাহেবদের ঘর গেরস্থালির কেতাকানুন শিখিয়েছিলেন ক্যাপটেন উইলিয়ামসেন নামে আর এক সাহেব। অবশ্য পুঁথিযোগে। তিনি বলছেন, মুনশি ঠিক চাকর নয়, সে নোকর। পদমর্যাদায় নোকররা চাকরের চেয়ে উঁচুতে। কারা চাকর, আর কারা নোকর তাও বিশদ করেছেন তিনি। নোকর হচ্ছে—সরকার, দারোগা, বেনিয়ান, জমাদার, চোবদার, খানসামা, কেরানি আর মুনশি। চাকর—খিদমতগার, মশালচি, বাবুর্চি, ধোপা, মালি, ভিস্তিওয়ালা ইত্যাদি।

তবু কেরি তাঁকে চাকর বলছেন। এবং চাকরের মতোই ব্যবহার করেছেন কিছু কিছু পড়ুয়া। শুধু ঘরে নয়, এমনকী কলেজেও। আগে একজন গবেষক মহাফেজখানায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ সংক্রান্ত কিছু কাগজপত্র খুঁজে পেয়েছেন। তাতে একজন মুনশির লেখা একটি অভিযোগপত্র ছিল। অভিযোগটি শোনার মতো।

বাংলা বিভাগের সেকেন্ড মুনশি আনন্দচন্দ্র শর্মা 'মহামহিম শ্রীযুত কালেজ কৌনসিলার সাহেবাজ বরাবরেষু' লিখছেন—'কেনেডি সাহেবের নিকট দুই বৎসর হইল আমি হাজির আছি। ২৫ নবম্বর শনিবার নিরপরাধে আমাকে অনেক ঘুষা ও থাবড়া এমন মারিয়াছেন যে আমি দুই দিবস শয্যাগত ছিলাম।...লোকে চাকরি করে আপনার প্রাণ রক্ষার্থে এঁহার নিকট যাওয়াতে কখন কী হইবে ইহার নিশ্চয় করিতে না পারিয়া যথেষ্ট ভীত হইয়াছি অতএব অনুগ্রহপূর্বক হুকুম হয় আমি অন্য সাহেবের নিকট হাজির থাকি। ইতি—তারিখ ২৮ নবম্বর (১৮১০)।'

ছাত্রটি জবাবে বলেছিলেন—মুনশি তাঁকে একটি শব্দের ভুল অর্থ শিখিয়েছিলেন তাই তিনি তাকে উচিত শিক্ষা দিয়াছেন। ইংলিশ নামে আর এক পড়ুয়া কলেজের মুনশি নজরউল্লাকে চাবুক মারেন। অপরাধ তিনি ছাত্রের সামনে বসেছিলেন। উর্দু বিভাগের মুনশি গোলাম হোসেনও একবার তাঁর ছাত্রের হাতে প্রহৃত হন। কলেজ কর্তৃপক্ষ তাঁকে চেপে ধরেছিলেন। ছাত্রটি খোলাখুলি স্বীকার করেন তাঁর জানা ছিল না মুনশি বা পণ্ডিতদের ভদ্রলোক বলে গণ্য করতে হবে।

শ্রীপান্থ (১৯৩২—২০০৪) : প্রকৃত নাম নিখিল সরকার, শ্রীপান্থ তাঁর ছদ্মনাম। লেখাপড়া করেছেন ময়মনসিংহ আর কলকাতায়। তরুণ বয়স থেকেই সাংবাদিকতার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। চাকরি করেছেন আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে। সাংবাদিকতার পাশাপাশি দীর্ঘদিন গভীর গবেষণা করেছেন। তাঁর গবেষণার বিষয় সামাজিক ইতিহাস, বিশেষত কলকাতার সমাজ ও সংস্কৃতি। 'দেবদাসী', 'ঠগী', 'হারেম' ইত্যাদি বইয়ের সঙ্গে উল্লেখযোগ্য কলকাতা বিষয়ক বইগুলিও— 'আজব নগরী', 'শ্রীপান্থের কলকাতা', 'যখন ছাপাখানা এলো', 'মোহন্ত এলোকেশী সম্বাদ', 'কেয়াবাৎ মেয়ে', 'মেটিয়াবুরুজের নবাব', 'বটতলা', 'কলকাতা'। তাঁর লেখা অন্যান্য বইগুলির মধ্যে রয়েছে 'আজব চিড়িয়াখানা', 'ঐতিহাসিক অনৈতিহাসিক', 'কালি আছে কলম নেই, কাগজ আছে মন নেই', 'ক্রীতদাস', 'জিপসীর পায়ে পায়ে', 'দায়', 'পড়ার বইয়ের বাইরে পড়া', 'বর্গী', 'মঙ্গলপান্ডের বিচার', 'স্মৃতির পুজো', 'হাতে ঘড়ি চোখে চশমা' প্রভৃতি। বাংলা মুলুকে প্রথম ধাতব হরফে ছাপা বই হ্যালহেডের 'আ গ্রামার অব দ্য বেঙ্গাল ল্যাঙ্গোয়েজ'-এর সাম্প্রতিক একটি সংস্করণের দীর্ঘ ভূমিকা তিনি লিখেছেন।

কবিতা

কপোতাক্ষ নদ

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

সতত, হে নদ, তুমি পড় মোর মনে।
সতত তোমার কথা ভাবি এ বিরলে;
সতত (যেমতি লোক নিশার স্বপনে
শোনে মায়া-যন্ত্রধ্বনি) তব কলকলে
জুড়াই এ কান আমি ভ্রান্তির ছলনে!—
বহু দেশে দেখিয়াছি বহুনদ-দলে,
কিন্তু এ স্নেহের তৃষ্ণা মিটে কার জলে?
দুগ্ধ-স্রোতোরূপী তুমি জন্ম-ভূমি-স্তনে!
আর কি হে হবে দেখা? —যতদিন যাবে,
প্রজারূপে রাজরূপ সাগরেরে দিতে
বারিরূপ কর তুমি; এ মিনতি, গাবে
বঙ্গজ-জনের কানে, সখে, সখা-রীতে
নাম তার, এ প্রবাসে মজি প্রেম-ভাবে
লইছে যে তব নাম বঙ্গের সংগীতে!

মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩) : জন্ম বাংলাদেশের যশোর জেলার সাগরদাঁড়িতে। হিন্দু কলেজে পড়ার সময়েই ইংরেজিতে সাহিত্যচর্চা শুরু করেন। ১৮৪৩ সালে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেন। বাংলায় সাহিত্যসৃষ্টি শুরু করে মধুসূদন black verse -এর অনুসরণে অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্তন করে বাংলা কাব্যে যুগান্তর আনেন। গ্রিক, ল্যাটিন ও সংস্কৃত ভাষায় তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল। তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ *মেঘনাদবধ কাব্য।* তাঁর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ : *তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য, বীরাঙ্গনা কাব্য, ব্রজাঙ্গনা কাব্য, চতুর্দশপদী কবিতাবলী।* তাঁর রচিত নাটকগুলির মধ্যে রয়েছে *শর্মিষ্ঠা, পদ্মাবতী, মায়াকানন, কৃষ্ণকুমারী* প্রভৃতি। এছাড়া তিনি *বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ* ও *একেই কি বলে সভ্যতা* নামে দুটি প্রহসন রচনা করেন।

প্রকৃতি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আকাশভরা সূর্য-তারা, বিশ্বভরা প্রাণ,
তাহারি মাঝখানে আমি পেয়েছি মোর স্থান,
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান।।
অসীম কালের যে হিল্লোলে জোয়ার-ভাঁটায় ভুবন দোলে
নাড়িতে মোর রক্তধারায় লেগেছে তার টান,
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান।।
ঘাসে ঘাসে পা ফেলেছি বনের পথে যেতে,
ফুলের গন্ধে চমক লেগে উঠেছে মন মেতে,
ছড়িয়ে আছে আনন্দেরই দান,
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান।
কান পেতেছি, চোখ মেলেছি, ধরার বুকে প্রাণ ঢেলেছি,
জানার মাঝে অজানারে করেছি সন্ধান,
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান।।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) : জন্ম কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে। অল্পবয়স থেকেই ঠাকুরবাড়ি থেকে প্রকাশিত ভারতী ও বালক পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন। দীর্ঘ জীবনে অজস্র কবিতা, গান, ছোটোগল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ লিখেছেন, ছবি এঁকেছেন। এশিয়ার মধ্যে তিনিই প্রথম নোবেল পুরস্কার পান ১৯১৩ সালে 'Song Offerings' এর জন্যে। দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র ভারত আর বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত তাঁর রচনা। কবির প্রথম জীবনে লেখা কাব্যগ্রন্থগুলি হলো — 'সন্ধ্যাসঙ্গীত', 'প্রভাতসঙ্গীত', 'ছবি ও গান', 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' এবং 'কড়ি ও কোমল'। ১৮৮৮ থেকে ১৮৯৬ — মাত্র আট বছরে কবি প্রতিভার যে অভূতপূর্ব বিকাশ ঘটেছে তারই চিহ্ন সুমুদ্রিত এই পর্বের চারখানি কাব্যগ্রন্থে — 'মানসী', 'সোনারতরী', 'চিত্রা' ও 'চৈতালি'তে। এরপর কবি রচনা করেন কণিকা, কথা ও কাহিনী, কল্পনা, ক্ষণিকা ও নৈবেদ্য। গীতাঞ্জলি পর্বের প্রধান তিনখানি কাব্যগ্রন্থ গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য ও গীতালি, ১৯১৬ তে বলাকা, ১৯২৫ এ পূরবী এবং ১৯২৯-এ মহুয়া রচনা করেন কবি রবীন্দ্রনাথ। 'পুনশ্চ' থেকে রবীন্দ্রকাব্যের শেষ পর্বের শুরু। এ পর্বের উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থগুলি হলো 'শেষ সপ্তক', 'প্রান্তিক', 'নবজাতক', 'সানাই', 'রোগশয্যায়', 'আরোগ্য' ইত্যাদি।

মানুষের নামে

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সাদা কালো হলদে বাদামি নানান রঙের মানুষ
শিশু-বৃদ্ধ যুবক-যুবতী
দেশে দেশে
যারা পাখির চেয়েও বড়ো প্রতীক্ষায় নীড় বাঁধে
জনক-জননী সন্তান-সন্ততিকে নিয়ে

তাদের আমি দেখতে পাই পৃথিবীর সব দেশে
রুশ ভারত চিন আমেরিকা মিশর পাকিস্তান কঙ্গো কিউবা
যখন যেখানে একটি সদ্যোজাত শিশু কান্না শুনি
অথবা প্রেমিক-প্রেমিকার মৃদু গুঞ্জনে অনুভব করি
একটি রাত ভোর হচ্ছে

তাদের আমি দেখতে পাই
অন্ধকারের মধ্যে ক্রমেই স্পষ্ট হচ্ছে, আর তখনই তাদের মুখে
আমার নিজের নাম শুনতে পাই
বুঝতে পারি আমিও একজন মানুষ, পবিত্র এবং নিরপরাধ।

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৯২০-১৯৮৫) : আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান কবি। বর্তমান বাংলাদেশের ঢাকা জেলার বিক্রমপুরে জন্ম। লেখাপড়া করেছেন কলকাতার রিপন স্কুল এবং কলেজে। মানবতাবাদী এই কবির কবিতায় দারিদ্র্যপীড়িত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর ছবি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। সমাজের উপর আস্থা না হারিয়ে তিনি সুন্দর সমাজের স্বপ্ন দেখেছেন। তাঁর রচিত অজস্র কাব্যগ্রন্থে প্রকৃতি, চারপাশের মানুষজন, নানান জীবন সংগ্রাম ও পরিস্থিতি রূপায়িত হয়েছে। *গ্রহচ্যুত, রাণুর জন্য, লখিন্দর, তিন পাহাড়ের স্বপ্ন, ভিসা অফিসের সামনে, এই জন্ম, জন্মভূমি, শীত বসন্তের গল্প, বেঁচে থাকার কবিতা, অফুরন্ত জীবনের গান* ইত্যাদি তাঁর প্রধান কাব্যগ্রন্থ। ১৯৮২ সালে কবি তাঁর 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' (১৯৭০) -র জন্য রবীন্দ্র পুরস্কার লাভ করেন।

জনমদুখিনী

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

যতদিন ছিলে তুমি পরাধীনা ততদিন ছিলে তুমি সবার জননী
এখন তোমাকে আর মা বলে ডাকে না কেউ
লেখে না তোমার নামে কবিতা

বুক মোচড়ানো সুরে সেইসব গান
গুপ্ত কুঠুরিতে মৃদু মোমের আলোর সামনে আবেগের মাতামাতি
জনমদুখিনী মা কোনোদিন স্বাধীন হলে না
এখন তোমাকে আর ভুলেও ডাকে না কেউ
আঁকে না তোমার কোনো ছবি

কেউ কারো ভাই নয়, রক্তের আত্মীয় নয়
নদীর এপার দিয়ে, নদীর ওপার দিয়ে চলে যায় বিষণ্ণ মানুষ।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় (১৯৩৪-২০১২) : জন্ম বাংলাদেশের ফরিদপুরে। ১৯৫৩ সালে প্রকাশিত ‘কৃত্তিবাস’ পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক। জনপ্রিয় এই সাহিত্যিক উপন্যাস, গল্প, প্রবন্ধ, ফিচার, ভ্রমণ কাহিনি, ছড়া, কবিতা, রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। ‘একটি চিঠি’ তাঁর লেখা প্রথম কবিতা। *আত্মপ্রকাশ* তাঁর লেখা প্রথম উপন্যাস, আর প্রথম কাব্যগ্রন্থ *একা এবং কয়েকজন*। প্রথম কিশোর-উপন্যাস ‘ভয়ংকর সুন্দর’। *নীললোহিত*, *সনাতন পাঠক* ও *নীল উপাধ্যায়* ছদ্মনামেও লিখেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে রয়েছে, *আমি কীরকমভাবে বেঁচে আছি*, *বন্দি জেগে আছো*, *আমার স্বপ্ন*, *সত্যবন্ধ অভিমান*, *সোনার মুকুট থেকে*, *জাগরণ হেমবর্ণ*, *স্মৃতির শহর*, *চল যাই*, *হঠাৎ নীরার জন্য*, *নীরা হারিয়ে যেও না*, *সুন্দরের মন খারাপ মাধুর্যের জ্বর*, *রাত্রির রঁদেভু*, *মন ভাল নেই* প্রভৃতি। ‘আনন্দ পুরস্কার’, ‘বঙ্কিম পুরস্কার’, ‘সাহিত্য আকাদেমি’ ইত্যাদি নানা পুরস্কারে তিনি সম্মানিত।

আন্তর্জাতিক গল্প

বুমবুম

জুল ক্লারেতি

ছোট্ট শুভ্র বিছানায় বড়ো বড়ো চোখে রশ্মিহীন দৃষ্টি মেলে দিয়ে পড়েছিল শিশুটি। যে বিচিত্র জগতে প্রাণবান জীবের প্রবেশ নিষেধ, সেই জগতের দৃশ্য যেন ভেসে উঠেছে চোখে।

পায়ের কাছে মা বসে প্রাণপণে কান্না রোধ করছিলেন। দুঃখে আকুল হয়ে দেখছিলেন শীর্ণ কোমল মুখটিতে দুরারোগ্য ব্যাধির নিষ্ঠুর অভিযান। বাপ জোয়ান শ্রমিক; তবু চোখের পাতা ছাপিয়ে উথলে উঠছিল অশ্রু; রক্তবর্ণ চোখ থেকে সজোরে তাকে বার বার মুছে ফেলছিলেন তিনি।

সকাল হল, জুন মাসের একটি সুন্দর মিষ্টি সকাল। শ্রমিকপল্লি রু-দেস্-আবেস্-এর প্রকোষ্ঠটাও সূর্যালোকে হেসে উঠল। মজদুর জাক লেগ্রাঁ এবং মাদ্‌লেন লেগ্রাঁ-র শিশুপুত্র ফ্রাঁসোয়া ধীরে মরণ-পানে এগিয়ে চলল।

সাতটি বছর বয়স তার। সোনালি চুল এব গোলাপি গাল, সুস্থ সবল শিশু। তিন সপ্তাহ আগেও সে ছিল প্রজাপতির মতো চঞ্চল। তারপর একদিন তার জ্বর হল, ইস্কুল থেকে তাকে নিয়ে এল ওরা। মাথা ভারী, গা পুড়ে যাচ্ছে। সেদিন থেকে সে শুয়ে আছে বিছানায়। তার ছোট্ট জুতোজোড়াকে চকচকে করে ঘরের কোণে রেখে দিলেন মা। সেদিকে চোখ পড়লেই জ্বরের ঘোরে বলে উঠত শিশু :

‘ফেলে দাও, জুতো ফেলে দাও। ফ্রাঁসোয়া যাবে না, আর কোনোদিন ইস্কুলে যাবে না—কক্ষনো না, কক্ষনো না।’

বাবা বলে উঠতেন, ‘চুপ কর, চুপ চুপ, অমন বলে না।’ আর মা বালিশে মুখ লুকোতেন, পাছে শিশু তাঁর কান্না শুনতে পায়।

অবশেষে একদিন কথাও প্রায় বন্ধ হয়ে এল। দু-দিন ধরে ওইটুকু শিশুর ওপর চেপে রইল কী এক অবসাদ, মনে হল সাত বছরেই তার বাঁচবার ইচ্ছে চলে গেছে, মৃত্যুর কাছে সে আত্মসমর্পণ করেছে। ক্লান্ত, ব্যথিত ছোটো মুখখানা যন্ত্রণায় বালিশের এপাশ ওপাশ করছে—রক্তশূন্য ওষ্ঠাধর থেকে চিরতরে বিদায় নিয়েছে হাসি—বিকারগ্রস্ত চোখে কী যেন সে খোঁজে—দূরে, বহুদূরে, নীলসায়রের অচিনপুরে।

হয়তো স্বর্গই খুঁজছে ফ্রাঁসোয়া—কম্পিত বুকে মা ভাবলেন।

কত কিছু খাওয়াতে চেষ্টা করলেন মা-বাবা—একটু গরম চা, একটু সিরাপ, একটু মিষ্টি। খেল না সে।

বাবা বললেন, ‘তোর কিছু চাই ফ্রাঁসোয়া?’

কিছুই চাই না ওর। সব দরকার ফুরিয়ে গেছে।

ডাক্তার বলে গেলেন, 'এই ঘোরটা কাটাতেই হবে। আপনারা ওর পিতা-মাতা ওকে আপনারা চেনেন। খুঁজে বার করুন কী করে ওকে একটু হাসানো যায়, নূতন জীবন এনে দেওয়া যায়। মেঘের রাজ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে ওর মন, তাকে ফিরিয়ে আনতেই হবে।'

এই বলে চলে গেলেন ডাক্তার।

খুঁজে বার করতে হবে? হ্যাঁ, ফ্রাঁসোয়া ওঁদের নাড়ি-ছেঁড়া সন্তান আর ফ্রাঁসোয়াকে ওঁরা চেনেন না? ফ্রাঁসোয়া কী ভালোবাসে? রবিবার বিকেলে শহর ছাড়িয়ে গাঁয়ের পথে বেড়াতে যাওয়া, তারপর সঙ্গের পর একরাশ কাশফুল কুড়িয়ে বাপের কাঁধে চেপে প্যারি-তে ফিরে আসা। আর কী? শাঁজ-এলিজে-র ধারে বড়োলোকদের বাচ্চাদের সঙ্গে পুতুলনাচ দেখতে ভালো লাগে তার। খেলনা ভালোবাসে সে। কত কী কিনে দিয়েছিলেন বাবা—রং চং করা তালপাতার সেপাই একরাশ। সেগুলো আবার বার করলেন বাবা, সাজালেন বিছানার পাশে, বাধালেন পুতুলরাজ্যের যুদ্ধ। উদ্যত অশ্রু চেপে রেখে হাসতে লাগলেন বাবা, যদি সন্তানও হাসে।

'এই দ্যাখ, কী ঘোর যুদ্ধ বেধেছে—দুম! দড়াম! আর এই, এই, এই দ্যাখ—এ হল সেনাপতি। মনে আছে তোর? সেই যে একবার একটা সেনাপতি দেখেছিলাম বোয়া দ্য বুলোইন্-এর দোকানে? খুব ভালো হয়ে থাক, মা যা দেবে খা, তাহলে তোকে ওইরকম জেল্লাদের জামাপরা এক সেনাপতি কিনে দেব। কেমন? পছন্দ তো? কিনে আনব? সেনাপতি একটা?

জ্বরে ভুগে ছেলেটার গলা ভেঙে গেছে, ধরা গলায় বলল, 'না।'

'একটা পিস্তল নিবি? মার্বেলগুলি চাই? আচ্ছা! তির ধনুক তয়ের করে দেব?'

নিষ্ঠুর উদাসীন স্বরে ফ্রাঁসোয়া বলল, 'না!'

যাই বলেন বাবা— যত পুতুল বেলুনের লোভ দেখান অক্ষম আকুল পিতা, সবেরই জবাব এক নির্মম বুক-ফোটানো—না! না! কিছুই চাই না ফ্রাঁসোয়ার।

এবার এলেন মা, ওরই বালিশে মাথা রেখে কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে বললেন, 'কী চাই তোর, আমাকে বল মানিক! মাকে বল, চুপিচুপি বল!'

ফ্রাঁসোয়ার চোখে একটা অদ্ভুত দৃষ্টি খেলে গেল। সোজা উঠে বসল বিছানায়। শীর্ণ হাত দুখানা মেলে দিল—কী যেন সে ধরতে চায়, ছুঁতে চায়। একাধারে আদেশ আর মিনতি ভরা কণ্ঠে বলল, 'আমি বুম-বুম চাই!'

বুম-বুম!!

মা এক ভীত সন্ত্রস্ত দৃষ্টিনিক্ষেপ করলেন বাবার দিকে। কী বলছে ছেলে? ভুল বকছে? জ্বরের ঘোরে?

বুম-বুম!!

বুঝতে পারেন না মা, আর বুঝতে পারেন না বলেই ভয়ে তাঁর গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। অবাধ্য, দুষ্টু ছেলে ক্রমান্বয়ে বলে চলে, 'আমি বুম-বুম চাই! আমাকে বুম-বুম এনে দাও! বুম-বুম কই?'

ভাসা-ভাসা স্বপ্নকে এতদিন পরে ব্যক্ত করতে পেরে সে যেন আকুল হয়ে উঠেছে। মায়ের ব্যথা বোঝার তার সময় নেই।

পাগলিনীর মতন মা বাবার হাত চেপে ধরেন, কম্পিতস্বরে বলতে থাকেন, 'ওগো, কী বলছে গো? ও কি চলে যাবে নাকি? আমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছে নাকি?' কিন্তু বাবার রোদে-জলে-পোড়া মুখখানায় হাসি ফুটে ওঠে—অভিভূতের মতন সে হাসি। যেন মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত কয়েদি হঠাৎ মুক্তির সংবাদ পেয়েছে।

বুম-বুম! বাবার মনে পড়েছে— গত ইস্টারের সময় ফ্রাঁসোয়ার পুলকিত হাসি। সোনালি রং করা মুখ স্টেজের উপর এসে দাঁড়াল এক ক্লাউন। কালো ঢিলে আলখাল্লা পরা বুকে আঁকা এক উজ্জ্বল প্রজাপতি। ক্লাউন নাচল, পিঠে আস্ত এক সওয়ার নিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে ঘোড়দৌড় করল, হাতে ভর দিয়ে টুপি শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে মাথায় লুফে নিতে লাগল—ক্রমে মাথার ওপর গজিয়ে গেল টুপির পাহাড়। আর প্রত্যেকটা খেলার শেষে বিজ্ঞের মতন দৈববাণী উদ্‌গার করল 'বুম-বুম'! আর সঙ্গে সঙ্গে প্রেক্ষাগৃহ ফেটে পড়ছিল হাততালিতে। দেখে ফ্রাঁসোয়ার কী আনন্দ!

বুম-বুম। এই বুম-বুমকে চাই। থিয়েটারের ভাঁড় বুম-বুম! সারা শহরের সবচেয়ে জনপ্রিয় ক্লাউন, সারা দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিনেতা—তাকেই চাই ফ্রাঁসোয়ার। তাকে পেতে অধীর হয়েছে মন। ছোট্ট শুভ্র বিছানায় শুয়ে অক্ষম অভিমানে শুকিয়ে যাচ্ছে ছেলে।

সেদিন বিকেলে জাক লেগ্রাঁ কিনে আনলেন একটা বড়ো সোনালি ক্লাউন পুতুল। দাম নিল প্রচুর, লেগ্রাঁর চারদিনের মজুরির সমান, চারদিনের কেন কুড়ি দিন, ত্রিশ দিন, এক বছরের মজুরি চাইলেও দিয়ে দিতেন লেগ্রাঁ, বুকের ধনের মুখে একরত্তি হাসি ফোটাতে।

শিশু কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল চোখ-ঝলসানো পুতুলটার দিকে। তারপর বিষাদগ্রস্ত কণ্ঠে বলল, 'এ ছাইয়ের বুম-বুম! আমি বুম-বুম চাই।'

একবার বাবার মনে হল কম্বলে জড়িয়ে ছেলেকে নিয়ে যান থিয়েটারে, বলেন, ওই দ্যাখ বাবা বুম-বুম! প্রাণভরে একবার দেখুক উজ্জ্বল আলোয় উদ্ভাসিত ক্লাউনের মুখ। কিন্তু সে অসম্ভব; প্ররিশ্রমেই মরে যাবে ছেলে। তাই বাবা অন্যপথ ধরলেন। থিয়েটারে গিয়ে বিখ্যাত ক্লাউনের ঠিকানা জোগাড় করে চললেন শৌখিন মঁমার্ত পল্লি-অভিমুখে। বিরাট সিঁড়ি ভেঙে শিল্পীর ফ্ল্যাটে যেতে যেতে লেগ্রাঁর পা কাঁপতে লাগল। একটা মজুরের পক্ষে কাজটা দুঃসাহসিক হচ্ছে না? তবু অভিনেতারা তো বড়োলোকদের বাড়িতে কখনো-সখনো বিশেষ অনুষ্ঠান করে থাকেন—লেগ্রাঁ শুনছেন সেকথা। কত চাইবেন তিনি? লেগ্রাঁ সর্বস্ব বেচে সে মূল্য দিতে প্রস্তুত শুধু যদি একবার—তিনি শিশুর শয্যাপার্শ্বে এসে মুখ দেখিয়ে যান। যাই হোক, এখন মজুরের বাচ্চা জাক লেগ্রাঁ-কে আদৌ দেখা দেবেন কি?

যার সঙ্গে দেখা হল, সে বুম-বুম নয়, বিখ্যাত অভিনেতা মঁসিয়ে মোরোঁ। কী সুন্দর ঘরখানাকে সাজিয়েছেন শিল্পী, চারিদিকে বই, ছবি আর মর্মর-মূর্তি। লেগ্রাঁকে কিন্তু নিয়ে বসালেন আরেকখানা ঘরে—ছোট্ট নীরস ঘর, ডাক্তারখানার মতন। ব্যবসায়িক কথাবার্তা এখানেই বলেন মোরোঁ।

অনেকক্ষণ ঠাহর করেও লেগ্রাঁ বুম-বুমকে খুঁজে পেলেন না ওই গম্ভীর মুখখানায়। টুপিটাকে হাতে দরে ভয়ে দোমড়াতে লাগলেন। নীরবে তাকিয়ে রইলেন অভিনেতা। তারপর এক সময়ে পিতার মুখ

ফুটল; বিশ্রামে ব্যাঘাত ঘটাবার জন্যে ক্ষমা চাইলেন তিনি। যা বলতে এসেছেন তা বড়োই অদ্ভুত, ধৃষ্টতা—এরকমটা তিনি করতে চাননি—ক্ষমা করবেন, মাপ করবেন—মানে ইয়ে সবই ছাওয়ালটার মুখ চেয়ে।

'বড়ো আদরের ছাওয়াল, হুজুর, আর বড়ো বুদ্ধিমান। কেলাসে সব সময় ফার্স্ট হয়, এক অঙ্ক বাদে। আঁককষা ওর আসেই না হুজুর। হ্যাঁ, স্বপন দেখে, জেগে জেগে দেখে হুজুর, কবি-কবি ভাব। কেন তা বলছি, জানেন স্যার? প্রমাণ আছে!'

একটু ঘাবড়ে থেমে যান লেগ্রাঁ, তারপর পুনরায় সাহস জুটিয়ে এক নিঃশ্বাসে বক্তব্য শেষ করলেন।

'প্রমাণ হল, সে আপনাকে দেখতে চায়। আর কোনো চিন্তা নেই। আপনি সর্বসময় ধ্রুবতারার মতন ওর চক্ষের সামনে বসে রয়েছেন। আপনাকে চায়।'

ফ্যাকাশে হয়ে যায় লেগ্রাঁর মুখ, কপালে জেগে রয়েছে বড়ো বড়ো স্বেদবিন্দু। দিগ্‌বিজয়ী অভিনেতার দিকে চোখ তুলে তাকাতে সাহস হয় না। কী বলবেন বুম-বুম? তাড়িয়ে দেবেন? কী ভাবছেন ভদ্রলোক? পাগল ঠাওরালেন না তো? অর্ধচন্দ্র দেবেন কি?

'কোথায় থাকো তোমরা?' বললেন বুম-বুম।

'কাছেই হুজুর। রু-দেস-আবেস'।

'চলো।' বললেন অভিনেতা। 'ছানাটা বুম-বুমকে দেখতে চায় বটে? বেশ, দেখা পাবে'।

নিজের ঘরের দরজা খুলে হুড়মুড় করে লেগ্রাঁ ঢুকলেন। চিৎকার করে বললেন, 'ফ্রাঁসোয়া, দুষ্টু ছেলে, তোর কপাল খুলেছে—দেখ কে এসেছে। বুম-বুম রে! বুম-বুম!'

আনন্দের হাসি খেলে গেল ফ্রাঁসোয়ার মুখে। মায়ের হাতে ভর দিয়ে উঠে বসল সে। বাবার পাশে দাঁড়ানো লম্বা কোট পরা ভদ্রলোকের দিকে কয়েক নিমেষ তাকিয়ে রইল, ভাবতে লাগল এ কে। বাবা-মা বলে উঠলেন, 'এই তো বুম-বুম! পেলি তো বুম-বুম!' ধীরে ধীরে আবার শুয়ে পড়ল, মুখ গুঁজল বালিশে।

বড়ো দুঃখে বলল সে, 'না এ তো বুম-বুম নয়'।

মা এবার প্রকাশ্যেই কেঁদে ফেলেন। গম্ভীরভাবে অভিনেতা তাকালেন বাপের দিকে। প্রায় কর্কশস্বরে বলেন, 'ঠিক, এ বুম-বুম নয়!' বলেই গট করে চলে যান। বোকা বনে যান পিতা।

করুণ ক্ষীণ স্বরে রোগী বলতে থাকে, 'আর দেখব না বুম-বুমকে। আর কোনো দিনও দেখব না বুম-বুমকে'।

তারপর যেন বিভোর হয়ে সে দেখতে থাকে ধূপছায়ার রাজ্যের পরিদের। হয়তো ওখানেই লুকিয়ে আছে বুম-বুম, ওই তেপান্তরের মাঠে, ওখানেই যেতে হবে ফ্রাঁসোয়াকে।

আধ ঘণ্টাও কাটেনি—এমন সময় হঠাৎ দড়াম করে দরজা খুলে গেল আবার। দেখা গেল সোনালি মুখ, মাথায় হলদে ঝুঁটি, কালো আলখাল্লা, বুকে পিঠে প্রজাপতি আর আকর্ণ-বিস্তৃত হাসি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বুম-বুম। সত্যিকারের বুম-বুম, থিয়েটারের বুম-বুম, জনগণের বুম-বুম, ফ্রাঁসোয়ার বুম-বুম, বুম-বুম।

আর ছোট্ট শুভ্র বিছানায় বসে ফ্রাঁসোয়া হাসতে লাগল, কাঁদতে লাগল, হাততালি দিয়ে দক্ষযজ্ঞ বাধিয়ে তুলল। বেঁচে গেছে ফ্রাঁসোয়া, মৃত্যুকে সে পরাস্ত করেছে। দেশলাইয়ের কাঠির মতন দপ করে জ্বলে উঠল তার সাত বছরের জমানো যত আনন্দ আর হাসি :

'এই তো বুম-বুম! আবার এসেছে বুম-বুম! মজা। কী মজা। কেমন আছ বুম-বুম? ভালো আছ তো?'

সেদিন ডাক্তার এসে দেখেন বিছানায় বসে এক বৃহদাকার রংচঙে ক্লাউন, রোগীকে হাসাচ্ছে, আর বিনা বাধায় রোগী তার হাত থেকে ওষুধ খাচ্ছে।

ক্লাউন বলছে, 'খা বলছি, নইলে বুম-বুম এখান থেকে চম্পট দেবে!' রোগীর ওষুধ না খেয়ে উপায় নেই।

ক্লাউন বলে, 'কেমন লাগল ওষুধ? বল ভালো, নইলে—'

রোগী বলে, 'খুব ভালো লাগল।'

ডাক্তারকে দেখে ক্লাউন বলে, 'কী হিংসে হচ্ছে বুঝি। তা হবারই কথা। আপনার ওষুধের চেয়ে আমার রং-চং যেন বেশি কাজ করেছে বলে মনে হচ্ছে'

বাব-মা দুজনেই কেঁদে ফেললেন, কৃতজ্ঞতায়, আনন্দে।

ফ্রাঁসোয়া যতদিন না উঠে খেলে বেড়াতে লাগল, ততদিন প্রত্যেক বিকেলে থিয়েটারে যাওয়ার পথে একটানা বিরাট গাড়ি এসে দাঁড়াত নোংরা বস্তির মধ্যে। আপাদমস্তক ওভারকোটে ঢেকে, কলার আর টুপিতে মুখ আবৃত করে একজন বলিষ্ঠ পুরুষ ঢুকে যেত লেগ্রাঁর ঘরে।

ঘরে শুরু হত বুম-বুম এর নাচ।

যেদিন ফ্রাঁসোয়া বিছানা ছেড়ে উঠল সেদিন লেগ্রাঁ অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, 'কত দিতে হবে হুজুর? কী দিতে পারি আপনাকে? ঋণ শোধ করা অসম্ভব, তবু বলুন কী দেব।'

দৈত্যের মতন একখানা বিশাল থাবা বাপের দিকে এগিয়ে দিয়ে ক্লাউন বলল, 'কী দেবে? হাতে হাত দাও'।

তারপর ছেলের গালে চুমো খেয়ে অভিনেতা মোরোঁ বললেন, 'হ্যাঁ, একটা জিনিস দিতে পার। একটা অনুমতি। যাতে ভবিষ্যতে বিজ্ঞাপন লিখতে পারি : বুম-বুম, একাধারে ক্লাউন ও ডাক্তার, লেগ্রাঁর ছোটো ছেলের চিকিৎসা করেছিল এই ধন্বন্তরি।'

অনুবাদ : উৎপল দত্ত

জুল ক্লারেতি (১৮৪০-১৯১৩) : বিশিষ্ট ফরাসি নাট্যকার, পরিচালক ও ঔপন্যাসিক। জন্ম ফ্রান্সের লিমোজেসে। প্যারিসে পড়াশোনার পর তিনি সাংবাদিকতাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন, নাট্যসমালোচক হিসেবে সম্ভ্রম আদায় করে নেন। ১৮৮৫ সালে Theatre Francias-এর পরিচালক হন এবং নাট্যচর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। ১৮৮৮ সালে তিনি Academic Francaise-এর সদস্য নির্বাচিত হন। বিভিন্ন উপন্যাস ও নাটকের সঙ্গে তিনি তিনটি অপেরাও রচনা করেন। ইংরেজিতে অনূদিত তাঁর কয়েকটি বিখ্যাত রচনা : Camille Desmoulins and His wife, The Crime of the Boulevard, Prince Zilah, Which is My Husband, Obsession।

আন্তর্জাতিক কবিতা

আফ্রিকা (আমার মাকে)

ডেভিড দিয়োপ

আফ্রিকা আমার আফ্রিকা
হে আমার প্রাচীন গাথার দর্পিত বীরদের আফ্রিকা
দূরের নদীকূলে বসে ঠাকুমা যার গান করেন
সেই আফ্রিকা আমার
কখনোই আমি জানিনি তোমাকে
কিন্তু আমার চোখ ভরে আছে তোমার রক্তে
মাঠে মাঠে উপচে পড়া তোমার অপরূপ কালো রক্তে
তোমার ঘামের রক্তে
তোমার পরিশ্রমের ঘামে
তোমার দাসত্বের পরিশ্রমে
তোমার সন্তানের দাসত্বে
আফ্রিকা বলো আমায় আফ্রিকা
এই কি তোমার বেঁকে যাওয়া পিঠ
অপমানের ভারে নিচু হয়ে থাকা
কেঁপে ওঠা লালদাগে ভরে ওঠা পিঠ
দুপুরের পথ বেয়ে চাবুকে সম্মত
আর তখনই কোনো এক গাঢ় স্বর জানায় আমাকে
আবেগের অধীর হে সন্তান দেখো ওই তরুণ সমর্থ গাছ
তাকাও তাকিয়ে দেখো
সাদা ঝরে যাওয়া ফুলে কীরকম একা মহিমায়

তোমার আফ্রিকা ওই জেগে উঠছে আফ্রিকা আবার
ধৈর্যে আর দৃঢ়তায় জেগে উঠছে আবার
সেইসব ফল নিয়ে অল্পে অল্পে যা আবার খুঁজে নেবে
মুক্তির কষায় স্বাদ যত!

অনুবাদ : শঙ্খ ঘোষ

ডেভিড দিয়োপ (১৯২৭-১৯৬০) : ফরাসি ভাষার কৃষ্ণাঙ্গ কবিদের অন্যতম ডেভিড দিয়োপ ফ্রান্সের বরডক্সে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাথমিক শিক্ষা সম্পূর্ণ করেন পিতৃভূমি সেনেগালে। স্কুলে পড়ার সময় থেকেই কবিতা লেখার হাতেখড়ি। মাত্র পনেরো বছর বয়সে Presence Africaine পত্রিকায় কবিতা লিখে তিনি জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। Leopold Senghor's শীর্ষক বিখ্যাত সংগ্রহে তাঁর একাধিক কবিতা স্থান পায়। ফ্রান্সের কৃষ্ণাঙ্গ সাহিত্য আন্দোলন Negritude-এ তাঁর বিশেষ অবদান ছিল। তাঁর কাব্যে আফ্রিকা এক বিশেষ জায়গা নিয়েছিল। তাঁর স্বপ্ন ছিল ঔপনিবেশিকতার শৃঙ্খলমুক্ত স্বাধীন আফ্রিকা। ১৯৬০ সালের ২৯ আগস্ট বিমান দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু হয়। Coups de pilon নামক তাঁর কবিতার সংগ্রহটি Hammer Blows নামে ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজি অনুবাদে প্রকাশ পায়।

পূর্ণাঙ্গ সহায়ক গ্রন্থ

রবীন্দ্রনাথের গল্প

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) : জন্ম কলকাতার জোড়াসাঁকোয়। তিনি একাধারে কবি, ঔপন্যাসিক, গল্পকার, নাট্যকার, প্রাবন্ধিক ও গীতিকার। বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রধান রূপকারদের একজন। শিক্ষা বিষয়ে তাঁর বৈপ্লবিক চিন্তা জন্ম দিয়েছিল শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম বিদ্যালয়ের, যা পরে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ পায়। ১৯১৩ সালে তিনি সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান। অন্ধ গোঁড়ামির বিরোধিতা ও নতুন ভাবনাকে স্বাগত জানানো তাঁর লেখার বৈশিষ্ট্য। মাত্র ষোলো বছর বয়স থেকেই রবীন্দ্রনাথ *ভারতী*, *হিতবাদী*, *সাধনা* প্রভৃতি পত্রিকার জন্য ছোটোগল্প লিখতে শুরু করেন। শিলাইদহে (বর্তমানে বাংলাদেশে) জমিদারি পরিদর্শনকালে তিনি খুব কাছ থেকে গ্রামীণ বাংলা ও সাধারণ মানুষের জীবন পর্যবেক্ষণ করেন। গ্রামবাংলার সাধারণ জীবনের সেই অপরূপতা ফুটে উঠেছে তাঁর বিভিন্ন ছোটোগল্পে। তাঁর লেখা ছোটোগল্পগুলির মধ্যে রয়েছে *দেনাপাওনা*, *কাবুলিওয়ালা*, *গুপ্তধন*, *খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন*, *ক্ষুধিত পাষাণ*, *ছুটি*, *ল্যাবরেটরী*, *সুভা*, *নষ্টনীড়*, *অতিথি*, *খাতা*, *হৈমন্তী*, *বলাই*, *পোস্টমাস্টার*, *মধ্যবর্তিনী* প্রভৃতি। তাঁর রচিত ছোটোগল্পগুলি ‘গল্পগুচ্ছ’ সংকলনগ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। গল্পগুচ্ছ থেকে তিনটি গল্প —‘দেনাপাওনা’,‘কাবুলিওয়ালা’ এবং ‘চিত্রকর’ একাদশ শ্রেণির জন্য দেওয়া হল।

দেনাপাওনা

পাঁচ ছেলের পর যখন এক কন্যা জন্মিল তখন বাপমায়ে অনেক আদর করিয়া তাহার নাম রাখিলেন নিরুপমা। এ-গোষ্ঠীতে এমন শৌখিন নাম ইতিপূর্বে কখনো শোনা যায় নাই। প্রায় ঠাকুরদেবতার নামই প্রচলিত ছিল—গণেশ, কার্তিক,পার্বতী তাহার উদাহরণ।

এখন নিরুপমার বিবাহের প্রস্তাব চলিতেছে। তাহার পিতা রামসুন্দর মিত্র অনেক খোঁজ করেন কিন্তু পাত্র কিছুতেই মনের মতন হয় না। অবশেষে মস্ত এক রায়বাহাদুরের ঘরের একমাত্র ছেলেকে সন্ধান করিয়া বাহির করিয়াছেন। উক্ত রায়বাহাদুরের পৈতৃক বিষয়-আশয় যদিও অনেক হ্রাস হইয়া আসিয়াছে কিন্তু বনেদি ঘর বটে।

বরপক্ষ হইতে দশ হাজার টাকা পণ এবং বহুল দানসামগ্রী চাহিয়া বসিল। রামসুন্দর কিছুমাত্র বিবেচনা না করিয়া তাহাতেই সম্মত হইলেন; এমন পাত্র কোনোমতে হাতছাড়া করা যায় না।

কিছুতেই টাকার জোগাড় আর হয় না। বাঁধা দিয়া, বিক্রয় করিয়া, অনেক চেষ্টাতেও হাজার ছয়-সাত বাকি রহিল। এদিকে বিবাহের দিন নিকট হইয়া আসিয়াছে।

অবশেষে বিবাহের দিন উপস্থিত হইল। নিতান্ত অতিরিক্ত সুদে একজন বাকি টাকাটা ধার দিতে স্বীকার করিয়াছিল কিন্তু সময়কালে সে উপস্থিত হইল না। বিবাহসভায় একটা তুমুল গোলযোগ বাধিয়া গেল। রামসুন্দর আমাদের রায়বাহাদুরের হাতে-পায়ে ধরিয়া বলিলেন, 'শুভকার্য সম্পন্ন হইয়া যাক, আমি নিশ্চয়ই টাকাটা শোধ করিয়া দিব।' রায়বাহাদুর বলিলেন, 'টাকা হাতে না পাইলে বর সভাস্থ করা যাইবে না।'

এই দুর্ঘটনায় অন্তঃপুরে একটা কান্না পড়িয়া গেল। এই গুরুতর বিপদের যে মূল কারণ সে চেলি পরিয়া, গহনা পরিয়া, কপালে চন্দন লেপিয়া, চুপ করিয়া বসিয়া আছে। ভাবী শ্বশুরকুলের প্রতি যে তাহার খুব একটা ভক্তি কিংবা অনুরাগ জন্মিতেছে, তাহা বলা যায় না।

ইতিমধ্যে একটা সুবিধা হইল। বর সহসা তাহার পিতৃদেবের অবাধ্য হইয়া উঠিল। সে বাপকে বলিয়া বসিল, 'কেনাবেচা-দরদামের কথা আমি বুঝি না, বিবাহ করিতে আসিয়াছি বিবাহ করিয়া যাইব।'

বাপ যাহাকে দেখিল তাহাকেই বলিল, 'দেখেছেন মহাশয়, আজকালকার ছেলেদের ব্যবহার।' দুই-একজন প্রবীণ লোক ছিল, তাহারা বলিল, 'শাস্ত্রশিক্ষা, নীতিশিক্ষা একেবারে নাই, কাজেই।'

বর্তমান শিক্ষার বিষময় ফল নিজের সন্তানের মধ্যে প্রত্যক্ষ করিয়া রায়বাহাদুর হতোদ্যম হইয়া বসিয়া রহিলেন। বিবাহ একপ্রকার বিষণ্ণ নিরানন্দভাবে সম্পন্ন হইয়া গেল।

শ্বশুরবাড়ি যাইবার সময় নিরুপমাকে বুকে টানিয়া বাপ আর চোখের জল রাখিতে পারিলেন না। নিরু জিজ্ঞাসা করিল, 'তারা কি আর আমাকে আসতে দেবে না বাবা।' রামসুন্দর বলিলেন, 'কেন আসতে দেবে না, মা। আমি তোমাকে নিয়ে আসব।'

রামসুন্দর প্রায়ই মেয়েকে দেখিতে যান কিন্তু বেহাইবাড়িতে তাঁর কোনো প্রতিপত্তি নাই। চাকরগুলো পর্যন্ত তাঁহাকে নিচু নজরে দেখে। অন্তঃপুরের বাহিরে একটা স্বতন্ত্র ঘরে পাঁচ মিনিটের জন্য কোনোদিন-বা মেয়েকে দেখিতে পান, কোনোদিন-বা দেখিতে পান না।

কুটুম্বগৃহে এমন করিয়া অপমান তো সহা যায় না। রামসুন্দর স্থির করিলেন, যেমন করিয়া হউক টাকাটা শোধ করিয়া দিতে হইবে।

কিন্তু যে-ঋণভার কাঁধে চাপিয়াছে, তাহারি ভার সামলানো দুঃসাধ্য। খরচ পত্রের অত্যন্ত টানাটানি পড়িয়াছে; এবং পাওনাদারদের দৃষ্টিপথ এড়াইবার জন্য সর্বদাই নানারুপ হীন কৌশল অবলম্বন করিতে হইতেছে।

এদিকে শ্বশুরবাড়ি উঠিতে বসিতে মেয়েকে খোঁটা লাগাইতেছে। পিতৃগৃহের নিন্দা শুনিয়া ঘরে দ্বার দিয়া অশ্রুবিসর্জন তাহার নিত্যক্রিয়ার মধ্যে দাঁড়াইয়াছে।

বিশেষত শাশুড়ির আক্রোশ আর কিছুতেই মেটে না। যদি কেহ বলে, ‘আহা কী শ্রী। বউয়ের মুখখানি দেখিলে চোখ জুড়াইয়া যায়।’ শাশুড়ি ঝংকার দিয়া উঠিয়া বলে, ‘শ্রী তো ভারি। যেমন ঘরের মেয়ে তেমনি শ্রী।’

এমনকি, বউয়ের খাওয়াপরারও যত্ন হয় না। যদি কোনো দয়াপরতন্ত্র প্রতিবেশিনী কোনো ত্রুটির উল্লেখ করে, শাশুড়ি বলে, ‘ওই ঢের হয়েছে।’ অর্থাৎ বাপ যদি পুরা দাম দিত তো মেয়ে পুরা যত্ন পাইত। সকলেই এমন ভাব দেখায় যেন বধূর এখানে কোনো অধিকার নাই, ফাঁকি দিয়া প্রবেশ করিয়াছে।

বোধ হয় কন্যার এই সকল অনাদর এবং অপমানের কথা বাপের কানে গিয়া থাকিবে। তাই রামসুন্দর অবশেষে বসতবাড়ি বিক্রয়ের চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

কিন্তু ছেলেদের যে গৃহহীন করিতে বসিয়াছেন সে-কথা তাহাদের নিকট হইতে গোপনে রাখিলেন। স্থির করিয়াছিলেন, বাড়ি বিক্রয় করিয়া সেই বাড়িই ভাড়া লইয়া বাস করিবেন; এমন কৌশলে চলিবেন যে, তাঁহার মৃত্যুর পূর্বে এ-কথা ছেলেরা জানিতে পারিবে না।

কিন্তু ছেলেরা জানিতে পারিল। সকলে আসিয়া কাঁদিয়া পড়িল। বিশেষত বড়ো তিনটি ছেলে বিবাহিত এবং তাহাদের কাহারো বা সন্তান আছে। তাহাদের আপত্তি অত্যন্ত গুরুতর হইয়া দাঁড়াইল, বাড়ি বিক্রয় স্থগিত হইল।

তখন রামসুন্দর নানাস্থান হইতে বিস্তর সুদে অল্প অল্প করিয়া টাকা ধার করিতে লাগিলেন। এমন হইল যে, সংসারের খরচ আর চলে না।

নিরু বাপের মুখ দেখিয়া সব বুঝিতে পারিল। বৃদ্ধের পক্ককেশে শুষ্কমুখে এবং সদাসংকুচিত ভাবে দৈন্য এবং দুশ্চিন্তা প্রকাশ হইয়া পড়িল। মেয়ের কাছে যখন বাপ অপরাধী তখন সে অপরাধের অনুতাপ কি আর গোপন রাখা যায়। রামসুন্দর যখন বেহাইবাড়ির অনুমতিক্রমে ক্ষণকালের জন্য কন্যার সাক্ষাৎলাভ করিতেন, তখন বাপের বুক যে কেমন করিয়া ফাটে, তাহা তাঁহার হাসি দেখিলেই টের পাওয়া যাইত।

সেই ব্যথিত পিতৃহৃদয়কে সান্ত্বনা দিবার উদ্দেশে দিনকতক বাপের বাড়ি যাইবার জন্য নিরু নিতান্ত অধীর হইয়া উঠিয়াছে। বাপের ম্লান মুখ দেখিয়া সে আর দূরে থাকিতে পারে না। একদিন রামসুন্দরকে কহিল, ‘বাবা, আমাকে একবার বাড়ি লইয়া যাও।’ রামসুন্দর বলিলেন ‘আচ্ছা।’

কিন্তু তাঁহার কোনো জোর নাই—নিজের কন্যার উপরে পিতার যে স্বাভাবিক অধিকার আছে, তাহা যেন পণের টাকার পরিবর্তে বন্ধক রাখিতে হইয়াছে। এমন কী কন্যার দর্শন, সেও অতি সসংকোচে ভিক্ষা চাহিতে হয় এবং সময়বিশেষে নিরাশ হইলে দ্বিতীয় কথাটি কহিবার মুখ থাকে না।

কিন্তু মেয়ে আপনি বাড়ি আসিতে চাহিলে বাপ তাকে না আনিয়া কেমন করিয়া থাকে। তাই, বেহাইয়ের নিকট সে-সম্বন্ধে দরখাস্ত পেশ করিবার পূর্বে রামসুন্দর কত হীনতা, কত অপমান, কত ক্ষতি স্বীকার করিয়া যে তিনটি হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়াছিলেন, সে-ইতিহাস গোপন থাকাই ভালো।

নোট-ক'খানি রুমালে জড়াইয়া চাদরে বাঁধিয়া রামসুন্দর বেহাইয়ের নিকট গিয়া বসিলেন। প্রথমে হাস্যমুখে পাড়ার খবর পাড়িলেন। হরেকৃষ্ণের বাড়িতে একটা মস্ত চুরি হইয়া গিয়াছে, তাহার আদ্যোপান্ত বিবরণ বলিলেন। নবীনমাধব ও রাধামাধব দুই ভাইয়ের তুলনা করিয়া বিদ্যাবুদ্ধি ও স্বভাব সম্বন্ধে রাধামাধবের সুখ্যাতি এবং নবীনমাধবের নিন্দা করিলেন; শহরে একটা নূতন ব্যামো আসিয়াছে, সে-সম্বন্ধে অনেক আজগুবি আলোচনা করিলেন; অবশেষে হুঁকাটি নামাইয়া রাখিয়া কথায় কথায় বলিলেন, 'হাঁ, হাঁ, বেহাই সেই টাকাটা বাকি আছে বটে। রোজই মনে করি, যাচ্ছি অমনি হাতে করে কিছু নিয়ে যাই কিন্তু সময়কালে মনে থাকে না। আর ভাই, বুড়ো হয়ে পড়েছি।' এমনি এক দীর্ঘ ভূমিকা করিয়া পঞ্জরে তিনখানি অস্থির মতো সেই তিনখানি নোট যেন অতি সহজে অতি অবহেলে বাহির করিলেন। সবেমাত্র তিন হাজার টাকার নোট দেখিয়া রায়বাহাদুর অট্টহাস্য করিয়া উঠিলেন।

বলিলেন, 'থাক্ বেহাই, ওতে আমার কাজ নেই।' একটা প্রচলিত বাংলা প্রবাদের উল্লেখ করিয়া বলিলেন, সামান্য কারণে হাতে দুর্গন্ধ করিতে তিনি চান না।

এই ঘটনার পর মেয়ে বাড়ি আনিবার প্রস্তাব কাহারো মুখে আসে না—কেবল রামসুন্দর ভাবিলেন, 'সে সকল কুটুম্বিতার সংকোচ আমাকে আর শোভা পায় না।' মর্মাহতভাবে অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া অবশেষে মৃদুস্বরে কথাটা পাড়িলেন। রায়বাহাদুর কোনো কারণমাত্র উল্লেখ না করিয়া বলিলেন, 'সে এখন হচ্ছে না।' এই বলিয়া কর্মোপলক্ষ্যে স্থানান্তরে চলিয়া গেলেন।

রামসুন্দর মেয়ের কাছে মুখ না দেখাইয়া কম্পিতহস্তে কয়েকখানি নোট চাদরের প্রান্তে বাঁধিয়া বাড়ি ফিরিয়া গেলেন। মনে-মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, যতদিন না সমস্ত টাকা শোধ করিয়া দিয়া অসংকোচে কন্যার উপরে দাবি করিতে পারিবেন, ততদিন আর বেহাইবাড়ি যাইবেন না।

বহুদিন গেল। নিরুপমা লোকের উপর লোক পাঠায় কিন্তু বাপের দেখা পায় না। অবশেষে অভিমান করিয়া লোক পাঠানো বন্ধ করিল—তখন রামসুন্দরের মনে বড়ো আঘাত লাগিল, কিন্তু তবু গেলেন না।

আশ্বিন মাস আসিল। রামসুন্দর বলিলেন, 'এবার পূজার সময় মাকে ঘরে আনিবই, নহিলে আমি'—খুব একটা শক্ত রকম শপথ করিলেন।

পঞ্চমী কী ষষ্ঠীর দিনে আবার চাদরের প্রান্তে গুটিকতক নোট বাঁধিয়া রামসুন্দর যাত্রার উদ্যোগ করিলেন। পাঁচ বৎসরের এক নাতি আসিয়া বলিল, 'দাদা, আমার জন্যে গাড়ি কিনতে যাচ্ছিস?' বহুদিন হইতে তাহার ঠেলাগাড়িতে চড়িয়া হাওয়া খাইবার শখ হইয়াছে, কিন্তু কিছুতেই তাহা মিটিবার উপায় হইতেছে না। ছয় বৎসরের এক নাতিনী আসিয়া সরোদনে কহিল, পূজার নিমন্ত্রণে যাইবার মতো তাহার একখানিও ভালো কাপড় নাই।

রামসুন্দর তাহা জানিতেন এবং সে-সম্বন্ধে তামাক খাইতে খাইতে বৃদ্ধ অনেক চিন্তা করিয়াছেন। রায়বাহাদুরের বাড়ি যখন পূজার নিমন্ত্রণ হইবে তখন তাঁহার বধূগণকে অতি যৎসামান্য অলংকারে অনুগ্রহপাত্র দরিদ্রের মতো যাইতে হইবে, এ-কথা স্মরণ করিয়া তিনি অনেক দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়াছেন; কিন্তু তাহাতে তাঁহার ললাটের বার্ধক্যরেখা গভীরতর অঙ্কিত হওয়া ছাড়া আর-কোনো ফল হয় নাই।

দৈন্যপীড়িত গৃহের ক্রন্দনধ্বনি কানে লইয়া বৃদ্ধ তাঁহার বেহাইবাড়িতে প্রবেশ করিলেন। আজ তাঁহার সে সংকোচভাব নাই; দ্বাররক্ষী এবং ভৃত্যদের মুখের প্রতি সে চকিত সলজ্জ দৃষ্টিপাত দূর হইয়া গিয়াছে, যেন আপনার গৃহে প্রবেশ করিলেন। শুনিলেন, রায়বাহাদুর ঘরে নাই, কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইবে। মনের উচ্ছ্বাস সংবরণ করিতে না পারিয়া রামসুন্দর কন্যার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। আনন্দে দুই চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। বাপও কাঁদে মেয়েও কাঁদে; দুইজনে কেহ আর কথা কহিতে পারে না। এমন করিয়া কিছুক্ষণ গেল। তারপরে রামসুন্দর কহিলেন, ‘এবার তোকে নিয়ে যাচ্ছি, মা। আর কোনো গোল নাই।’

এমন সময়ে রামসুন্দরের জ্যেষ্ঠপুত্র হরমোহন তার দুটি ছোটো ছেলে সঙ্গে লইয়া সহসা ঘরে প্রবেশ করিলেন। পিতাকে বলিলেন, ‘বাবা, আমাদের তবে এবার পথে ভাসালে?’

রামসুন্দর সহসা অগ্নিমূর্তি হইয়া বলিলেন, ‘তোদের জন্য কি আমি নরকগামী হব। আমাকে তোরা আমার সত্য পালন করতে দিবি নে?’ রামসুন্দর বাড়ি বিক্রয় করিয়া বসিয়া আছেন; ছেলেরা কিছুতে না জানিতে পায়, তাহার অনেক ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, কিন্তু তবু তাহারা জানিয়াছে দেখিয়া তাহাদের প্রতি হঠাৎ অত্যন্ত রুষ্টও বিরক্ত হইয়া উঠিলেন।

তাঁহার নাতি তাঁহার দুই হাঁটু সবলে জড়াইয়া ধরিয়া মুখ তুলিয়া কহিল, ‘দাদা, আমাকে গাড়ি কিনে দিলে না?’

নতশির রামসুন্দরের কাছে বালক কোনো উত্তর না পাইয়া নিরুর কাছে গিয়া বলিল, ‘পিসিমা, আমাকে একখানা গাড়ি কিনে দেবে?’

নিরুপমা সমস্ত ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া কহিল, ‘বাবা, তুমি যদি আর এক পয়সা আমার শ্বশুরকে দাও, তা-হলে আর তোমার মেয়েকে দেখতে পাবে না, এই তোমার গা ছুঁয়ে বললুম।’

রামসুন্দর কহিলেন, ‘ছি মা, অমন কথা বলতে নেই। আর এ-টাকাটা যদি আমি না দিতে পারি, তা-হলে তোর বাপের অপমান। আর তোরো অপমান।’

নিরু কহিল, ‘টাকা যদি দাও তবেই অপমান। তোমার মেয়ের কি কোনো মর্যাদা নেই। আমি কি কেবল একটা টাকার থলি, যতক্ষণ টাকা আছে ততক্ষণ আমার দাম। না বাবা এ-টাকা দিয়ে তুমি আমাকে অপমান কোরো না। তাছাড়া আমার স্বামী তো এ-টাকা চান না।’

রামসুন্দর কহিলেন, ‘তা-হলে তোমাকে যেতে দেবে না, মা।’

নিরুপমা কহিল, ‘না দেয় তো কী করবে বলো। তুমিও আর নিয়ে যেতে চেয়ো না।’

রামসুন্দর কম্পিত হস্তে নোটবাঁধা চাদরটি কাঁধে তুলিয়া আবার চোরের মতো সকলের দৃষ্টি এড়াইয়া বাড়ি ফিরিয়া গেলেন।

কিন্তু রামসুন্দর এই যে টাকা আনিয়াছিলেন এবং কন্যার নিষেধে সে টাকা না দিয়াই চলিয়া গিয়াছেন, সে-কথা গোপন রহিল না। কোনো স্বভাবকৌতূহলী দ্বারলগ্নকর্ণ দাসী নিরুর শাশুড়িকে এই খবর দিল। শুনিয়া তাঁহার আর আক্রোশের সীমা রহিল না।

নিরুপমার পক্ষে তাহার শ্বশুরবাড়ি শরশয্যা হইয়া উঠিল। এদিকে তাহার স্বামী বিবাহের অল্পদিন পরেই ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হইয়া দেশান্তরে চলিয়া গিয়াছে; এবং পাছে সংসর্গদোষে হীনতা শিক্ষা হয় এই ওজরে সম্প্রতি বাপের বাড়ির আত্মীয়দের সহিত নিরুর সাক্ষাৎকার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হইয়াছে।

এই সময়ে নিরুর একটা গুরুতর পীড়া হইল। কিন্তু সেজন্য তাহার শাশুড়িকে সম্পূর্ণ দোষ দেওয়া যায় না। শরীরের প্রতি সে অত্যন্ত অবহেলা করিত। কার্তিক মাসের হিমের সময় সমস্ত রাত মাথার দরজা খোলা, শীতের সময় গায়ে কাপড় নাই। আহারের নিয়ম নাই। দাসীরা যখন মাঝে-মাঝে খাবার আনিতে ভুলিয়া যাইত, তখন সে তাহাদের একবার মুখ খুলিয়া স্মরণ করাইয়া দেওয়া, তাহাও সে করিত না। সে-যে পরের ঘরের দাসদাসী এবং কর্তাগৃহিণীদের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিয়া বাস করিতেছে, এই সংস্কার তাহার মনে বদ্ধমূল হইতেছিল। কিন্তু এরূপ ভাবটাও শাশুড়ির সহ্য হইত না। যদি আহারের প্রতি বধূর কোনো অবহেলা দেখিতেন, তবে শাশুড়ি বলিতেন, ‘নবাবের বাড়ির মেয়ে কিনা। গরিবের ঘরের অন্ন ওঁর মুখে রোচে না।’ কখনো-বা বলিতেন, ‘দেখো-না, একবার ছিরি হচ্ছে দেখো-না, দিনে দিনে যেন পোড়াকাঠ হয়ে যাচ্ছে।’

রোগ যখন গুরুতর হইয়া উঠিল তখন শাশুড়ি বলিলেন, ‘ওঁর সমস্ত ন্যাকামি।’ অবশেষে একদিন নিরু সবিনয়ে শাশুড়িকে বলিল, ‘বাবাকে আর আমার ভাইদের একবার দেখব, মা।’ শাশুড়ি বলিলেন, ‘কেবল বাপের বাড়ি যাইবার ছল।’

কেহ বলিলে বিশ্বাস করিবে না— যেদিন সন্ধ্যার সময় নিরুর শ্বাস উপস্থিত হইল, সেইদিন প্রথম ডাক্তার দেখিল, এবং সেই দিন ডাক্তারের দেখা শেষ হইল।

বাড়ির বড়োবউ মরিয়াছে, খুব ধুম করিয়া অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হইল। প্রতিমাবিসর্জনের সমারোহ সম্বন্ধে জেলার মধ্যে রায়চৌধুরীদের যেমন লোক-বিখ্যাত প্রতিপত্তি আছে, বড়োবউয়ের সৎকার সম্বন্ধে রায়বাহাদুরদের তেমনি একটা খ্যাতি রটিয়া গেল—এমন চন্দনকাষ্ঠের চিতা এ মুলুকে কেহ কখনো দেখে নাই। এমন ঘটা করিয়া শ্রাদ্ধও কেবল রায়বাহাদুরদের বাড়িতেই সম্ভব এবং শুনা যায়, ইহাতে তাঁহাদের কিঞ্চিৎ ঋণ হইয়াছিল।

রামসুন্দরকে সান্ত্বনা দিবার সময় তাহার মেয়ের যে কীরূপ মহাসমারোহে মৃত্যু হইয়াছে, সকলেই তাহার বহুল বর্ণনা করিল।

এদিকে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চিঠি আসিল, ‘আমি এখানে সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছি, অতএব অবিলম্বে আমার স্ত্রীকে এখানে পাঠাইবে।’ রায়বাহাদুরের মহিষী লিখিলেন, ‘বাবা, তোমার জন্যে আর-একটি মেয়ের সম্বন্ধে করিয়াছি, অতএব অবিলম্বে ছুটি লইয়া এখানে আসিবে।’

এবারে বিশ হাজার টাকা পণ এবং হাতে হাতে আদায়।

কাবুলিওয়ালা

আমার পাঁচ বছরের ছোটো মেয়ে মিনি এক দণ্ড কথা না কহিয়া থাকিতে পারে না। পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া ভাষা শিক্ষা করিতে সে কেবল একটি বৎসর কাল ব্যয় করিয়াছিল, তাহার পর হইতে যতক্ষণ সে জাগিয়া থাকে এক মুহূর্ত মৌনভাবে নষ্ট করে না। তাহার মা অনেক সময় ধমক দিয়া তাহার মুখ বন্ধ করিয়া দেয়, কিন্তু আমি তাহা পারি না। মিনি চুপ করিয়া থাকিলে এমনি অস্বাভাবিক দেখিতে হয় যে, সে আমার বেশিক্ষণ সহ্য হয় না। এইজন্য আমার সঙ্গে তাহার কথোপকথনটা কিছু উৎসাহের সহিত চলে।

সকালবেলায় আমার নভেলের সপ্তদশ পরিচ্ছেদে হাত দিয়াছি এমন সময় মিনি আসিয়াই আরম্ভ করিয়া দিল, 'বাবা, রামদয়াল কাককে কৌয়া বলছিল, সে কিচ্ছু জানে না। না?'

আমি পৃথিবীতে ভাষার বিভিন্নতা সম্বন্ধে তাহাকে জ্ঞানদান করিতে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বেই সে দ্বিতীয় প্রসঙ্গে উপনীত হইল। 'দেখো বাবা, ভোলা বলছিল আকাশে হাতিশুঁড় দিয়ে জল ফেলে, তাই বৃষ্টি হয়। মাগো, ভোলা এত মিছিমিছি বকতে পারে। কেবলই বকে, দিনরাত বকে।'

এ সম্বন্ধে আমার মতামতের জন্য কিছুমাত্র অপেক্ষা না করিয়া হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল, 'বাবা, মা তোমার কে হয়।'

মনে মনে কহিলাম শ্যালিকা; মুখে কহিলাম, 'মিনি তুই ভোলার সঙ্গে খেলা করগে যা। আমার এখন কাজ আছে।'

সে তখন আমার লিখিবার টেবিলের পার্শ্বে আমার পায়ের কাছে বসিয়া নিজের দুই হাঁটু এবং হাত লইয়া অতিদ্রুত উচ্চারণে 'আগডুম-বাগডুম' খেলিতে আরম্ভ করিয়া দিল। আমার সপ্তদশ পরিচ্ছেদে প্রতাপসিংহ তখন কাঞ্চনমালাকে লইয়া অন্ধকার রাত্রে কারাগারের উচ্চ বাতায়ন হইতে নিম্নবর্তী নদীর জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িতেছেন।

আমার ঘর পথের ধারে। হঠাৎ মিনি আগডুম-বাগডুম খেলা রাখিয়া জানালার ধারে ছুটিয়া গেল এবং চিৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিল, 'কাবুলিওয়ালা, ও কাবুলিওয়ালা।'

ময়লা ঢিলা কাপড় পরা, পাগড়ি মাথায়, ঝুড়ি ঘাড়ে, হাতে গোটা দুই-চার আঙুরের বাক্স, এক লম্বা কাবুলিওয়ালা মৃদুমন্দ গমনে পথ দিয়া যাইতেছিল—তাহাকে দেখিয়া আমার কন্যারত্নের কীরূপ ভাবোদয় হইল তাহা বলা শক্ত, তাহাকে ঊর্ধ্বশ্বাসে ডাকাডাকি আরম্ভ করিয়া দিল। আমি ভাবিলাম, এখনই ঝুলি ঘাড়ে একটা আপদ আসিয়া উপস্থিত হইবে, আমার সপ্তদশ পরিচ্ছেদ আর শেষ হইবে না।

কিন্তু মিনির চিৎকারে যেমনি কাবুলিওয়ালা হাসিয়া মুখ ফিরাইল এবং আমাদের বাড়ির দিকে আসিতে লাগিল, অমনি সে ঊর্ধ্বশ্বাসে অন্তঃপুরে দৌড় দিল, তাহার আর চিহ্ন দেখিতে পাওয়া গেল না। তাহার মনের মধ্যে একটা অন্ধবিশ্বাসের মতো ছিল যে, ওই ঝুলিটার ভিতর সন্ধান করিলে তাহার মতো দুটো-চারটে জীবিত মানবসন্তান পাওয়া যাইতে পারে।

এদিকে কাবুলিওয়ালা আসিয়া সহাস্যে আমাকে সেলাম করিয়া দাঁড়াইল—আমি ভাবিলাম, যদিও প্রতাপসিংহ এবং কাঞ্চনমালার অবস্থা অত্যন্ত সংকটাপন্ন, তথাপি লোকটাকে ঘরে ডাকিয়া আনিয়া তাহার কাছ হইতে কিছু না কেনাটা ভালো হয় না।

কিছু কেনা গেল। তাহার পর পাঁচটা কথা আসিয়া পড়িল। আবদুর রহমান, রুশ, ইংরেজ প্রভৃতিকে লইয়া সীমান্তরক্ষানীতি সম্বন্ধে গল্প চলিতে লাগিল।

অবশেষে উঠিয়া যাইবার সময় সে জিজ্ঞাসা করিল, 'বাবু, তোমার লড়কি কোথায় গেল।'

আমি মিনির অমূলক ভয় ভাঙাইয়া দিবার অভিপ্রায়ে তাহাকে অন্তঃপুর হইতে ডাকাইয়া আনিলাম—সে আমার গা ঘেঁষিয়া কাবুলির মুখ এবং ঝুলির দিকে সন্দিগ্ধ নেত্রক্ষেপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কাবুলি ঝুলির মধ্য হইতে কিসমিস খোবানি বাহির করিয়া তাহাকে দিতে গেল, সে কিছুতেই লইল না, দ্বিগুণ সন্দেহের সহিত আমার হাঁটুর কাছে সংলগ্ন হইয়া রহিল। প্রথম পরিচয়টা এমনিভাবে গেল।

কিছুদিন পরে একদিন সকালবেলায় আবশ্যকবশত বাড়ি হইতে বাহির হইবার সময় দেখি, আমার দুহিতাটি দ্বারের সমীপস্থ বেঞ্চির উপর বসিয়া অনর্গল কথা কহিয়া যাইতেছে এবং কাবুলিওয়ালা তাহার পদতলে বসিয়া সহাস্যমুখে শুনিতেছে এবং মধ্যে মধ্যে প্রসঙ্গক্রমে নিজের মতামতও দো-আঁসলা বাংলায় ব্যক্ত করিতেছে। মিনির পঞ্চবর্ষীয় জীবনের অভিজ্ঞতায় বাবা ছাড়া এমন ধৈর্যবান শ্রোতা সে কখনো পায় নাই। আবার দেখি, তাহার ক্ষুদ্র আঁচল বাদাম-কিসমিসে পরিপূর্ণ। আমি কাবুলিওয়ালাকে কহিলাম, 'উহাকে এসব কেন দিয়াছ। অমন আর দিয়ো না।' বলিয়া পকেট হইতে একটা আধুলি লইয়া তাহাকে দিলাম। সে অসংকোচে আধুলি গ্রহণ করিয়া ঝুলিতে পুরিল।

বাড়িতে ফিরিয়া আসিয়া দেখি, সেই আধুলিটি লইয়া ষোলো-আনা গোলযোগ বাধিয়া গেছে।

মিনির মা একটা শ্বেত চকচকে গোলাকার পদার্থ লইয়া ভর্ৎসনার স্বরে মিনিকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, 'তুই এ আধুলি কোথায় পেলি।'

মিনি বলিতেছে, 'কাবুলিওয়ালা দিয়েছে।'

তাহার মা বলিতেছেন, 'কাবুলিওয়ালার কাছ হইতে আধুলি তুই কেন নিতে গেলি।'

মিনি ক্রন্দনের উপক্রম করিয়া কহিল, 'আমি চাইনি, সে আপনি দিলে।'

আমি আসিয়া মিনিকে তাহার আসন্ন বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়া বাহিরে লইয়া গেলাম।

সংবাদ পাইলাম, কাবুলিওয়ালার সহিত মিনির এই যে দ্বিতীয় সাক্ষাৎ তাহা নহে, ইতিমধ্যে সে প্রায় প্রত্যহ আসিয়া পেস্তাবাদাম ঘুষ দিয়া মিনির ক্ষুদ্র লুব্ধ হৃদয়টুকু অনেকটা অধিকার করিয়া লইয়াছে।

দেখিলাম, এই দুটি বন্ধুর মধ্যে গুটিকতক বাঁধা কথা এবং ঠাট্টা প্রচলিত আছে—যথা, রহমতকে দেখিবামাত্র আমার কন্যা হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিত, 'কাবুলিওয়ালা, ও কাবুলিওয়ালা, তোমার ও ঝুলির ভিতর কী।'

রহমত একটা অনাবশ্যক চন্দ্রবিন্দু যোগ করিয়া হাসিতে হাসিতে উত্তর করিত, 'হাঁতি।'

অর্থাৎ তাহার ঝুলির ভিতরে যে একটা হস্তী আছে, এইটেই তাহার পরিহাসের সূক্ষ্ম মর্ম। খুব যে বেশি সূক্ষ্ম তাহা বলা যায় না, তথাপি এই পরিহাসে উভয়েই বেশ-একটু কৌতুক অনুভব করিত—এবং শরৎকালের প্রভাতে একটি বয়স্ক এবং একটি অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুর সরল হাস্য দেখিয়া আমারও বেশ লাগিত।

উহাদের মধ্যে আরো-একটা কথা প্রচলিত ছিল। রহমত মিনিকে বলিত 'খোঁখি, তোমি সসুরবাড়ি কখুনু যাবে না!'

বাঙালির ঘরের মেয়ে আজন্মকাল 'শ্বশুরবাড়ি' শব্দটার সহিত পরিচিত, কিন্তু আমরা কিছু একেলে ধরনের লোক হওয়াতে, শিশু মেয়েকে শ্বশুড়বাড়ি সম্বন্ধে সজ্ঞান করিয়া তোলা হয় নাই। এইজন্য রহমতের অনুরোধটা সে পরিষ্কার বুঝিতে পারিত না, অথচ কথাটার একটা-কোনো জবাব না দিয়া চুপ করিয়া থাকা নিতান্ত তাহার স্বভাববিরুদ্ধ, সে উলটিয়া জিজ্ঞাসা করিত, 'তুমি শ্বশুরবাড়ি যাবে?'

রহমত কাল্পনিক শ্বশুরের প্রতি প্রকাণ্ড মোটা মুষ্টি আস্ফালন করিয়া বলিত, 'হামি সসুরকে মারবে।'

শুনিয়া মিনি শ্বশুর নামক কোনো-এক অপরিচিত জীবের দুরবস্থা কল্পনা করিয়া অত্যন্ত হাসিত।

এখন শুভ্র শরৎকাল। প্রাচীনকালে এই সময়েই রাজারা দিগ্‌বিজয়ে বাহির হইতেন। আমি কলিকাতা ছাড়িয়া কখনো যাই নাই, কিন্তু সেইজন্যই আমার মনটা পৃথিবীময় ঘুরিয়া বেড়ায়। আমি যেন আমার ঘরের কোণে চিরপ্রবাসী, বাহিরের পৃথিবীর জন্য আমার সর্বদা মন কেমন করে। একটা বিদেশের নাম শুনিলেই অমনি আমার চিত্ত ছুটিয়া যায়, তেমনি বিদেশি লোক দেখিলেই অমনি নদী পর্বত অরণ্যের মধ্যে একটা কুটিরের দৃশ্য মনে উদয় হয়, এবং একটা উল্লাস-পূর্ণ স্বাধীন জীবনযাত্রার কথা কল্পনায় জাগিয়া উঠে।

এদিকে আবার আমি এমনি উদ্ভিজ্জ প্রকৃতি যে, আমার কোণটুকু ছাড়িয়া একবার বাহির হইতে গেলে মাথায় বজ্রাঘাত হয়। এইজন্যে সকালবেলায় আমার ছোটো ঘরে টেবিলের সামনে বসিয়া এই কাবুলির সঙ্গে গল্প করিয়া আমার অনেকটা ভ্রমণের কাজ হইত। দুইধারে বন্ধুর দুর্গম দগ্ধ রক্তবর্ণ উচ্চ গিরিশ্রেণি, মধ্যে সংকীর্ণ মরুপথ, বোঝাই-করা উষ্ট্রের শ্রেণি চলিয়াছে; পাগড়িপরা বণিক ও পথিকেরা কেহ বা উটের পরে, কেহ বা পদব্রজে, কাহারো হাতে বর্শা, কাহারো হাতে সেকেলে চকমকিঠোকা বন্দুক—কাবুলি মেঘমন্দ্রস্বরে ভাঙা বাংলায় স্বদেশের গল্প করিত, আর এই ছবি আমার চোখের সম্মুখ দিয়া চলিয়া যাইত।

মিনির মা অত্যন্ত শঙ্কিত স্বভাবের লোক। রাস্তায় একটা শব্দ শুনিলেই তাঁহার মনে হয় পৃথিবীর সমস্ত মাতাল আমাদের বাড়িটাই বিশেষ লক্ষ্য করিয়া ছুটিয়া আসিতেছে। এই পৃথিবীর যে সর্বত্রই চোর ডাকাত মাতাল সাপ বাঘ ম্যালেরিয়া শুঁয়াপোকা আরশোলা এবং গোরার দ্বারা পরিপূর্ণ, এতদিন (খুব বেশি দিন নহে) পৃথিবীতে বাস করিয়াও সে বিভীষিকা তাঁহার মন হইতে দূর হইয়া যায় নাই।

রহমত কাবুলিওয়ালা সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ নিঃসংশয় ছিলেন না। তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবার জন্য তিনি আমাকে বারবার অনুরোধ করিয়াছিলেন। আমি তাঁহার সন্দেহ হাসিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিলে তিনি পর্যায়ক্রমে আমাকে গুটিকতক প্রশ্ন করিলেন, 'কখনো কি কাহারো ছেলে চুরি যায় না।

কাবুলদেশে কি দাসব্যবসা প্রচলিত নাই। একজন প্রকাণ্ড কাবুলির পক্ষে একটি ছোটো ছেলে চুরি করিয়া লইয়া যাওয়া একেবারেই কি অসম্ভব।'

আমাকে মানিতে হইল, ব্যাপারটা যে অসম্ভব তাহা নহে, কিন্তু অবিশ্বাস্য। বিশ্বাস করিবার শক্তি সকলের সমান নহে, এইজন্য আমার স্ত্রীর মনে ভয় রহিয়া গেল। কিন্তু তাই বলিয়া বিনা দোষে রহমতকে আমাদের বাড়িতে আসিতে নিষেধ করিতে পারিলাম না।

প্রতি বৎসর মাঘ মাসের মাঝামাঝি রহমত দেশে চলিয়া যায়। এই সময়টা সমস্ত পাওনার টাকা আদায় করিবার জন্য সে বড়ো ব্যস্ত থাকে। বাড়ি বাড়ি ফিরিতে হয় কিন্তু তবু একবার মিনিকে দর্শন দিয়া যায়। দেখিলে বাস্তবিক মনে হয়, উভয়ের মধ্যে যেন একটা ষড়যন্ত্র চলিতেছে। সকালে যেদিন আসিতে পারে না, সেদিন দেখি সন্ধ্যার সময় আসিয়াছে; অন্ধকারে ঘরের কোণে সেই ঢিলেঢালা-জামা-পায়জামা-পরা, সেই ঝোলাঝুলিওয়ালা লম্বা লোকটাকে দেখিলে বাস্তবিক হঠাৎ মনের ভিতরে একটা আশঙ্কা উপস্থিত হয়। কিন্তু যখন দেখি, মিনি 'কাবুলিওয়ালা, ও কাবুলিওয়ালা' করিয়া হাসিতে হাসিতে ছুটিয়া আসে এবং দুই অসমবয়সি বন্ধুর মধ্যে পুরাতন সরল পরিহাস চলিতে থাকে, তখন সমস্ত হৃদয় প্রসন্ন হইয়া উঠে।

একদিন সকালে আমার ছোটো ঘরে বসিয়া প্রুফশিট সংশোধন করিতেছি। বিদায় লইবার পূর্বে আজ দিন-দুই-তিন হইতে শীতটা খুব কনকনে হইয়া উঠিয়াছে, চারিদিকে একেবারে হিহিকার পড়িয়া গেছে। জানালা ভেদ করিয়া সকালের রৌদ্রটি টেবিলের নীচে আমার পায়ের উপর আসিয়া পড়িয়াছে, সেই উত্তাপটুকু বেশ মধুর বোধ হইতেছে। বেলা বোধকরি আটটা হইবে—মাথায়-গলাবন্ধ-জড়ানো উষাচরগণ প্রাতর্ভ্রমণ সমাধা করিয়া প্রায় সকলে ঘরে ফিরিয়া আসিয়াছে। এমন সময় রাস্তায় ভারি একটা গোল শুনা গেল।

চাহিয়া দেখি, আমাদের রহমতকে দুই পাহারাওয়ালা বাঁধিয়া লইয়া আসিতেছে—তাহার পশ্চাতে কৌতূহলী ছেলের দল চলিয়াছে। রহমতের গাত্রবস্ত্রে রক্তচিহ্ন এবং একজন পাহারাওয়ালার হাতে রক্তাক্ত ছোরা। আমি দ্বারের বাহিরে গিয়া পাহারাওয়ালাকে দাঁড় করাইলাম, জিজ্ঞাসা করিলাম, ব্যাপারটা কী।

কিয়দংশ তাহার কাছে কিয়দংশ রহমতের কাছে শুনিয়া জানিলাম যে, আমাদের প্রতিবেশী একজন লোক রামপুরি চাদরের জন্য রহমতের কাছে কিঞ্চিৎ ধারিত—মিথ্যাপূর্বক সেই দেনা সে অস্বীকার করে এবং তাহাই লইয়া বচসা করিতে করিতে রহমত তাহাকে এক ছুরি বসাইয়া দিয়াছে।

রহমত সেই মিথ্যাবাদীর উদ্দেশে নানারূপ অশ্রাব্য গালি দিতেছে, এমন সময়ে 'কাবুলিওয়ালা, ও কাবুলিওয়ালা' করিয়া ডাকিতে ডাকিতে মিনি ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল।

রহমতের মুখ মুহূর্তের মধ্যে কৌতুকহাস্যে প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। তাহার স্কন্ধে আজ ঝুলি ছিল না, সুতরাং ঝুলি সম্বন্ধে তাহাদের অভ্যস্ত আলোচনা হইতে পারিল না। মিনি একেবারেই তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'তুমি শ্বশুরবাড়ি যাবে?'

রহমত হাসিয়া কহিল, 'সিখানেই যাচ্ছে।'

দেখিল উত্তরটা মিনির হাস্যজনক হইল না, তখন হাত দেখাইয়া বলিল, 'সসুরাকে মারিতাম কিন্তু, কী করিব, হাত বাঁধা।'

সাংঘাতিক আঘাত করার অপরাধে কয়েক বৎসর রহমতের কারাদণ্ড হইল।

তাহার কথা একপ্রকার ভুলিয়া গেলাম। আমরা যখন ঘরে বসিয়া চিরাভ্যস্তমতো নিত্য কাজের মধ্যে দিনের পর দিন কাটাইতাম তখন একজন স্বাধীন পর্বতচারী পুরুষ কারাপ্রাচীরের মধ্যে যে কেমন করিয়া বর্ষযাপন করিতেছে, তাহা আমাদের মনেও উদয় হইত না।

আর, চঞ্চলহৃদয়া মিনির আচরণ যে অত্যন্ত লজ্জাজনক, তাহা তাহার বাপকেও স্বীকার করিতে হয়। সে স্বচ্ছন্দে তাহার পুরাতন বন্ধুকে বিস্মৃত হইয়া প্রথমে নবি সহিসের সহিত সখ্য স্থাপন করিল। পরে ক্রমে যত তাহার বয়স বাড়িয়া উঠিতে লাগিল, ততই পরিবর্তে একটি একটি করিয়া সখি জুটিতে লাগিল। এমনকী, এখন তাহার বাবার লিখিবার ঘরেও তাহাকে আর দেখিতে পাওয়া যায় না। আমি তো তাহার সহিত একপ্রকার আড়ি করিয়াছি।

কত বৎসর কাটিয়া গেল। আর-একটি শরৎকাল আসিয়াছে। আমার মিনির বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইয়াছে। পূজার ছুটির মধ্যেই তাহার বিবাহ হইবে। কৈলাসবাসিনীর সঙ্গে সঙ্গে আমার ঘরের আনন্দময়ী পিতৃভবন অন্ধকার করিয়া পতিগৃহে যাত্রা করিবে।

প্রভাতটি অতি সুন্দর হইয়া উদয় হইয়াছে। বর্ষার পরে এই শরতের নূতন ধৌত রৌদ্র যেন সোহাগায় গলানো নির্মল সোনার মতো রং ধরিয়াছে। কলিকাতার গলির ভিতরকার ইষ্টকজর্জর অপরিচ্ছন্ন ঘেঁষাঘেঁষি বাড়িগুলির উপরেও এই রৌদ্রের আভা একটি অপরূপ লাবণ্য বিস্তার করিয়াছে।

আমার ঘরে আজ রাত্রি শেষ হইতে না হইতে সানাই বাজিতেছে। সে বাঁশি যেন আমার বুকের পঞ্জরের হাড়ের মধ্য হইতে কাঁদিতে কাঁদিতে বাজিয়া উঠিতেছে। করুণ ভৈরবী রাগিণীতে আমার আসন্ন বিচ্ছেদব্যথাকে শরতের রৌদ্রের সহিত সমস্ত বিশ্বজগৎময় ব্যাপ্ত করিয়া দিতেছে। আজ আমার মিনির বিবাহ।

সকাল হইতে ভারি গোলমাল, লোকজনের আনাগোনা। উঠানে বাঁশ বাঁধিয়া পাল খাটানো হইতেছে; বাড়ির ঘরে ঘরে এবং বারান্দায় ঝাড় টাঙাইবার ঠুংঠাং শব্দ উঠিতেছে; হাঁকডাকের সীমা নাই।

আমি আমার লিখিবার ঘরে বসিয়া হিসাব দেখিতেছি, এমন সময় রহমত আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল।

আমি প্রথমে তাহাকে চিনিতে পারিলাম না। তাহার সে ঝুলি নাই। তাহার সে লম্বা চুল নাই, তাহার শরীরে পূর্বের মতো সে তেজ নাই। অবশেষে তাহার হাসি দেখিয়া তাহাকে চিনিলাম।

কহিলাম, 'কী রে রহমত, কবে আসিলি।'

সে কহিল 'কাল সন্ধ্যাবেলা জেল হইতে খালাস পাইয়াছি।'

কথাটা শুনিয়া কেমন কানে খট করিয়া উঠিল। কোনো খুনিকে কখনো প্রত্যক্ষ করি নাই, ইহাকে দেখিয়া সমস্ত অন্তঃকরণ যেন সংকুচিত হইয়া গেল। আমার ইচ্ছা করিতে লাগিল, আজিকার এই শুভদিনে এ লোকটা এখান হইতে গেলেই ভালো হয়।

আমি তাহাকে বলিলাম, 'আজ আমাদের বাড়িতে একটা কাজ আছে, আমি কিছু ব্যস্ত আছি, তুমি আজ যাও।'

কথাটা শুনিয়াই সে তৎক্ষণাৎ চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল, অবশেষে দরজার কাছে গিয়া একটু ইতস্তত করিয়া কহিল, 'খোঁখিকে একবার দেখিতে পাইব না?'

তাহার মনে বুঝি বিশ্বাস ছিল, মিনি সেইভাবেই আছে। সে যেন মনে করিয়াছিল, মিনি আবার সেই পূর্বের মতো 'কাবুলিওয়ালা ও কাবুলিওয়ালা' করিয়া ছুটিয়া আসিবে, তাহাদের সেই অত্যন্ত কৌতুকাবহ পুরাতন হাস্যালাপের কোনোরূপ ব্যত্যয় হইবে না। এমনকি, পূর্ববন্ধুত্ব স্মরণ করিয়া সে একবাক্স আঙুর এবং কাগজের মোড়কে কিঞ্চিৎ কিসমিস বাদাম বোধ করি কোনো স্বদেশীয় বন্ধুর নিকট হইতে চাহিয়া-চিন্তিয়া সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিল—তাহার নিজের ঝুলিটি আর ছিল না।

আমি কহিলাম, 'আজ বাড়িতে কাজ আছে, আজ আর কাহারো সহিত দেখা হইতে পারিবে না।'

সে যেন কিছু ক্ষুণ্ণ হইল। স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া একবার স্থির দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিল, তার পরে 'বাবু সেলাম' বলিয়া দ্বারের বাহির হইয়া গেল।

আমার মনে কেমন একটু ব্যথা বোধ হইল। মনে করিতেছি তাহাকে ফিরিয়া ডাকিব, এমন সময়ে দেখি সে আপনি ফিরিয়া আসিতেছে।

কাছে আসিয়া কহিল, 'এই আঙুর এবং কিঞ্চিৎ কিসমিস বাদাম খোঁখির জন্য আনিয়াছিলাম, তাহাকে দিবেন।'

আমি সেগুলি লইয়া দাম দিতে উদ্যত হইলে সে হঠাৎ আমার হাত চাপিয়া ধরিল, কহিল 'আপনার বহুৎ দয়া, আমার চিরকাল স্মরণ থাকিবে—আমাকে পয়সা দিবেন না।—

বাবু, তোমার যেমন একটি লড়কি আছে, তেমনি দেশে আমারও একটি লড়কি আছে। আমি তাহারই মুখখানি স্মরণ করিয়া তোমার খোঁখির জন্য কিছু কিছু মেওয়া হাতে লইয়া আসি, আমি তো সওদা করিতে আসি না।'

এই বলিয়া সে আপনার মস্ত ঢিলা জামাটার ভিতর হাত চালাইয়া দিয়া বুকের কাছে কোথা হইতে একটুকরো ময়লা কাগজ বাহির করিল। বহু সযত্নে ভাঁজ খুলিয়া দুই হস্তে আমার টেবিলের উপর মেলিয়া ধরিল।

দেখিলাম, কাগজের উপর একটি ছোটো হাতের ছাপ। ফোটোগ্রাফ নহে, তেলের ছবি নহে, হাতে খানিকটা ভুসা মাখাইয়া কাগজের উপরে তাহার চিহ্ন করিয়া লইয়াছে। কন্যার এই স্মরণচিহ্নটুকু বুকের কাছে লইয়া রহমত প্রতিবৎসর কলিকাতার রাস্তায় মেওয়া বেচিতে আসে—যেন সেই সুকোমল ক্ষুদ্র শিশুহস্তটুকুর স্পর্শখানি তাহার বিরাট বিরহী বক্ষের মধ্যে সুধাসঞ্চার করিয়া রাখে।

দেখিয়া আমার চোখ ছলছল করিয়া আসিল। তখন, সে যে একজন কাবুলি মেওয়াওয়ালা আর আমি যে একজন বাঙালি সম্ভ্রান্তবংশীয়, তাহা ভুলিয়া গেলাম—তখন বুঝিতে পারিলাম, সেও যে আমিও সে, সেও পিতা আমিও পিতা। তাহার পর্বতগৃহবাসিনী ক্ষুদ্র পার্বতীর সেই হস্তচিহ্ন আমারই মিনিকে স্মরণ করাইয়া দিল। আমি তৎক্ষণাৎ তাহাকে অন্তঃপুর হইতে ডাকাইয়া পাঠাইলাম। অন্তঃপুরে ইহাতে অনেক আপত্তি উঠিয়াছিল। কিন্তু আমি কিছুতে কর্ণপাত করিলাম না। রাঙাচেলি-পরা কপালে চন্দন-আঁকা

বধূবেশিনী মিনি সলজ্জভাবে আমার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

তাহাকে দেখিয়া কাবুলিওয়ালা প্রথমটা থতমত খাইয়া গেল, তাহাদের পুরাতন আলাপ জমাইতে পারিল না। অবশেষে হাসিয়া কহিল, 'খোঁখি, তোমি সসুরবাড়ি যাবিস?'

মিনি এখন শ্বশুরবাড়ির অর্থ বোঝে, এখন আর সে পূর্বের মতো উত্তর দিতে পারিল না—রহমতের প্রশ্ন শুনিয়া লজ্জায় আরক্ত হইয়া মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইল। কাবুলিওয়ালার সহিত মিনির যেদিন প্রথম সাক্ষাৎ হইয়াছিল, আমার সেই দিনের কথা মনে পড়িল। মনটা কেমন ব্যথিত হইয়া উঠিল।

মিনি চলিয়া গেলে একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া রহমত মাটিতে বসিয়া পড়িল। সে হঠাৎ স্পষ্ট বুঝিতে পারিল, তাহার মেয়েটিও ইতিমধ্যে এইরূপ বড়ো হইয়াছে, তাহার সঙ্গেও আবার নূতন আলাপ করিতে হইবে—তাহাকে ঠিক পূর্বের মতো তেমনটি আর পাইবে না। এ আট বৎসরে তাহার কী হইয়াছে তাই বা কে জানে। সকালবেলায় শরতের স্নিগ্ধ রৌদ্রকিরণের মধ্যে সানাই বাজিতে লাগিল, রহমত কলিকাতার এক গলির ভিতরে বসিয়া আফগানিস্তানের এক মরুপর্বতের দৃশ্য দেখিতে লাগিল।

আমি একখানি নোট লইয়া তাহাকে দিলাম। বলিলাম, 'রহমত, তুমি দেশে তোমার মেয়ের কাছে ফিরিয়া যাও; তোমাদের মিলনসুখে আমার মিনির কল্যাণ হউক।'

এই টাকাটা দান করিয়া হিসাব হইতে উৎসব-সমারোহের দুটো-একটা অঙ্গ ছাঁটিয়া দিতে হইল। যেমন মনে করিয়াছিলাম তেমন করিয়া ইলেকট্রিক আলো জ্বালাইতে পারিলাম না, গড়ের বাদ্যও আসিল না, অন্তঃপুরে মেয়েরা অত্যন্ত অসন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, কিন্তু মঙ্গল-আলোকে আমার শুভ উৎসব উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

চিত্রকর

ময়মনসিংহ ইস্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাস করে আমাদের গোবিন্দ এল কলকাতায়। বিধবা মায়ের অল্প কিছু সম্বল ছিল। কিন্তু, সবচেয়ে তার বড়ো সম্বল ছিল নিজের অবিচলিত সংকল্পের মধ্যে। সে ঠিক করেছিল, 'পয়সা' করবই, সমস্ত জীবন উৎসর্গ করে দিয়ে। সর্বদাই তার ভাষায় ধনকে সে উল্লেখ করত 'পয়সা' বলে। অর্থাৎ, তার মনে খুব একটা দর্শন স্পর্শন ঘ্রাণের যোগ্য প্রত্যক্ষ পদার্থ ছিল; তার মধ্যে বড়ো নামের মোহ ছিল না; অত্যন্ত সাধারণ পয়সা, হাটে হাটে হাতে হাতে ঘুরে ঘুরে ক্ষয়ে যাওয়া, মলিন হয়ে যাওয়া পয়সা, তাম্রগন্ধী পয়সা, কুবেরের আদিম স্বরূপ, যা রূপোয় সোনায় কাগজে দলিলে নানা মূর্তি পরিগ্রহ করে মানুষের মনকে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে।

নানা বাঁকা পথের ভিতর দিয়ে নানা পঙ্কে আবিল হতে হতে আজ গোবিন্দ তার পয়সাপ্রবাহিনীর প্রশস্তধারার পাকা বাঁধানো ঘাটে এসে পৌঁচেছে। মানিব্যাগওয়ালা বড়োসাহেব ম্যাকডুগালের বড়োবাবুর আসনে তার ধ্রুব প্রতিষ্ঠা। সবাই তাকে নাম দিয়েছিল ম্যাকদুলাল।

গোবিন্দর পিতৃব্য ভাই মুকুন্দ যখন উকিল-লীলা সংবরণ করলেন তখন একটি বিধবা স্ত্রী, একটি চার বছরের ছেলে, কলকাতায় একটি বাড়ি, কিছু জমা টাকা রেখে তিনি গেলেন লোকান্তরে। সম্পত্তির সঙ্গে কিছু ঋণও ছিল, সুতরাং তাঁর পরিবারের অন্নবস্ত্রের সংস্থান বিশেষ ব্যয়সংক্ষেপের উপর নির্ভর করত। এই কারণে তাঁর ছেলে চুনিলাল যে-সমস্ত উপকরণের মধ্যে মানুষ, প্রতিবেশীদের সঙ্গে তুলনায় সেগুলি খ্যাতিযোগ্য নয়।

মুকুন্দদাদার উইল-অনুসারে এই পরিবারের সম্পূর্ণ ভার পড়েছিল গোবিন্দর পরে। গোবিন্দ শিশুকাল থেকে ভ্রাতুষ্পুত্রের কানে মন্ত্র দিলে—'পয়সা করো।'

ছেলেটির দীক্ষার পথে প্রধান বাধা দিলেন তাঁর মা সত্যবতী। স্পষ্ট কথায় তিনি কিছু বলেননি, বাধাটা ছিল তাঁর ব্যবহারে। শিশুকাল থেকেই তাঁর বাতিক ছিল শিল্পকাজে। ফুল ফল পাতা নিয়ে, খাবারের জিনিস নিয়ে, কাগজ কেটে, কাপড় কেটে, মাটি দিয়ে, ময়দা দিয়ে, জামের রস, ফলসার রস, জবার রস, শিউলি-বোঁটার রস দিয়ে, নানা অভূতপূর্ব অনাবশ্যক জিনিস রচনায় তাঁর আগ্রহের অন্ত ছিল না। এতে তাঁকে দুঃখও পেতে হয়েছে। কেননা, যা অদরকারি, যা অকারণ, তার বেগ আষাঢ়ের আকস্মিক বন্যাধারার মতো—সচলতা অত্যন্ত বেশি কিন্তু দরকারি কাজের খেয়া বাইবার পক্ষে অচল। মাঝে মাঝে এমনও হয়েছে, জ্ঞাতি বাড়িতে নিমন্ত্রণ, সত্যবতী ভুলেই গেছেন, শোবার ঘরে দরজা বন্ধ, একতাল মাটি চটকে বেলা কাটছে। জ্ঞাতিরা বললে, বড়ো অহংকার। সন্তোষজনক জবাব দেবার জো নেই। এ-সব কাজেও ভালোমন্দর যে মূল্যবিচার চলে, সেটা বইপড়া বিদ্যার যোগেই মুকুন্দ জানতেন। আর্ট শব্দটার মাহাত্ম্যে শরীর রোমাঞ্চিত হত। কিন্তু, তাঁর আপন গৃহিণীর হাতের কাজেও যে শব্দটার কোনো স্থান আছে এমন কথা মনে করতেই পারতেন না। এই মানুষটির স্বভাবটিতে কোথাও কাঁটা-খোঁচা ছিল না। তাঁর স্ত্রী অনাবশ্যক

খেয়ালে অযথা সময় নষ্ট করেন, এটা দেখে তাঁর হাসি পেত, সে হাসি স্নেহরসে ভরা। এ নিয়ে সংসারের লোক কেউ যদি কটাক্ষ করত তিনি তখনই তার প্রতিবাদ করতেন। মুকুন্দর স্বভাবে অদ্ভুত একটা আত্মবিরোধ ছিল—ওকালতির কাজে ছিলেন প্রবীণ, কিন্তু ঘরের কাজে বিষয়বুদ্ধি ছিল না বললেই হয়। পয়সা তাঁর কাজের মধ্যে দিয়ে যথেষ্ট বইত, কিন্তু ধ্যানের মধ্যে আটকা পড়ত না। সেইজন্য মনটা ছিল মুক্ত; অনুগত লোকদের পরে নিজের ইচ্ছে চালাবার জন্যে কখনো দৌরাত্ম্য করতে পারতেন না। জীবনযাত্রার অভ্যাস ছিল খুব সাদাসিধা, নিজের স্বার্থ বা সেবা নিয়ে পরিজনদের পরে কোনোদিন অযথা দাবি করেননি। সংসারের লোকে সত্যবতীর কাজে শৈথিল্য নিয়ে কটাক্ষ করলে মুকুন্দ তখনই সেটা থামিয়ে দিতেন। মাঝে মাঝে আদালত থেকে ফেরবার পথে রাধাবাজার থেকে কিছু রং, কিছু রঙিন রেশম, রঙের পেনসিল কিনে এনে সত্যবতীর অজ্ঞাতসারে তাঁর শোবার ঘরে কাঠের সিন্দুকটার 'পরে সাজিয়ে রেখে আসতেন। কোনোদিন বা সত্যবতীর আঁকা একটা ছবি তুলে নিয়ে বলতেন, 'বা, এ তো বড়ো সুন্দর হয়েছে।' একদিন একটা মানুষের ছবিকে উলটিয়ে ধরে তার পা দুটোকে পাখির মুণ্ড বলে স্থির করলেন; বললেন, 'সতু, এটা কিন্তু বাঁধিয়ে রাখা চাই—বকের ছবি যা হয়েছে চমৎকার!' মুকুন্দ তাঁর স্ত্রীর চিত্ররচনায় ছেলেমানুষি কল্পনা করে মনে মনে যে-রসটুকু পেতেন, স্ত্রীও তাঁর স্বামীর চিত্রবিচার থেকে ভোগ করতেন সেই একই রস। সত্যবতী মনে নিশ্চিত জানতেন, বাংলাদেশের আর-কোনো পরিবারে তিনি এত ধৈর্য, এত প্রশ্রয় আশা করতে পারতেন না। শিল্পসাধনায় তাঁর এই দুর্নিবার উৎসাহকে কোনো ঘরে এত দরদের সঙ্গে পথ ছেড়ে দিত না। এইজন্যে যেদিন তাঁর স্বামী তাঁর কোনো রচনা নিয়ে অদ্ভুত অত্যুক্তি করতেন সেদিন সত্যবতী যেন চোখের জল সামলাতে পারতেন না।

এমন দুর্লভ সৌভাগ্যকেও সত্যবতী একদিন হারালেন। মৃত্যুর পূর্বে তাঁর স্বামী একটা কথা স্পষ্ট করে বুঝেছিলেন যে, তাঁর ঋণজড়িত সম্পত্তির ভার এমন কোনো পাকা লোকের হাতে দেওয়া দরকার যাঁর চালনার কৌশলে ফুটো নৌকাও পার হয়ে যাবে। এই উপলক্ষ্যে সত্যবতী এবং তার ছেলেটি সম্পূর্ণভাবে গিয়ে পড়লেন গোবিন্দের হাতে। গোবিন্দ প্রথম দিন থেকেই জানিয়ে দিলেন, সর্বাগ্রে এবং সকলের উপরে পয়সা। গোবিন্দর এই উপদেশের মধ্যে এমন একটা সুগভীর হীনতা ছিল যে, সত্যবতী লজ্জায় কুণ্ঠিত হত।

তবু নানা আকারে আহারে-ব্যবহারে পয়সার সাধনা চলল। তা নিয়ে কথায় কথায় আলোচনা না করে তার উপরে যদি একটা আব্রু থাকত তা হলে ক্ষতি ছিল না। সত্যবতী মনে মনে জানতেন, এতে তাঁর ছেলের মনুষ্যত্ব খর্ব করা হয়—কিন্তু সহ্য করা ছাড়া অন্য উপায় ছিল না; কেননা, যে-চিত্তভাব সুকুমার, যার মধ্যে একটি অসামান্য মর্যাদা আছে, সেই সব-চেয়ে অরক্ষিত; তাকে আঘাত করা, বিদ্রূপ করা, সাধারণ রূঢ়স্বভাব মানুষের পক্ষে অত্যন্ত সহজ।

শিল্পচর্চার জন্য কিছু কিছু উপকরণ আবশ্যক। এতকাল সত্যবতী তা না চাইতেই পেয়েছেন, সেজন্য কোনোদিন তাঁকে কুণ্ঠিত হতে হয়নি। সংসারযাত্রার পক্ষে এই-সমস্ত অনাবশ্যক সামগ্রী, ব্যয়ের ফর্দে ধরে দিতে আজ যেন তাঁর মাথা কাটা যায়। তাই তিনি নিজের আহারের খরচ বাঁচিয়ে গোপনে শিল্পের সরঞ্জাম কিনিয়ে আনতেন। যা-কিছু কাজ করতেন সেও গোপনে দরজা বন্ধ করে। ভর্ৎসনার ভয়ে নয়, অরসিকের দৃষ্টিপাতের সংকোচে। আজ চুনি ছিল তাঁর শিল্পরচনার একমাত্র দর্শক ও বিচারকারী। এই

কাজে ক্রমে তার সহযোগিতাও ফুটে উঠল। তাকে লাগল বিষম নেশা। শিশুর এ অপরাধ ঢাকা পড়ে না, খাতার পাতাগুলো অতিক্রম করে দেয়ালের গায়ে পর্যন্ত প্রকাশ হতে থাকে। হাতে মুখে জামার হাতায় কলঙ্ক ধরা পড়ে। পয়সা-সাধনার বিরুদ্ধে ইন্দ্রদেব শিশুর চিত্তকেও প্রলুব্ধ করতে ছাড়েন না। খুড়োর হাতে অনেক দুঃখ তাকে পেতে হল।

একদিকে শাসন যতই বাড়তে চলল আর-এক দিকে মা তাকে ততই অপরাধে সহায়তা করতে লাগলেন। আপিসের বড়োসাহেব মাঝে মাঝে আপিসের বড়োবাবুকে নিয়ে আপন কাজে মফস্‌সলে যেতেন, সেই সময়ে মায়েতে ছেলেতে মিলে অবাধ আনন্দ। একেবারে ছেলেমানুষি একশেষ! যে-সব জন্তুর মূর্তি হত, বিধাতা এখনো তাদের সৃষ্টি করেননি—বেড়ালের ছাঁচের সঙ্গে কুকুরের ছাঁচ যেত মিলে, এমনকী মাছের সঙ্গে পাখির প্রভেদ ধরা কঠিন হত। এই-সমস্ত সৃষ্টিকার্য রক্ষা করবার উপায় ছিল না—বড়োবাবু ফিরে আসবার পূর্বেই এদের চিহ্ন লোপ করতে হত। এই দুজনের সৃষ্টিলীলায় ব্রহ্মা এবং রুদ্রই ছিলেন, মাঝখানে বিষ্ণুর আবির্ভাব হল না।

শিল্পরচনাবায়ুর প্রকোপ সত্যবতীদের বংশে প্রবল ছিল। তারই প্রমাণস্বরূপে সত্যবতীর চেয়ে বয়সে বড়ো তাঁরই এক ভাগনে রঙ্গলাল চিত্রবিদ্যায় হঠাৎ নামজাদা হয়ে উঠলেন। অর্থাৎ দেশের রসিক লোক তাঁর রচনার অদ্ভুতত্ব নিয়ে খুব অট্টহাস্য জমালে। তারা যে-রকম কল্পনা করে তার সঙ্গে তাঁর কল্পনার মিল হয় না দেখে তাঁর গুণপনার সম্বন্ধে তাদের প্রচণ্ড অবজ্ঞা হল। আশ্চর্য এই যে, এই অবজ্ঞার জমিতেই বিরোধ-বিদ্রূপের আবহাওয়ায় তাঁর খ্যাতি বেড়ে উঠতে লাগল; যারা তাঁর নকল করে তারাই উঠে পড়ে লাগল প্রমাণ করতে যে, লোকটা আর্টিস্ট হিসাবে ফাঁকি—এমনকী, তার টেকনিকে সুস্পষ্ট গলদ। এই পরমনিন্দিত চিত্রকর একদিন আপিসের বড়োবাবুর অবর্তমানে এলেন তাঁর মামির বাড়িতে। দ্বারে ধাক্কা মেরে মেরে ঘরে যখন প্রবেশলাভ করলেন দেখলেন, মেঝেতে পা ফেলবার জো নেই। ব্যাপারখানা ধরা পড়ল। রঙ্গলাল বললেন, 'এতদিন পরে দেখা গেল, গুণীর প্রাণের ভিতর থেকে সৃষ্টিমূর্তি তাজা বেরিয়েছে, এর মধ্যে দাগা-বুলোনোর তো কোনো লক্ষণ নেই, যে-বিধাতা রূপ সৃষ্টি করেন তাঁর বয়সের সঙ্গে ওর বয়সের মিল আছে। সব ছবিগুলো বের করে আমাকে দেখাও।'

কোথা থেকে বের করবে। যে-গুণী রঙে রঙে ছায়া আলোয় আকাশে আকাশে চিত্র আঁকেন তিনি তাঁর কুহেলিকা-মরীচিকাগুলি যেখানে অকাতরে সরিয়ে ফেলেন, এদের কীর্তিগুলোও সেইখানেই গেছে। রঙ্গলাল মাথার দিব্যি দিয়ে তাঁর মামিকে বললেন, 'এবার থেকে তোমরা যা-কিছু রচনা করবে আমি এসে সংগ্রহ করে নিয়ে যাব।'

বড়োবাবু এখনো আসেননি। সকাল থেকে শ্রাবণের ছায়ায় আকাশ ধ্যানমগ্ন, বৃষ্টি পড়ছে; বেলা ঘড়ির কাঁটার কোন সংকেতের কাছে তার ঠিকানা নেই, তার খোঁজ করতেও মন যায় না। আজ চুনিবাবু নৌকো-ভাসানোর ছবি আঁকতে লেগেছেন। নদীর ঢেউগুলো মকরের পাল, হাঁ করে নৌকোটাকে গিলতে চলেছে এমনিতরো ভাব; আকাশের মেঘগুলোও যেন উপর থেকে চাদর উড়িয়ে উৎসাহ দিচ্ছে বলে বোধ হচ্ছে—কিন্তু, মকরগুলো সর্বসাধারণের মকর নয়, আর মেঘগুলোকে 'ধূমজ্যোতিঃসলিলমরুতাং সন্নিবেশঃ' বললে অত্যুক্তি করা হবে। এ-কথাও সত্যের অনুরোধে বলা উচিত যে, এইরকম নৌকো যদি

গড়া হয় তাহলে ইনসুয়োরেন্সের আপিস কিছুতেই তার দায়িত্ব নিতে রাজি হবে না। চলল রচনা, আকাশের চিত্রীও যা-খুশি তাই করছেন, আর ঘরের মধ্যে ওই মস্ত চোখ-মেলা ছেলেটিও তথৈবচ।

এদের খেয়াল ছিল না যে, দরজা খোলা। বড়োবাবু এলেন। গর্জন করে উঠলেন, 'কী হচ্ছে রে।'

ছেলেটার বুক কেঁপে উঠল, মুখ হল ফ্যাকাশে। স্পষ্ট বুঝতে পারলেন, পরীক্ষায় চুনিলালের ইতিহাসে তারিখ ভুল হচ্ছে তার কারণটা কোথায়। ইতিমধ্যে চুনিলাল ছবিটাকে তার জামার মধ্যে লুকোবার ব্যর্থ প্রয়াস করাতে অপরাধ আরও প্রকাশমান হয়ে উঠল। টেনে নিয়ে গোবিন্দ যা দেখলেন তাতে তিনি আরও অবাক—ব্যাপারখানা কী। এর চেয়ে যে ইতিহাসের তারিখ ভুলও ভালো। ছবিটা কুটিকুটি করে ছিঁড়ে ফেললেন। চুনিলাল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

সত্যবতী একাদশীর দিন প্রায় ঠাকুরঘরেই কাটাতেন। সেইখান থেকে ছেলের কান্না শুনে ছুটে এলেন। ছবির ছিন্ন খণ্ডগুলো মেঝের উপর লুটোচ্ছে আর মেঝের উপর লুটোচ্ছে চুনিলাল। গোবিন্দ তখন ইতিহাসের তারিখ-ভুলের আদি কারণগুলো সংগ্রহ করছিলেন অপসারণের অভিপ্রায়ে।

সত্যবতী এতদিন কখনো গোবিন্দের কোনো ব্যবহারে কোনো কথা বলেননি। এঁরই 'পরে তাঁর স্বামী নির্ভর স্থাপন করেছেন, এই স্মরণ করেই তিনি নিঃশব্দে সব সহ্য করেছেন। আজ তিনি অশ্রুতে আর্দ্র, ক্রোধে কম্পিত কণ্ঠে বললেন, 'কেন তুমি চুনির ছবি ছিঁড়ে ফেললে।'

গোবিন্দ বললেন, 'পড়াশুনা করবে না? আখেরে ওর হবে কী।'

সত্যবতী বললেন, 'আখেরে ও যদি পথের ভিক্ষুক হয় সেও ভালো। কিন্তু, কোনোদিন তোমার মতো যেন না হয়। ভগবান ওকে যে-সম্পদ দিয়েছেন তারই গৌরব যেন তোমার পয়সার গর্বের চেয়ে বেশি হয়, এই ওর প্রতি আমার, মায়ের আশীর্বাদ।'

গোবিন্দ বললেন, 'আমার দায়িত্ব আমি ছাড়তে পারব না, এ চলবে না কিছুতেই। আমি কালই ওকে বোর্ডিং-স্কুলে পাঠিয়ে দেব—নইলে তুমি ওর সর্বনাশ করবে।'

বড়োবাবু আপিসে গেলেন। ঘনবৃষ্টি নামল, রাস্তা জলে ভেসে যাচ্ছে।

সত্যবতী চুনির হাত ধরে বললেন, 'চল, বাবা।'

চুনি বললে, 'কোথায় যাবে, মা।'

'এখান থেকে বেরিয়ে যাই।'

রঙ্গলালের দরজায় একহাঁটু জল। সত্যবতী চুনিলালকে নিয়ে তার ঘরে ঢুকলেন; বললেন, 'বাবা, তুমি নাও এর ভার। বাঁচাও একে পয়সার সাধনা থেকে।'

দ্বাদশ শ্রেণি

গদ্য

অপরিচিতা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আজ আমার বয়স সাতাশ মাত্র। এ জীবনটা না দৈর্ঘ্যের হিসাবে বড়ো, না গুণের হিসাবে। তবু ইহার একটু বিশেষ মূল্য আছে। ইহা সেই ফুলের মতো যাহার বুকের উপরে ভ্রমর আসিয়া বসিয়াছিল, এবং সেই পদক্ষেপের ইতিহাস তাহার জীবনের মাঝখানে ফলের মতো গুটি ধরিয়া উঠিয়াছে।

সেই ইতিহাসটুকু আকারে ছোটো, তাহাকে ছোটো করিয়াই লিখিব। ছোটোকে যাঁহারা সামান্য বলিয়া ভুল করেন না তাঁহারা ইহার রস বুঝিবেন।

কলেজে যতগুলো পরীক্ষা পাস করিবার সব আমি চুকাইয়াছি। ছেলেবেলায় আমার সুন্দর চেহারা লইয়া পণ্ডিতমশায় আমাকে শিমুল ফুল ও মাকাল ফলের সহিত তুলনা করিয়া বিদ্রূপ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। ইহাতে তখন বড়ো লজ্জা পাইতাম; কিন্তু বয়স হইয়া একথা ভাবিয়াছি, যদি জন্মান্তর থাকে তবে আমার মুখে সুরূপ এবং পণ্ডিতমশায়দের মুখে বিদ্রূপ আবার যেন এমনি করিয়াই প্রকাশ পায়।

আমার পিতা এককালে গরিব ছিলেন। ওকালতি করিয়া তিনি প্রচুর টাকা রোজগার করিয়াছেন, ভোগ করিবার সময় নিমেষমাত্রও পান নাই। মৃত্যুতে তিনি যে হাঁফ ছাড়িলেন, সেই তাঁর প্রথম অবকাশ।

আমার তখন বয়স অল্প। মার হাতেই আমি মানুষ। মা গরিবের ঘরের মেয়ে; তাই আমরা যে ধনী এ কথা তিনিও ভোলেন না, আমাকে ভুলিতে দেন না। শিশুকালে আমি কোলে-কোলেই মানুষ— বোধ করি সেই জন্য শেষ পর্যন্ত আমার পুরাপুরি বয়সই হইল না। আজও আমাকে দেখিলে মনে হইবে আমি অন্নপূর্ণার কোলে গজাননের ছোটো ভাইটি।

আমার আসল অভিভাবক আমার মামা। তিনি আমার চেয়ে বড়োজোর বছর ছয়েক বড়ো। কিন্তু ফল্গুর বালির মতো তিনি আমাদের সমস্ত সংসারটাকে নিজের অন্তরের মধ্যে শুষিয়া লইয়াছেন। তাঁহাকে না খুঁড়িয়া এখানকার এক গণ্ডূষও রস পাইবার জো নাই। এই কারণে কোনো কিছুর জন্যই আমাকে কোনো ভাবনা ভাবিতেই হয় না।

কন্যার পিতা মাত্রেই স্বীকার করিবেন, আমি সৎপাত্র। তামাকটুকু পর্যন্ত খাই না। ভালোমানুষ হওয়ার কোনো ঝঞ্ঝাট নাই, তাই আমি নিতান্ত ভালোমানুষ। মাতার আদেশ মানিয়া চলিবার ক্ষমতা আমার আছে— বস্তুত না-মানিবার ক্ষমতা আমার নেই। অন্তঃপুরের শাসনে চলিবার মতো করিয়াই আমি প্রস্তুত হইয়াছি, যদি কোনো কন্যা স্বয়ম্বরা হন তবে এই সুলক্ষণটি স্মরণ রাখিবেন।

অনেক বড়ো ঘর হইতে আমার সম্বন্ধ আসিয়াছিল। কিন্তু মামা, যিনি পৃথিবীতে আমার ভাগ্যদেবতার প্রধান এজেন্ট, বিবাহ সম্বন্ধে তাঁর একটা বিশেষ মত ছিল। ধনীর কন্যা তাঁর পছন্দ নয়। আমাদের ঘরে যে

মেয়ে আসিবে সে মাথা হেঁট করিয়া আসিবে, এই তিনি চান। অথচ টাকার প্রতি আসক্তি তাঁর অস্থিমজ্জায় জড়িত। তিনি এমন বেহাই চান যাহার টাকা নাই অথচ যে টাকা দিতে কসুর করিবে না। যাহাকে শোষণ করা চলিবে অথচ বাড়িতে আসিলে গুড়গুড়ির পরিবর্তে বাঁধা হুকায় তামাক দিলে যাহার নালিশ খাটিবে না।

আমার বন্ধু হরিশ কানপুরে কাজ করে। সে ছুটিতে কলকাতায় আসিয়া আমার মন উতলা করিয়া দিল। সে বলিল, 'ওহে, মেয়ে যদি বল একটি খাসা মেয়ে আছে।'

কিছুদিন পূর্বে এম. এ. পাস করিয়াছি। সামনে যতদূর পর্যন্ত দৃষ্টি চলে ছুটি ধূ ধূ করিতেছে; পরীক্ষা নাই, উমেদারি নাই, চাকরি নাই; নিজের বিষয় দেখিবার চিন্তাও নাই, শিক্ষাও নাই, ইচ্ছাও নাই—থাকিবার মধ্যে ভিতরে আছেন মা এবং বাহিরে আছেন মামা।

এই অবকাশের মরুভূমির মধ্যে আমার হৃদয় তখন বিশ্বব্যাপী নারীরূপের মরীচিকা দেখিতেছিল—আকাশে তাহার দৃষ্টি, বাতাসে তাহার নিশ্বাস, তরুমর্মরে তাহার গোপন কথা।

এমন সময় হরিশ আসিয়া বলিল 'মেয়ে যদি বল, তবে—।' আমার শরীর মন বসন্তবাতাসে বকুলবনের নবপল্লবরাশির মতো কাঁপিতে কাঁপিতে আলোছায়া ধুনিতে লাগিল। হরিশ মানুষটা ছিল রসিক, রস দিয়া বর্ণনা করিবার শক্তি তাহার ছিল, আর আমার মন ছিল তৃষার্ত।

আমি হরিশকে বলিলাম, 'একবার মামার কাছে কথাটা পাড়িয়া দেখো।'

হরিশ আসর জমাইতে অদ্বিতীয়। তাই সর্বত্রই তাহার খাতির। মামাও তাহাকে পাইলে ছাড়িতে চান না। কথাটা তাঁর বৈঠকে উঠিল। মেয়ের চেয়ে মেয়ের বাপের খবরটাই তাঁহার কাছে গুরুতর। বাপের অবস্থা তিনি যেমনটি চান তেমনি। এককালে ইঁহাদের বংশে লক্ষ্মীর মঙ্গলঘট ভরা ছিল। এখন তাহা শূন্য বলিলেই হয়, অথচ তলায় সামান্য কিছু বাকি আছে। দেশে বংশমর্যাদা রাখিয়া চলা সহজ নয় বলিয়া ইনি পশ্চিমে গিয়া বাস করিতেছেন। সেখানে গরিব গৃহস্থের মতোই থাকেন। একটি মেয়ে ছাড়া তাঁর আর নাই। সুতরাং তাহারই পশ্চাতে লক্ষ্মীর ঘটটি একবার উপুড় করিয়া দিতে দ্বিধা হইবে না।

এসব ভালো কথা। কিন্তু মেয়ের বয়স যে পনেরো, তাই শুনিয়া মামার মন ভার হইল। বংশে তো কোনো দোষ নাই? না, দোষ নাই—বাপ কোথাও তাঁর মেয়ের যোগ্য বর খুঁজিয়া পান না। একে তো বরের হাট মহার্ঘ, তাহার পরে ধনুক-ভাঙা পণ, কাজেই বাপ কেবলই সবুর করিতেছেন কিন্তু মেয়ের বয়স সবুর করিতেছে না।

যাই হোক, হরিশের সরস রসনার গুণ আছে। মামার মন নরম হইল। বিবাহের ভূমিকা-অংশটা নির্বিঘ্নে সমাধা হইয়া গেল। কলিকাতার বাহিরে বাকি যে পৃথিবীটা আছে সমস্তটাকেই মামা আন্ডামান দ্বীপের অন্তর্গত বলিয়া জানেন। জীবনে একবার বিশেষ কাজে তিনি কোন্নগর পর্যন্ত গিয়াছিলেন। মামা যদি মনু হইতেন তবে তিনি হাবড়ার পুল পার হওয়াটাকে তাঁহার সংহিতায় একেবারে নিষেধ করিয়া দিতেন। মনের মধ্যে ইচ্ছা ছিল, নিজের চোখে মেয়ে দেখিয়া আসিব। সাহস করিয়া প্রস্তাব করিতে পারলাম না।

কন্যাকে আশীর্বাদ করিবার জন্য যাহাকে পাঠানো হইল সে আমাদের বিনুদাদা, আমার পিস্‌তুতো ভাই। তাহার মত, রুচি এবং দক্ষতার 'পরে আমি যোলো-আনা নির্ভর করিতে পারি। বিনুদা ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, 'মন্দ নয় হে! খাঁটি সোনা বটে।'

বিনুদাদার ভাষাটা অত্যন্ত আঁট। যেখানে আমরা বলি 'চমৎকার', সেখানে তিনি বলেন 'চলনসই'। অতএব বুঝিলাম, আমার ভাগ্যে প্রজাপতির সঙ্গে পঞ্চশরের কোনো বিরোধ নাই।

২

বলা বাহুল্য, বিবাহ-উপলক্ষ্যে কন্যাপক্ষকেই কলিকাতায় আসিতে হইল। কন্যার পিতা শম্ভুনাথবাবু হরিশকে কত বিশ্বাস করেন তাহার প্রমাণ এই যে, বিবাহের তিন দিন পূর্বে তিনি আমাকে প্রথম চক্ষে দেখেন এবং আশীর্বাদ করিয়া যান। বয়স তাঁর চল্লিশের কিছু এপারে বা ওপারে। চুল কাঁচা, গোঁফে পাক ধরিতে আরম্ভ করিয়াছে মাত্র। সুপুরুষ বটে। ভিড়ের মধ্যে দেখিলে সকলের আগে তাঁর উপরে চোখ পড়িবার মতো চেহারা।

আশা করি, আমাকে দেখিয়া তিনি খুশি হইয়াছিলেন। বোঝা শক্ত, কেননা তিনি বড়োই চুপচাপ। যে দুটি-একটি কথা বলেন, যেন তাহাতে পুরা জোর দিয়া বলেন না। মামার মুখ তখন অনর্গল ছুটিতেছিল—ধনে মানে আমাদের স্থান যে শহরের কারও চেয়ে কম নয়, সেইটেকেই তিনি নানা প্রসঙ্গে প্রচার করিতেছিলেন। শম্ভুনাথবাবু এ কথায় একেবারে যোগই দিলেন না— কোনো ফাঁকে একটা হুঁ বা হাঁ কিছুই শোনা গেল না। আমি হইলে দমিয়া যাইতাম। কিন্তু, মামাকে দমানো শক্ত। তিনি শম্ভুনাথবাবুর চুপচাপ ভাব দেখিয়া ভাবিলেন, লোকটা নিতান্ত নির্জীব, একেবারে কোনো তেজ নাই। বেহাই-সম্প্রদায়ের আর যাই থাক, তেজ থাকাটা দোষের, অতএব মামা মনে মনে খুশি হইলেন। শম্ভুনাথবাবু যখন উঠিলেন তখন মামা সংক্ষেপে উপর হইতেই তাঁকে বিদায় করিলেন, গাড়িতে তুলিয়া দিতে গেলেন না।

পণ সম্বন্ধে দুই পক্ষে পাকাপাকি কথা ঠিক হইয়া গিয়েছিল। মামা নিজেকে অসামান্য চতুর বলিয়াই অভিমান করিয়া থাকেন। কথাবার্তায় কোথাও তিনি কিছু ফাঁক রাখেন নাই। টাকার অঙ্ক তো স্থির ছিলই, তারপরে গহনা কত ভরির এবং সোনা কত দরের হইবে সেও একেবারে বাঁধাবাঁধি হইয়া গিয়াছিল। আমি নিজে এসমস্ত কথার মধ্যে ছিলাম না; জানিতাম না, দেনা-পাওনা কী স্থির হইল। মনে জানিতাম, এই স্থূল অংশটাও বিবাহের একটা প্রধান অংশ, এবং সে অংশের ভার যাঁর উপরে তিনি এক কড়াও ঠকিবেন না। বস্তুত, আশ্চর্য পাকা লোক বলিয়া মামা আমাদের সমস্ত সংসারের প্রধান গর্বের সামগ্রী। যেখানে আমাদের কোনো সম্বন্ধ আছে সেখানে সর্বত্রই তিনি বুদ্ধির লড়াইয়ে জিতিবেন, এ একেবারে ধরা কথা। এইজন্য আমাদের ভাব না থাকিলেও এবং অন্য পক্ষের অভাব কঠিন হইলেও জিতিব, আমাদের সংসারের এই জেদ— ইহাতে যে বাঁচুক আর যে মরুক।

মামা বিবাহ-বাড়িতে ঢুকিয়া খুশি হইলেন না। একে তো উঠানটাতে বরযাত্রীদের জায়গা সংকুলান হওয়াই শক্ত, তাহার পরে সমস্ত আয়োজন নিতান্ত মধ্যম রকমের। ইহার পরে শম্ভুনাথবাবুর ব্যবহারটিও নেহাত ঠান্ডা। তাঁর বিনয়টা অজস্র নয়। মুখে তো কথাই নাই। কোমরে চাদর বাঁধা, গলাভাঙা, টাকপড়া, মিশকালো এবং বিপুল শরীর তাঁর একটি উকিল বন্ধু যদি নিয়ত হাত জোড় করিয়া, মাথা হেলাইয়া, নম্রতার স্মিতহাস্যে ও গদগদ বচনে কন্সর্ট পার্টির করতাল-বাজিয়ে হইতে শুরু করিয়া বরকর্তাদের প্রত্যেককে বার বার প্রচুররূপে অভিষিক্ত করিয়া না দিতেন তবে গোড়াতেই একটা এসপার-ওসপার হইত।

আমি সভায় বসিবার কিছুক্ষণ পরেই মামা শম্ভুনাথবাবুকে পাশের ঘরে ডাকিয়া লইয়া গেলেন। কী কথা হইল জানি না, কিছুক্ষণ পরেই শম্ভুনাথবাবু আমাকে আসিয়া বলিলেন, 'ব্যাবজি, একবার এই দিকে আসতে হচ্ছে।'

ব্যাপারখানা এই। — সকলের না হউক, কিন্তু কোনো কোনো মানুষের জীবনের একটা-কিছু লক্ষ্য থাকে। মামার একমাত্র লক্ষ্য ছিল, তিনি কোনোমতেই কারও কাছে ঠকিবেন না। তাঁর ভয়, তাঁর বেহাই তাঁকে গহনায় ফাঁকি দিতে পারেন— বিবাহকার্য শেষ হইয়া গেলে সে ফাঁকির আর প্রতিকার চলিবে না। বাড়িভাড়া, সওগাদ, লোকবিদায় প্রভৃতি সম্বন্ধে যেরকম টানাটানির পরিচয় পাওয়া গেছে তাহাতে মামা ঠিক করিয়াছিলেন, দেওয়া-থোওয়া সম্বন্ধে এ লোকটির শুধু মুখের কথার উপর ভর করা চলিবে না। সেইজন্য বাড়ির স্যাকরাকে সুদ্ধ সঙ্গে আনিয়াছিলেন। পাশের ঘরে গিয়া দেখিলাম, মামা এক তক্তপোশে এবং স্যাকরা তাহার দাঁড়িপাল্লা কষ্টিপাথর প্রভৃতি লইয়া মেজেয় বসিয়া আছে।

শম্ভুনাথবাবু আমাকে বলিলেন, 'তোমার মামা বলিতেছেন, বিবাহের কাজ শুরু হইবার আগেই তিনি কনের সমস্ত গহনা যাচাই করিয়া দেখিবেন, ইহাতে তুমি কী বল।'

আমি মাথা হেঁট করিয়া চুপ করিয়া রহিলাম।

মামা বলিলেন, 'ও আবার কী বলিবে। আমি যা বলিব তাই হইবে।'

শম্ভুনাথ বাবু আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'সেই কথা তবে ঠিক?'

উনি যা বলিবেন তাই হইবে? এ সম্বন্ধে তোমার কিছুই বলিবার নাই?'

আমি একটু ঘাড় নাড়ার ইঙ্গিতে জানাইলাম, এ সব কথায় আমার সম্পূর্ণ অনধিকার।

'অচ্ছা তবে বোসো, মেয়ের গা হইতে সমস্ত গহনা খুলিয়া আনিতেছি।' এই বলিয়া তিনি উঠলেন।

মামা বলিলেন, 'অনুপম এখানে কী করিবে, ও সভায় গিয়ে বসুক।'

শম্ভুনাথ বলিলেন, 'না, সভায় নয়, এখানেই বসিতে হইবে।'

কিছুক্ষণ পরে তিনি একখানা গামছায় বাঁধা গহনা আনিয়া তক্তপোশের উপর মেলিয়া ধরিলেন। সমস্তই তাঁহার পিতামহীদের আমলের গহনা— হাল ফ্যাশনের সূক্ষ্ম কাজ নয়— যেমন মোটা, তেমনি ভারী।

স্যাকরা গহনা হাতে তুলিয়া লইয়া বলিল, 'এ আর দেখিব কী। ইহাতে খাদ নাই— এমন সোনা এখনকার দিনে ব্যবহারই হয় না।'

এই বলিয়া সে মকরমুখা মোটা একখানা বালায় একটু চাপ দিয়া দেখাইল, তাহা বাঁকিয়া যায়।

মামা তখনি তাঁর নোটবইয়ে গহনাগুলির ফর্দ টুকিয়া লইলেন, পাছে যাহা দেখানো হইল তাহার কোনোটা কম পড়ে। হিসাব করিয়া দেখিলেন, গহনা যে-পরিমাণ দিবার কথা এগুলি সংখ্যায় দরে এবং ভারে তার অনেক বেশি।

গহনাগুলির মধ্যে একজোড়া ইয়ারিং ছিল। শম্ভুনাথ সেইটে স্যাকরার হাতে দিয়া বলিলেন, 'এইটে একবার পরখ করিয়া দেখো।'

স্যাকরা কহিল, ‘ইহা বিলাতি মাল, ইহাতে সোনার ভাগ সামান্যই আছে।’

শম্ভুবাবু ইয়ারিংজোড়া মামার হাতে দিয়া বলিলেন, ‘এটা আপনারাই রাখিয়া দিন।’

মামা সেটা হাতে লইয়া দেখিলেন, এই ইয়ারিং দিয়াই কন্যাকে তাঁহারা আশীর্বাদ করিয়াছিলেন।

মামার মুখ লাল হইয়া উঠিল। দরিদ্র তাঁহাকে ঠকাইতে চাহিবে কিন্তু তিনি ঠকিবেন না, এই আনন্দ-সম্ভোগ হইতে বঞ্চিত হইলেন এবং তাহার উপরেও কিছু উপরি-পাওনা জুটিল। অত্যন্ত মুখ ভার করিয়া বলিলেন, ‘অনুপম, যাও, তুমি সভায় গিয়া বোসো গে।’

শম্ভুনাথবাবু বলিলেন, ‘না, এখন সভায় বসিতে হইবে না। চলুন, আগে আপনাদের খাওয়াইয়া দিই।’

মামা বলিলেন, ‘সে কী কথা। লগ্ন—’

শম্ভুনাথবাবু বলিলেন, ‘সেজন্য কিছু ভাবিবেন না— এখন উঠুন।’

লোকটি নেহাত ভালোমানুষ ধরনের কিন্তু ভিতরে বেশ-একটু জোর আছে বলিয়া বোধ হইল। মামাকে উঠিতে হইল। বরযাত্রীদেরও আহার হইয়া গেল। আয়োজনের আড়ম্বর ছিল না। কিন্তু, রান্না ভালো এবং সমস্ত বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বলিয়া সকলেরই তৃপ্তি হইল।

বরযাত্রদের খাওয়া শেষ হইলে শম্ভুনাথবাবু আমাকে খাইতে বলিলেন। মামা বলিলেন, ‘সে কী কথা। বিবাহের পূর্বে বর খাইবে কেমন করিয়া।’

এ সম্বন্ধে মামার কোনো মতপ্রকাশকে তিনি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, ‘তুমি কী বল। বসিয়া যাইতে দোষ কিছু আছে?’

মূর্তিমতী মাতৃ-আজ্ঞা-স্বরূপে মামা উপস্থিত, তাঁর বিরুদ্ধে চলা আমার পক্ষে অসম্ভব। আমি আহারে বসিতে পারিলাম না।

তখন শম্ভুনাথবাবু মামাকে বলিলেন, ‘আপনাদিগকে অনেক কষ্ট দিয়াছি। আমরা ধনী নই, আপনাদের যোগ্য আয়োজন করিতে পারি নাই, ক্ষমা করিবেন। রাত হইয়া গেছে, আর আপনাদের কষ্ট বাড়াইতে ইচ্ছা করি না। এখন তবে—’

মামা বলিলেন, ‘তা, সভায় চলুন, আমরা তো প্রস্তুত আছি।’

শম্ভুনাথ বলিলেন, ‘তবে আপনাদের গাড়ি বলিয়া দিই?’

মামা আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, ‘ঠাট্টা করিতেছেন নাকি?’

শম্ভুনাথ কহিলেন, ‘ঠাট্টা তো আপনিই করিয়া সারিয়াছেন। ঠাট্টার সম্পর্কটাকে স্থায়ী করিবার ইচ্ছা আমার নাই।’

মামা দুই চোখ এতবড়ো করিয়া মেলিয়া অবাক হইয়া রহিলেন।

শম্ভুনাথ কহিলেন, ‘আমার কন্যার গহনা আমি চুরি করিব, এ কথা যারা মনে করে তাদের হাতে আমি কন্যা দিতে পারি না।’

আমাকে একটি কথা বলাও তিনি আবশ্যক বোধ করিলেন না। কারণ, প্রমাণ হইয়া গেছে, আমি কেহই নই।

তার পরে যা হইল সে আমি বলিতে ইচ্ছা করি না। ঝাড়লণ্ঠন ভাঙিয়া-চুরিয়া, জিনিসপত্র লন্ডভন্ড করিয়া, বরযাত্রের দল দক্ষযজ্ঞের পালা সারিয়া বাহির হইয়া গেল।

বাড়ি ফিরিবার সময় ব্যান্ড রসনচৌকি ও কন্সর্ট একসঙ্গে বাজিল না এবং অভ্রের ঝাড়গুলো আকাশের তারার উপর আপনাদের কর্তব্যের বরাত দিয়া কোথায় যে মহানির্বাণ লাভ করিল সন্ধান পাওয়া গেল না।

৩

বাড়ির সকলে তো রাগিয়া আগুন। কন্যার পিতার এত গুমর। কলি যে চারপোয়া হইয়া আসিল। সকলে বলিল, 'দেখি , মেয়ের বিয়ে দেন কেমন করিয়া।' কিন্তু মেয়ের বিয়ে হইবে না, এ ভয় যার মনে নাই তার শাস্তির উপায় কী।

সমস্ত বাংলাদেশের মধ্যে আমি একমাত্র পুরুষ যাহাকে কন্যার বাপ বিবাহের আসর হইতে নিজে ফিরাইয়া দিয়াছে। এতবড়ো সৎপাত্রের কপালে এতবড়ো কলঙ্কের দাগ কোন নষ্টগ্রহ এত আলো জ্বালাইয়া, বাজনা বাজাইয়া, সমারোহ করিয়া, আঁকিয়া দিল? বরযাত্ররা এই বলিয়া কপাল চাপড়াইতে লাগিল যে 'বিবাহ হইল না অথচ আমাদের ফাঁকি দিয়া খাওয়াইয়া দিল—পাকযন্ত্রটাকে সমস্ত অন্নসুদ্ধ সেখানে টান মারিয়া ফেলিয়া দিয়া আসিতে পারিলে তবে আপশোশ মিটিত।'

'বিবাহ চুক্তিভঙ্গ ও মানহানির দাবিতে নালিশ করিব' বলিয়া মামা অত্যন্ত গোল করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। হিতৈষীরা বুঝাইয়া দিল, তাহা হইলে তামাশার যেটুকু বাকি আছে তাহা পুরা হইবে।

বলা বাহুল্য, আমিও খুব রাগিয়াছিলাম। কোনো গতিকে শম্ভুনাথ বিষম জব্দ হইয়া আমাদের পায়ে ধরিয়া আসিয়া পড়েন, গোঁফের রেখায় তা দিতে দিতে এইটেই কেবল কামনা করিতে লাগিলাম।

কিন্তু, এই আক্রোশের কালো রঙের স্রোতের পাশাপাশি আর-একটা স্রোত বহিতেছিল যেটার রং একেবারেই কালো নয়। সমস্ত মন যে সেই অপরিচিতার পানে ছুটিয়া গিয়াছিল—এখনো যে তাহাকে কিছুতেই টানিয়া ফিরাইতে পারি না। দেয়ালটুকুর আড়ালে রহিয়া গেল গো। কপালে তার চন্দন আঁকা, গায়ে তার লালশাড়ি, মুখে তার লজ্জার রক্তিমা, হৃদয়ের ভিতরে কী যে তা কেমন করিয়া বলিব। আমার কল্পলোকের কল্পলতাটি বসন্তের সমস্ত ফুলের ভার আমাকে নিবেদন করিয়া দিবার জন্য নত হইয়া পড়িয়াছিল। হাওয়া আসে, গন্ধ পাই, পাতার শব্দ শুনি— কেবল আর একটি মাত্র পা-ফেলার অপেক্ষা— এমন সময়ে সেই এক পদক্ষেপের দূরত্বটুকু এই মূহুর্তে অসীম হইয়া উঠিল!

এতদিন যে প্রতি সন্ধ্যায় আমি বিনুদার বাড়িতে গিয়া তাঁর প্রত্যেক কথাটি স্ফুলিঙ্গের মতো আমার মনের মাঝখানে আগুন জ্বালিয়া দিয়াছিল। বুঝিয়াছিলাম, মেয়েটির রূপ বড়ো আশ্চর্য, কিন্তু না দেখিলাম তাহাকে চোখে, না দেখিলাম তার ছবি; সমস্তই অস্পষ্ট হইয়া রহিল; বাহিরে তো সে ধরা দিলই না , তাহাকে মনেও আনিতে পারিলাম না—এইজন্য মন সেদিনকার সেই বিবাহসভার দেয়ালটার বাহিরে ভূতের মতো দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বেড়াইতে লাগিল।

হরিশের কাছে শুনিয়াছি, মেয়েটিকে আমার ফোটোগ্রাফ দেখানো হইয়াছিল। পছন্দ করিয়াছে বইকি। না করিবার তো কোনো কারণ নাই। আমার মন বলে, সে ছবি তার কোনো-একটি বাক্সের মধ্যে লুকানো আছে। একলা ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া এক-একদিন নিরালা দুপুরবেলায় সে কি সেটি খুলিয়া দেখে না। যখন ঝুঁকিয়া পড়িয়া দেখে তখন ছবিটির উপরে কি তার মুখের দুই ধার দিয়া এলোচুল আসিয়া পড়ে না। হঠাৎ বাহিরে কারও পায়ের শব্দ পাইলে সে কি তাড়াতাড়ি তার সুগন্ধ আঁচলের মধ্যে ছবিটি লুকাইয়া ফেলে না।

দিন যায়। একটা বৎসর গেল। সে মেয়ের নাকি ভালো পাত্র জুটিয়াছিল কিন্তু সে পণ করিয়াছে বিবাহ করিবে না। শুনিয়া আমার মন পুলকের আবেশে ভরিয়া গেল। আমি কল্পনায় দেখিতে লাগিলাম, সে ভালো করিয়া খায় না; সন্ধ্যা হইয়া আসে, সে চুল বাঁধিতে ভুলিয়া যায়। তার বাপ তার মুখের পানে চান আর ভাবেন, 'আমার মেয়ে দিনে দিনে এমন হইয়া যাইতেছে কেন।' হঠাৎ কোনোদিন তার ঘরে আসিয়া দেখেন, মেয়ের দুই চক্ষু জলে ভরা। জিজ্ঞাসা করেন, 'মা, তোর কী হইয়াছে বল আমাকে।' মেয়ে তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছিয়া বলে, 'কই কিছুই তো হয়নি, বাবা।' বাপের এক মেয়ে যে— আদরের মেয়ে। যখন অনাবৃষ্টির দিনের ফুলের কুঁড়িটির মতো মেয়ে একেবারে বিমর্ষ হইয়া পড়িয়াছে তখন বাপের প্রাণে আর সহিল না। তখন অভিমান ভাসাইয়া দিয়া তিনি ছুটিয়া আসিলেন আমাদের দ্বারে। তার পরে? তার পরে মনের মধ্যে সেই যে কালো রঙের ধারাটা বহিতেছে সে যেন কালো সাপের মতো রূপ ধরিয়া ফোঁস করিয়া উঠিল। সে বলিল, 'বেশ তো, আর-একবার বিবাহের আসর সাজানো হোক, আলো জ্বলুক, দেশ-বিদেশের লোকের নিমন্ত্রণ হোক, তার পরে তুমি বরের টোপর পায়ে দলিয়া দলবল লইয়া সভা ছাড়িয়া চলিয়া এসো।' কিন্তু, যে ধারাটি চোখের জলের মতো শুভ্র সে রাজহংসের রূপ ধরিয়া বলিল, 'যেমন করিয়া আমি একদিন দময়ন্তীর পুষ্পবনে গিয়াছিলাম তেমনি করিয়া আমাকে একবার উড়িয়া যাইতে দাও— আমি বিরহিনীর কানে কানে একবার সুখের খবরটা দিয়ে আসি গে।' তার পরে? তার পরে দুখের রাত পোহাইল, নববর্ষার জল পড়িল, ম্লান ফুলটি মুখ তুলিল—এবারে সেই দেয়ালটার বাহিরে রহিল সমস্ত পৃথিবীর আর-সবাই, আর ভিতরে প্রবেশ করিল একটি মাত্র মানুষ। তার পরে? তার পরে আমার কথাটি ফুরাল।

৪

কিন্তু, কথা এমন করিয়া ফুরাইল না। যেখানে আসিয়া তাহা অফুরান হইয়াছে সেখানকার বিবরণ একটুখানি বলিয়া আমার এ লেখা শেষ করিয়া দিই।

মাকে লইয়া তীর্থে চলিয়াছিলাম। আমার উপরেই ভার ছিল। কারণ, মামা এবারেও হাবড়ার পুল পার হন নাই। রেলগাড়িতে ঘুমাইতেছিলাম। ঝাঁকানি খাইতে খাইতে মাথার মধ্যে নানাপ্রকার এলোমেলো স্বপ্নের ঝুমঝুমি বাজিতেছিল। হঠাৎ একটা কোন্ স্টেশনে জাগিয়া উঠিলাম। আলোতে অন্ধকারে মেশা সেও এক স্বপ্ন; কেবল আকাশে তারাগুলি চিরপরিচিত— আর সবই অজানা অস্পষ্ট; স্টেশনের দীপ-কয়টা খাড়া হইয়া দাঁড়াইয়া আলো ধরিয়া এই পৃথিবীটা যে কত অচেনা, এবং যাহা চারি দিকে তাহা যে কতই বহুদূরে, তাহাই দেখাইয়া দিতেছে। গাড়ির মধ্যে মা ঘুমাইতেছেন; আলোর নীচে সবুজ পর্দা টানা; তোরঙ্গ বাক্স জিনিসপত্র সমস্তই কে কার ঘাড়ে এলোমেলো হইয়া রহিয়াছে, তাহারা যেন স্বপ্নলোকের উলট-পালট

আসবাব, সবুজ প্রদোষের মিটমিটে আলোতে থাকা এবং না-থাকার মাঝখানে কেমন একরকম হইয়া পড়িয়া আছে।

এমন সময়ে সেই অদ্ভুত পৃথিবীর অদ্ভুত রাত্রে কে বলিয়া উঠিল, 'শিগ্‌গির চলে আয়, এই গাড়িতে জায়গা আছে।' মনে হইল, যেন গান শুনিলাম। বাঙালি মেয়ের গলায় বাংলা কথা যে কী মধুর তাহা এমনি করিয়া অসময়ে অজায়গায় আচমকা শুনিলে তবে সম্পূর্ণ বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু, এই গলাটিকে কেবলমাত্র মেয়ের গলা বলিয়া একটা শ্রেণিভুক্ত করিয়া দেওয়া চলে না, এ কেবল একটি মানুষের গলা; শুনিলেই মন বলিয়া ওঠে, 'এমন তো আর শুনি নাই।'

চিরকাল গলার স্বর আমার কাছে বড়ো সত্য। রূপ জিনিসটি বড়ো কম নয় কিন্তু মানুষের মধ্যে যাহা অন্তরতম এবং অনির্বচনীয়, আমার মনে হয়, কণ্ঠস্বর যেন তারই চেহারা। আমি তাড়াতাড়ি গাড়ির জানালা খুলিয়া বাহিরে মুখ বাড়াইয়া দিলাম; কিছুই দেখিলাম না। প্ল্যাটফর্মের অন্ধকারে দাঁড়াইয়া গার্ড তাহার একচক্ষু লণ্ঠন নাড়িয়া দিল, গাড়ি চলিল; আমি জানলার কাছে বসিয়া রহিলাম। আমার চোখের সামনে কোনো মূর্তি ছিল না, কিন্তু হৃদয়ের মধ্যে আমি একটি হৃদয়ের রূপ দেখিতে লাগিলাম। সে যেন এই তারাময়ী রাত্রির মতো, আবৃত করিয়া ধরে কিন্তু তাহাকে ধরিতে পারা যায় না। ওগো সুর, অচেনা কণ্ঠের সুর, এক নিমেষে তুমি যে আমার চিরপরিচয়ের আসনটির উপরে আসিয়া বসিয়াছে। কী আশ্চর্য পরিপূর্ণ তুমি— চঞ্চল কালের ক্ষুব্ধ হৃদয়ের উপরে ফুলটির মতো ফুটিয়াছে অথচ তার ঢেউ লাগিয়া একটি পাপড়িও টলে নাই, অপরিমেয় কোমলতায় এতটুকু দাগ পড়ে নাই।

গাড়ি লোহার মৃদঙ্গে তাল দিতে দিতে চলিল; আমি মনের মধ্যে গান শুনিতে শুনিতে চলিলাম। তাহার একটিমাত্র ধুয়া— 'গাড়িতে জায়গা আছে।' আছে কি, জায়গা আছে কি। জায়গা যে পাওয়া যায় না, কেউ যে কাকেও চেনে না। অথচ সেই না-চেনাটুকু যে কুয়াশামাত্র, সে যে মায়া, সেটা ছিন্ন হইলেই যে চেনার আর অন্ত নাই। ওগো সুধাময় সুর, যে হৃদয়ের অপরূপ রূপ তুমি সে কি আমার চিরকালের চেনা নয়। জায়গা আছে, —শীঘ্র আসিতে ডাকিয়াছ, শীঘ্রই আসিয়াছি, এক নিমেষও দেরি করি নাই।

রাত্রে ভালো করিয়া ঘুম হইল না। প্রায় প্রতি স্টেশনেই একবার করিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিলাম, ভয় হইতে লাগিল, যাহাকে দেখা হইল না সে পাছে রাত্রেই নামিয়া যায়।

পরদিন সকালে একটা বড়ো স্টেশনে গাড়ি বদল করিতে হইবে। আমাদের ফার্স্টক্লাসের টিকিট—মনে আশা ছিল, ভিড় হইবে না। নামিয়া দেখি, প্ল্যাটফর্মে সাহেবদের আর্দালি-দল আসবাবপত্র লইয়া গাড়ির জন্য অপেক্ষা করিতেছে। কোন্‌-এক ফৌজের বড়ো জেনারেল-সাহেব ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। দুই-তিন মিনিট পরেই গাড়ি আসিল। বুঝিলাম, ফার্স্টক্লাসের আশা ত্যাগ করিতে হইবে। মাকে লইয়া কোন গাড়িতে উঠি সে এক বিষম ভাবনায় পড়িলাম। সব গাড়িতে ভিড়। দ্বারে দ্বারে উঁকি মারিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। এমন সময় সেকেন্ড ক্লাসের গাড়ি হইতে একটি মেয়ে আমার মাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, 'আপনারা আমাদের গাড়িতে আসুন-না—এখানে জায়গা আছে?'

আমি তো চমকিয়া উঠিলাম। সেই আশ্চর্যমধুর কণ্ঠ এবং সেই গানেরই ধুয়া—'জায়গা আছে।' ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া মাকে লইয়া গাড়িতে উঠিয়া পড়িলাম। জিনিসপত্র তুলিবার প্রায় সময় ছিল না।

আমার মতো অক্ষম দুনিয়ায় নাই। সেই মেয়েটিই কুলিদের হাত হইতে তাড়াতাড়ি চল্‌তি গাড়িতে আমাদের বিছানাপত্র টানিয়া লইল। আমার একটা ফোটোগ্রাফ তুলিবার ক্যামেরা স্টেশনেই পড়িয়া রহিল—গ্রাহ্যই করিলাম না।

তার পরে— কী লিখিব জানি না। আমার মনের মধ্যে একটি অখণ্ড আনন্দের ছবি আছে, তাহাকে কোথায় শুরু করিব, কোথায় শেষ করিব? বসিয়া বসিয়া বাক্যের পর বাক্য যোজনা করিতে ইচ্ছা করে না।

এবার সেই সুরটিকে চোখে দেখিলাম। তখনো তাহাকে সুর বলিয়াই মনে হইল। মায়ের মুখের দিকে চাহিলাম; দেখিলাম তাঁর চোখে পলক পড়িতেছে না। মেয়েটির বয়স ষোলো কি সতেরো হইবে, কিন্তু নবযৌবন ইহার দেহে মনে কোথাও যেন একটুও ভার চাপাইয়া দেয় নাই। ইহার গতি সহজ, দীপ্তি নির্মল, সৌন্দর্যের শুচিতা অপূর্ব, ইহার কোনো জায়গায় কিছু জড়িমা নাই।

আমি দেখিতেছি, বিস্তারিত করিয়া কিছু বলা আমার পক্ষে অসম্ভব। এমনকি, সে যে কী রঙের কাপড় কেমন করিয়া পরিয়াছিল তাহাও ঠিক করিয়া বলিতে পারিব না। এটা খুব সত্য যে, তার বেশে ভূষায় এমন কিছুই ছিল না যেটা তাহাকে ছাড়াইয়া বিশেষ করিয়া চোখে পড়িতে পারে। সে নিজের চারি দিকে সকলের চেয়ে অধিক—রজনিগন্ধার শুভ্র মঞ্জরীর মতো সরল বৃন্তটির উপরে দাঁড়াইয়া, যে গাছে ফুটিয়াছে সে গাছকে সে একেবারে অতিক্রম করিয়া উঠিয়াছে। সঙ্গে দুটি-তিনটি ছোটো ছোটো মেয়ে ছিল, তাহাদিগকে লইয়া তাহার হাসি এবং কথার আর অন্ত ছিল না। আমি হাতে একখানা বই লইয়া সেদিকে কান পাতিয়া রাখিয়াছিলাম। যেটুকু কানে আসিতেছিল সে তো সমস্তই ছেলেমানুষদের সঙ্গে ছেলেমানুষি কথা। তাহার বিশেষত্ব এই যে, তাহার মধ্যে বয়সের তফাত কিছুমাত্র ছিল না— ছোটোদের সঙ্গে সে অনায়াসে এবং আনন্দে ছোটো হইয়া গিয়াছিল। সঙ্গে কতকগুলি ছবিওয়ালা ছেলেদের গল্পের বই—তাহারই কোন একটি বিশেষ গল্প শোনাইবার জন্য মেয়েরা তাহাকে ধরিয়া পড়িল। এ গল্প নিশ্চয় তারা বিশ-পঁচিশ বার শুনিয়াছে। মেয়েদের কেন যে এত আগ্রহ তাহা বুঝিলাম। সেই সুধাকণ্ঠের সোনার কাঠিতে সকল কথা যে সোনা হইয়া ওঠে। মেয়েটির সমস্ত শরীর মন যে একেবারে প্রাণে ভরা, তার সমস্ত চলায় বলায় স্পর্শে প্রাণ ঠিকরিয়া ওঠে। তাই মেয়েরা যখন তার মুখে গল্প শোনে তখন গল্প নয়, তাহাকেই শোনে; তাহাদের হৃদয়ের উপর প্রাণের ঝরনা ঝরিয়া পড়ে। তার সেই উদ্ভাসিত প্রাণ আমার সেদিনকার সমস্ত সূর্যকিরণকে সজীব করিয়া তুলিল; আমার মনে হইল, আমাকে যে-প্রকৃতি তাহার আকাশ দিয়া বেষ্টন করিয়াছে সে ওই তরুণীরই অক্লান্ত অম্লান প্রাণের বিশ্বব্যাপী বিস্তার।— পরের স্টেশনে পৌঁছাইতেই খাবারওয়ালাকে ডাকিয়া সে খুব খানিকটা চানা-মুঠ কিনিয়া লইল, এবং মেয়েদের সঙ্গে মিলিয়া নিতান্ত ছেলেমানুষের মতো করিয়া কলহাস্য করিতে করিতে অসংকোচে খাইতে লাগিল। আমার প্রকৃতি যে জাল দিয়া বেড়া—আমি কেন বেশ সহজে হাসিমুখে মেয়েটির কাছে এই চানা একমুঠা চাহিয়া লইতে পারিলাম না। হাত বাড়াইয়া দিয়া কেন আমার লোভ স্বীকার করিলাম না।

মা ভালো-লাগা এবং মন্দ-লাগার মধ্যে দোমনা হইয়া ছিলেন। গাড়িতে আমি পুরুষমানুষ, তবু ইহার কিছুমাত্র সংকোচ নাই, বিশেষত এমন লোভীর মতো খাইতেছে, সেটা ঠিক তাঁর পছন্দ হইতেছিল না; অথচ ইহাকে বেহায়া বলিয়াও তাঁর ভ্রম হয় নাই। তাঁর মনে হইল, এ মেয়ের বয়স হইয়াছে কিন্তু শিক্ষা হয় নাই। মা হঠাৎ কারও সঙ্গে আলাপ করিতে পারেন না। মানুষের সঙ্গে দূরে দূরে থাকাই তাঁর অভ্যাস। এই মেয়েটির পরিচয় লইতে তাঁর খুব ইচ্ছা, কিন্তু স্বাভাবিক বাধা কাটাইয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না।

গাড়ি ছাড়িবার অল্পকাল পূর্বে একজন দেশি রেলোয়ে কর্মচারী, নাম-লেখা দুইখানা টিকিট গাড়ির দুই বেঞ্চের শিওরের কাছে লটকাইয়া দিয়া আমাকে বলিল, 'এ গাড়ির এই দুই বেঞ্চ আগে হইতেই দুই সাহেব রিজার্ভ করিয়াছেন, আপনাদিগকে অন্য গাড়িতে যাইতে হইবে।'

আমি তো তাড়াতাড়ি ব্যস্ত হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিলাম। মেয়েটি হিন্দিতে বলিল , 'না, আমরা গাড়ি ছাড়িব না।'

সে লোকটি রোখ করিয়া বলিল, 'না ছাড়িয়া উপায় নেই।'

কিন্তু মেয়েটির চলিষ্ণুতার কোনো লক্ষণ না দেখিয়া সে নামিয়া গিয়া ইংরেজ স্টেশন-মাস্টারকে ডাকিয়া আনিল। সে আসিয়া আমাকে বলিল, 'আমি দুঃখিত, কিন্তু—'

শুনিয়া আমি 'কুলি কুলি' করিয়া ডাক ছাড়িতে লাগিলাম। মেয়েটি উঠিয়া দুই চক্ষে অগ্নিবর্ষণ করিয়া বলিল, 'না, আপনি যাইতে পারিবেন না, যেমন আছেন বসিয়া থাকুন।'

বলিয়া সে দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া স্টেশন-মাস্টারকে ইংরেজি ভাষায় বলিল, 'এ গাড়ি আগে হইতে রিজার্ভ করা, এ কথা মিথ্যা কথা।'

বলিয়া নাম-লেখা টিকিট খুলিয়া প্ল্যাটফমে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল।

ইতিমধ্যে আর্দালি-সমেত ইউনিফর্ম-পরা সাহেব দ্বারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। গাড়িতে সে তার আসবাব উঠাইবার জন্য আদালিকে প্রথমে ইশারা করিয়াছিল। তাহার পরে মেয়েটির মুখে তাকাইয়া, তার কথা শুনিয়া, ভাব দেখিয়া স্টেশন-মাস্টারকে একটু স্পর্শ করিল সে করিল এবং তাহাকে আড়ালে লইয়া গিয়া কী কথা হইল জানি না। দেখা গেল, গাড়ি ছাড়িবার সময় অতীত হইলেও আর একটা গাড়ি জুড়িয়া তবে ট্রেন ছাড়িল। মেয়েটি তার দলবল লইয়া আবার একপত্তন চানা-মুঠ খাইতে শুরু করিল, আর আমি লজ্জায় জানালার বাহিরে মুখ বাড়াইয়া প্রকৃতির শোভা দেখিতে লাগিলাম।

কানপুরে গাড়ি আসিয়া থামিল। মেয়েটি জিনিসপত্র বাঁধিয়া প্রস্তুত— স্টেশনে একটি হিন্দুস্থানি চাকর ছুটিয়া আসিয়া ইহাদিগকে নামাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিল।

মা তখন আর থাকিতে পারিলেন না। জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমার নাম কী, মা।'

মেয়েটি বলিল, 'আমার নাম কল্যাণী।

শুনিয়া মা এবং আমি দুজনেই চমকিয়া উঠিলাম।

'তোমার বাবা—'

'তিনি এখানকার ডাক্তার, তাঁর নাম শম্ভুনাথ সেন।'

তার পরেই সবাই নামিয়া গেল।

উপসংহার

মামার নিষেধ অমান্য করিয়া, মাতৃ-আজ্ঞা ঠেলিয়া, তার পরে আমি কানপুরে আসিয়াছি। কল্যাণীর বাপ এবং কল্যাণীর সঙ্গে দেখা হইয়াছে। হাত জোড় করিয়াছি, মাথা হেঁট করিয়াছি; শম্ভুনাথবাবুর হৃদয় গলিয়াছে। কল্যাণী বলে, 'আমি বিবাহ করিব না।'

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কেন'।

সে বলিল, 'মাতৃ-আজ্ঞা।'

কী সর্বনাশ! এ পক্ষেও মাতুল আছে নাকি।

তার পরে বুঝিলাম, মাতৃভূমি আছে। সেই বিবাহ-ভাঙার পর হইতে কল্যাণী মেয়েদের শিক্ষার ব্রত গ্রহণ করিয়াছে।

কিন্তু, আমি আশা ছাড়িতে পারিলাম না। সেই সুরটি যে আমার হৃদয়ের মধ্যে আজও বাজিতেছে— সে যেন কোন ওপারের বাঁশি — আমার সংসারের বাহির হইতে আসিল— সমস্ত সংসারের বাহিরে ডাক দিল। আর, সেই যে রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে আমার কানে আসিয়াছিল 'জায়গা আছে', সে যে আমার চিরজীবনের গানের ধুয়া হইয়া রহিল। তখন আমার বয়স ছিল তেইশ, এখন হইয়াছে সাতাশ। এখনো আশা ছাড়ি নাই, কিন্তু মাতুলকে ছাড়িয়াছি। নিতান্ত এক ছেলে বলিয়া মা আমাকে ছাড়িতে পারেন নাই।

তোমরা মনে করিতেছ, আমি বিবাহের আশা করি? না, কোনোকালে না। আমার মনে আছে, কেবল সেই একরাত্রির অজানা কণ্ঠের মধুর সুরের আশা — জায়গা আছে। নিশ্চয়ই আছে। নইলে দাঁড়াব কোথায়? তাই বৎসরের পর বৎসর যায়—আমি এইখানেই আছি। দেখা হয়, সেই কণ্ঠ শুনি, যখন সুবিধা পাই কিছু তার কাজ করিয়া দিই—আর মন বলে, এই তো জায়গা পাইয়াছি। ওগো অপরিচিতা, তোমার পরিচয়ের শেষ হইল না, শেষ হইবে না; কিন্তু ভাগ্য আমার ভালো, এই তো আমি জায়গা পাইয়াছি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) : জন্ম কলকাতার জোড়াসাঁকোয়। তিনি একাধারে কবি, ঔপন্যাসিক, গল্পকার, নাট্যকার, প্রাবন্ধিক ও গীতিকার। বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রধান রূপকারদের একজন। শিক্ষা বিষয়ে তাঁর বৈপ্লবিক চিন্তা জন্ম দিয়েছিল শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম বিদ্যালয়ের, যা পরে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ পায়। ১৯১৩ সালে তিনি সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান। অন্ধ গোঁড়ামির বিরোধিতা ও নতুন ভাবনাকে স্বাগত জানানো তাঁর লেখার বৈশিষ্ট্য। মাত্র ষোলো বছর বয়স থেকেই রবীন্দ্রনাথ *ভারতী*, *হিতবাদী*, *সাধনা* প্রভৃতি পত্রিকার জন্য ছোটোগল্প লিখতে শুরু করেন। শিলাইদহে (বর্তমানে বাংলাদেশে) জমিদারি পরিদর্শনকালে তিনি খুব কাছ থেকে গ্রামীণ বাংলা ও সাধারণ মানুষের জীবন পর্যবেক্ষণ করেন। গ্রামবাংলার সাধারণ জীবনের সেই অপরূপতা ফুটে উঠেছে তাঁর বিভিন্ন ছোটোগল্পে। তাঁর লেখা ছোটোগল্পগুলির মধ্যে রয়েছে *দেনাপাওনা*, *কাবুলিওয়ালা*, *গুপ্তধন*, *খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন*, *ক্ষুধিত পাষাণ*, *ছুটি*, *ল্যাবরেটরী*, *সুভা*, *নষ্টনীড়*, *অতিথি*, *খাতা*, *হৈমন্তী*, *বলাই*, *পোস্টমাস্টার*, *মধ্যবর্তিনী* প্রভৃতি। তাঁর রচিত ছোটোগল্পগুলি 'গল্পগুচ্ছ' সংকলনগ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

নাম নেই

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

দেখতে গিয়েছিলাম জঙ্গল, দেখে এলুম অন্য অনেক কিছু। সেই জঙ্গলে অনেক রকম ফুল ফুটেছিল, কত ফুলের নাম জানি না, কিন্তু সেখানকার কোনো বিশেষ ফুলের কথা আমার মনে নেই, মনে আছে শুধু একটি কিশোর বয়সি ছেলের মুখ।

ব্যাপারটা এখনো আমার কাছে রহস্যময় লাগে।

ছেলেটিকে আমি দেখেছিলাম বড়ো সুন্দর একটা পরিবেশে। এইসব দৃশ্য আমরা ছবিতে দেখি। কিংবা নিজেরা যখন এই দৃশ্যের মধ্যে উপস্থিত হই, তার চেয়েও বেশি ভালো লাগে যখন পরে সেই দৃশ্যটার কথা ভাবি।

খুব ঘন জঙ্গলের মধ্যে সেখানে জায়গাটা একটু ফাঁকা। চারদিকে ছোটো ছোটো পাহাড়, মাঝখানে খানিকটা ঢালু উপত্যকা, সেখানে একটা লাল রঙের নদী। 'সবুজ বন, রক্ত নদী', এ-রকম বলা যেতে পারতো, আসলে নদীটি একটি খুবই ছোটো ঝরনা। লাল রঙের মাটি ধুয়ে ধুয়ে আসে বলে জলের রং ঠিক রক্তবর্ণ নয়। অনেকটা গেরুয়া গেরুয়া।

দুপুরের ঝলমলে রোদ, অথচ গরম নেই। দু-দিন খুব টানা বৃষ্টির পর সেদিন রোদ উঠেছে, এইসব দিনে মন খুব ভালো লাগে।

আমরা নদীটা পেরিয়ে এবং একটা পাহাড় ডিঙিয়ে একটা মন্দির দেখতে গিয়েছিলাম। শুনেছিলাম, সেখানে নরবলি হয়। কথাটা শুনে অবশ্য আমরা খুবই অবিশ্বাস করেছিলাম। নরবলি ? এই যুগে ? হয়তো অতীতকালে কখনো হত। স্থানীয় দু-একজন লোককে জিজ্ঞেস করেছি। তারা হ্যাঁ-ও বলে না, না-ও বলে না। কেউ কেউ আকাশের দিকে মুখ তুলে বলেছে, কী জানি। এটা অবশ্য কোনো দূর-দুর্গম অঞ্চলের কাহিনি নয়, এই জায়গাটা মাত্র দেড়শো কি দুশো মাইল দূরে, মেদিনীপুরে।

মন্দিরটি জনশূন্য। খুবই ছোটোখাটো ব্যাপার, সামনে একটা কাঠগড়া, খুব সম্ভবত সেখানে পাঁঠা কিংবা মোষ বলি হয়। খানিকটা টাটকা রক্ত এখনো পড়ে আছে।

ফেরার পথে আমরা লাল রঙের ঝরনাটার পাশে একটু বসলুম। আমরা অর্থাৎ আমরা দুই বন্ধু এবং বাংলোর চৌকিদার। সে-ই আমাদের গাইড।

যাবার পথেও দেখেছিলুম যে ঝরনাটার পাশে কতকগুলি ছাগল চরছে, আর সেগুলিকে পাহারা দিচ্ছে একটি ছেলে। বছর দশ-এগারো বয়স। রাখাল গোরু চরায়, কিন্তু যে ছাগল চরায়, তাকেও কি রাখাল বলা যায় ?

পরনে একটা ইজের, খালি গা ছেলেটি ছপছপ করে ঝরনা পেরিয়ে এদিকে এসে একটু দূরে দাঁড়িয়ে কৌতূহলী চোখে আমাদের দিকে তাকিয়ে রইলো।

আমার বন্ধু বললে, ছেলেটির মুখখানা ভারি সুন্দর দেখতে না?

আমি হাতছানি দিয়ে ছেলেটিকে ডাকলুম।

ছেলেটি অপলকভাবে তাকিয়েই রইল, কোনো সাড়া দিল না। কাছেও এল না।

চৌকিদারকে বললুম, ওকে ডাকো তো!

চৌকিদার ধমকের ভঙ্গিতে একটা হাঁক দিল, তাতে ছেলেটির মুখে একটু হাসি ফুটলো শুধু, কিন্তু কোনো উত্তর পাওয়া গেল না।

ছেলেটি খুব গোঁয়ার। আমরা অনেকবার ডাকাডাকি করতেও সে গ্রাহ্যই করল না।

আমি চৌকিদারকে জিজ্ঞেস করলুম, তুমি চেনো ওকে?

চৌকিদার বলল, ও তো মহাদেব মাহাতোর ভাতুয়া।

তখনই জিজ্ঞেস করিনি, তবে ভাতুয়া কথাটার মানে পরে জেনেছিলাম।

আমি আবার ছেলেটিকে বললাম, এই, তোর নাম কী রে? তুই ডাকলে আসিস না কেন?

ছেলেটি তবু উত্তর দিল না। আমার বন্ধু বলল, আমরা শহরের লোক তো, তাই ও আমাদের দেখে ভয় পাচ্ছে।

চৌকিদারকে বললুম, ও আমাদের দেখে ভয় পাচ্ছে কেন? আমরা কি ওকে খেয়ে ফেলব? ওর নাম কী?

চৌকিদার বলল, স্যার ওর নাম নেই। ও বোবা, কথা বলতে পারে না, তাই ওর নাম কেউ দেয়নি। সবাই ছোঁড়া ছোঁড়া বলে। কেউ কেউ শুধু বোবা বলেই ডাকে।

আসবার সময় মনে হয়েছিল এই জঙ্গল খুব গহন, নিবিড়, নির্জন, আসলে জঙ্গলটি বেশ গভীর হলেও নির্জন নয়। ফাঁকে ফাঁকে অনেক মানুষজন বাস করে। কিছু কিছু চাষবাসও হয়। এই জঙ্গলে বাঘ নেই, তবে বাঘের চেয়ে অনেক বড়ো আকারের জানোয়ার আছে।

লাল রঙের ঝরনার পাশে ছাগল চরানো কিশোরটির সঙ্গে আমার একটু কথা বলার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু সে বোবা শুনে একটু মন খারাপ হয়ে গেল। বোবা বলেই বোধ হয় ও মানুষের কাছে আসে না।

আমরা যেই উঠে পড়লাম, অমনি ছেলেটি ঝরনা পেরিয়ে দৌড়ে পালিয়ে গেল। অনেক দূরে একটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে উঁকি মেরে দেখতে লাগল আমাদের। যেন ও লুকোচুরি খেলছে।

বাংলোয় ফিরে এলাম খিদের টানে।

সেদিনই সন্ধেবেলা বেশ কিছু লোকের উত্তেজিত গলার আওয়াজ পাওয়া গেল বাংলোর সামনে।

কিছু কিছু জঙ্গলের মানুষ জানতে এসেছে যে আমাদের কাছে বন্দুক আছে কিনা। আমরা জিপে করে এসেছি বলে ওরা আমাদের হোমরাচোমরা কেউ ভেবেছে। আমি জীবনে কখনো, খুব শখ থাকা সত্ত্বেও, বন্দুক ছুঁয়েই দেখিনি।

বন্দুক দরকার হাতি তাড়াবার জন্য।

প্রত্যেকবারই এইখানে একপাল হাতি আসে ফসল খাবার জন্য। এবছর খরা, তাই জমিতে এখনও ফসল বোনা হয়নি, সেইজন্য হাতিরা এসে ফসল নষ্ট করার সুযোগ না পেয়ে খেপে গেছে।

অন্য বছর টিন পিটিয়ে এবং মশাল ছুঁড়ে হাতির পালকে তাড়ানো হয়, এবছর তাতেও হাতিরা যাচ্ছে না। তারা তাদের খাদ্য পায়নি।

কাছাকাছি কোথাও হাতি এসেছে শুনে রোমাঞ্চ লাগে। শহুরে মানুষ জঙ্গলে এসে সত্যিকারের জংলি জানোয়ার দেখতে চায়।

আমরা তক্ষুনি উত্তেজিত হয়ে বেরিয়ে পড়তে যাচ্ছিলুম। কিন্তু চৌকিদার আমাদের উৎসাহে বাধা দিয়ে বললে, আজ আর রাত্তিরের দিকে যাবেন না, স্যার। সকালে যাবেন।

সে আমাদের কিছুতেই বেরুতে দেবে না সন্ধেবেলা। তার তো একটা দায়িত্ব আছে। বাংলোর সামনে কিছু লোক তখনও জটলা করছে। আমরা সেখান থেকে চলে গিয়ে বাংলোর পেছন দিকে একটা উঁচু জায়গায় দাঁড়ালুম। সেখান থেকে হাতি দেখা না গেলেও ওদের ডাক যদি অন্তত শোনা যায়।

কিছুই শোনা গেল না অবশ্য। খানিক বাদে ফিরে এলুম বাংলোয়। অন্য লোকেরাও চলে গেছে।

চৌকিদার বলল, একজনকে পাঠানো হয়েছে বাঁশপাহাড়িতে। থানায় খবর দেবার জন্য। গভর্নমেন্ট কোনো ব্যবস্থা না করলে হাতির উপদ্রবে অনেক ঘরবাড়ি এবার নষ্ট হবে। তিনটে হাতি এসেছে, কিছুতেই যাচ্ছে না।

আমি কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করলুম, এই রাত্তিরবেলা জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে একা একজন গেল? সাহস আছে তো লোকটার? কে গেল?

চৌকিদার বলল, ওই গুরু মুখিয়ার ভাতুয়া গনাই।

আমি বললুম, লোকটা অন্ধকারের মধ্যে একা একা গেল, যদি হাতির সামনে যায়? ওকে তো হাতিরা মেরে ফেলতে পারে!

চৌকিদার একথার কোনো উত্তর দিল না।

হাতির গল্প নয়, এটা ভাতুয়ার কাহিনি।

তখন আমি জিজ্ঞেস করলুম, বারবার ভাতুয়া ভাতুয়া শুনছি। ভাতুয়া মানে কী?

তখন আমাদের বোঝানো হল যে ভাতুয়া এক ধরনের ক্রীতদাস। শুধু ভাত খাওয়ার বিনিময়ে তারা কোনো বাড়িতে কাজ করে। খেতে পায় বলে তারা সবরকম কাজ করতে বাধ্য, এমনকী রাত্রে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে হেঁটে থানায় খবর দেওয়া পর্যন্ত।

এর পরের খবরটি আরও চমকপ্রদ।

সকালে যে ছাগল-চরানো কিশোরটিকে দেখেছিলুম, সে এই ভাতুয়ারই ছেলে।

ভাতুয়ার ছেলেও ভাতুয়া।

যে লোক শুধু ভাতের বিনিময়ে এক বাড়িতে জীবন বাঁধা দেয়, তারও স্ত্রী, পুত্র ইত্যাদি আছে? কীসের ভরসায় সংসার পাতে?

—এর ছেলে ভাতুয়া, আর ওর বউ?

—সে-ও আর এক বাড়িতে ভাতুয়া।

—ওদের কোনো নিজস্ব বাড়ি নেই।

— কী করে থাকবে, স্যার? ভাতুয়াদের চব্বিশ ঘণ্টা থাকতে হয়। ওই গনাইয়ের এক টুকরো জমি আর বাড়ি ছিল? মেয়ে বিয়ে দেবার সময় বিক্রি হয়ে গেছে।

আমি চুপ করে রইলুম। বাড়ি নেই, সংসার নেই, তবু একটা পরিবার আছে। মাঝে মাঝে দেখা হয় নিশ্চয়ই ওদের। তখন কী কথা হয়?

লাল রঙের ঝরনার পাশের সেই কিশোরটির কথা আমার মনে পড়তে লাগল বারবার। বোবা বলে তার একটা নামও দেওয়া হয়নি! এই পৃথিবীতে জন্মে একটা নামও কি তার প্রাপ্য নয়? বাড়িতে পোষা গোরু-ছাগল-কুকুরের একটা করে নাম থাকে। ওই ছেলেটির কোনো নাম নেই।

গাছের আড়াল থেকে সে উঁকি মেরে আমাদের দেখছিল। কী ভাবছিল, কে জানে?

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় (১৯৩৪-২০১২) : জন্ম বাংলাদেশের ফরিদপুরে। 'কৃত্তিবাস' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক। *আত্মপ্রকাশ* তাঁর লেখা প্রথম উপন্যাস, আর প্রথম কাব্যগ্রন্থ *একা এবং কয়েকজন*। কবি হিসেবে তাঁর খ্যাতি অসামান্য। ছোটোদের মহলেও সমান জনপ্রিয় তিনি। প্রথম কিশোর-উপন্যাস 'ভয়ংকর সুন্দর'। *নীললোহিত* ছদ্মনাম ছাড়াও *সনাতন পাঠক* ও *নীল উপাধ্যায়* নামে অনেক লেখা লিখেছেন। 'আনন্দ পুরস্কার', 'বঙ্কিম পুরস্কার', 'সাহিত্য আকাদেমি' ইত্যাদি নানা পুরস্কারে তিনি সম্মানিত। তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস *প্রথম আলো, সেই সময়, পূর্ব পশ্চিম, মনের মানুষ, অর্জুন, অরণ্যের দিনরাত্রি*। গ্রন্থ সংখ্যা দুশোর বেশি। তাঁর লেখাগুলি চলচ্চিত্রে, বেতারে ও টিভির পর্দায় রূপায়িত ও পৃথিবীর নানা ভাষায় অনূদিত।

সম্প্রদায়ের ভাষা

শঙ্খ ঘোষ

নতুন ক্লাসে উঠবার সময়ে রোল নম্বরটা একেবারে প্রথম দিকেই থাকবে কি না, এ নিয়ে একটা উৎকণ্ঠা থাকে না অনেকসময়ে? আমাদের সেটা থাকত না অবশ্য, কেননা জানতাম যে আমাদের রোল নম্বর সাজানো থাকবে নামের আদ্যক্ষর হিসেব করে, তার বর্ণানুক্রমে। বর্ণ মানে কিন্তু রোমান বর্ণ। তার মানে অরুণের পরে বিমল, বিমলের পরে চিন্ময়, চিন্ময়ের পরে দ্বিজেশ। এ বি সি ডি দিয়ে এইরকমই যে নির্ধারিত ক্রম, সবারই তা জানা।

কিন্তু ওরই মধ্যে কীভাবে এক বা দুই হয়ে যেত তরিকুল, সেটা আমরা বুঝতেই পারতাম না প্রথমে। তরিকুলের টি তো আসবে অনেক পরে? সে কী করে আগে চলে যায়? শেষ পর্যন্ত একদিন মীমাংসা হল এই রহস্যের। জানতে পারলাম যে তার পুরো নামটা না কী আবু সালে মহম্মদ তরিকুল আলম খান! কী কাণ্ড! এই রকম একটা লম্বা রেলগাড়ির মতো নাম কারও হয়? ভাবাই শক্ত। আঁটোসাঁটো করবার জন্য সংক্ষেপে লেখা হত এ. এস. এম. তরিকুল আলম খান। খ্যাপাবার জন্য আমরা বলতাম অ্যাসিস্ট্যান্ট স্টেশন মাস্টার।

ওদিকে দেখো, আনোয়ারের নাম থাকবে অনেক পরে। কেন? কেননা তার নাম তো শুরু হবে এম দিয়ে, এ দিয়ে তো নয়। লিখতে হবে মহম্মদ আনোয়ারুল ইসলাম। আনোয়ার, নুরুল, সাইদুর—সবারই নাম পর পর, কেননা সবারই নামের আগে আছে মহম্মদ।

এইসব জানতে জানতে এক ক্লাস থেকে অন্য ক্লাসে উঠতাম আমরা, দুই সম্প্রদায়ের ছেলেদের মধ্যে আপনাআপনি একই সম্পর্ক তৈরি হতে থাকত। হেডমাস্টারমশাইয়ের ইচ্ছে তাঁর বাড়ির ঠিক পাশেই বসত মিলাদশরিফের আসর, আবার সরস্বতী পুজোর ঘটায় তরিকুলরাও মিলে যেত সহজেই। আমাদের মাস্টারমশাই হোসেন সাহেব স্কুল ছেড়ে চলে যান যেদিন, তাঁর বিদায়সভায় সেদিন অঝোরে কেঁদে ভাসান নির্মলবাবু; ক্লাস নাইনে উঠতেই তরিকুলরা যখন বদলি হয়ে গেল ঢাকায়, আমাদের কারও কারও মনে হল গোটা ইস্কুলটাই হয়ে গেছে ফাঁকা।

কিন্তু এইরকমই যদি, এতই যদি মেলামেশা, এ দেশটা তবে ভাগ হয়ে গেল কেমনভাবে? এত অশান্তি হল কেন? ঠিকই, এই ছবিটাই নিশ্চয় একমাত্র ছবি নয়। এরই পাশে পাশে এর সঙ্গে ওর সঙ্গে বিদ্বেষ ঘনিয়ে তুলবার নানারকম আয়োজনে ভরে ছিল আমাদের ছেলেবেলাটা, 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান' আর 'বন্দে মাতরম্'— এই দুই বিবাদী ধ্বনিতে মুখর থাকত চারপাশটা, তরিকুলের সঙ্গে বিমলের বা আনোয়ারের সঙ্গে দ্বিজেশের শত্রুতা তৈরি করবার চেষ্টা হতে থাকত সবসময়েই।

হতে থাকত সেটা, কিন্তু সেদিনকার অনেক ছোটো ছোটো ইস্কুলে তাকে ঠেকাবার জন্য আয়োজনও হতে থাকত কিছু। আমাদেরও ছিল এরকম অনেক আয়োজন। তার মধ্যে একটা যেমন, ভাষাটা যে বিশেষ কোনো সম্প্রদায়ের ব্যাপার নয়, সেইটে ভালো করে বুঝিয়ে দেওয়া। কীভাবে বোঝা যাবে সেটা? এর জন্যে কি লম্বা-চওড়া বক্তৃতাই দরকার সবসময়ে? নানা কিছু নিয়ে বক্তৃতার ব্যবস্থা অবশ্য থাকতই বছর জুড়ে। স্কুলপ্রাঙ্গণে বারো মাসে তেরো পার্বণে হেডমাস্টারমশাই আমাদের সামনে নিয়ে আসতেন অনেকরকম গুণী মানুষকে, কতরকম উপলক্ষ্যে কতরকম কথা বলতেন তাঁরা। এইভাবেই আমাদের সেই মফস্‌সলি ইস্কুলে এসেছিলেন এস. ওয়াজেদ আলি, বিধুশেখর শাস্ত্রী, কাজি আবদুল ওদুদ, দেবপ্রসাদ ঘোষ বা শহীদুল্লাহ্‌র মতো মানুষেরা। কতটুকু-বা এঁদের বুঝতাম আমরা? আমরা শুধু বলতাম 'ওঃ! দেবপ্রসাদ ঘোষ? নখদর্পণে যাঁর অঙ্ক, সেই দেবপ্রসাদ?' কিংবা 'সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলেছে' র ওয়াজেদ আলি? নিজের চোখে দেখতে পাব তাঁকে? বেদ-উপনিষদের পণ্ডিত বিধুশেখর? ব্যাকরণের পণ্ডিত শহীদুল্লাহ্?'

শহীদুল্লাহ্ যে ভাষা আর ব্যাকরণের বিরাট পণ্ডিত, এই কথাটা ছাড়া আরও একটা কথা অবশ্য মুখে মুখে ছড়িয়ে গিয়েছিল সেদিন। হেডমাস্টারমশাই বলেছিলেন 'জানিস তো?' সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ফারসি জানেন খুব ভালো, শহীদুল্লাহ্‌র চেয়েও ভালো। আর শহীদুল্লাহ্ সংস্কৃত জানেন খুব ভালো, সুনীতিকুমারের চেয়েও অনেক ভালো।'

কী আশ্চর্য!

কিন্তু কেনই বা এত আশ্চর্যের? হেডমাস্টারমশাই জিজ্ঞেস করেন : 'আশ্চর্যের কী আছে এতে? তোরা কী ধরে নিয়েছিস যে মুসলমান হলে কেউ সংস্কৃত ভালো জানতে পারবেন না? হিন্দু হলে ফারসি?'

'পারেন জানতে?'

'কেন পারবেন না? ভাষাটাকে যে ভালো করে শিখবে, সেই তো তাকে ভালো করে জানবে? এর মধ্যে আর হিন্দু-মুসলমানের কী? ভাষা তো কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের জন্য গণ্ডিবাঁধা নয়! গোঁড়া লোক অনেক আছেন, তাঁরা আটকে রাখতে চান বটে, কিন্তু পারবেন কেন আটকাতে?'

'তাহলে আমাদের পণ্ডিতমশাই কেন সংস্কৃত পড়ান কেবল হিন্দু ছাত্রদের, আর মৌলবি সাহেবের কাছে যায় কেবল মুসলমান ছাত্রেরা?'

'ওরকমই যায় বটে, কিন্তু ও-নিয়মটা ভেঙে দেব আমরা। আমাদের এই স্কুলে অন্যরকম নিয়ম হবে। এখানে যার যেটা ইচ্ছে, সে সেটা পড়বে।'

শুনে বেশ একটা মজার বোধ হল আমাদের। আমাদের বন্ধুদের মধ্যে কারও কারও বদলেও গেল বিষয়। মৌলবি সাহেবের কাছে আরবি-ফারসি শিখতে যায় জিতেন আর আশিস, পণ্ডিতমশাইয়ের সংস্কৃত ক্লাসে গিয়ে বসে আনোয়ার।

কোনো বাধা কি আসে না তাতে? তা নয়, বাধা তো আসে, বাধা তো আছেই। ক্লাসের বাইরে জিতেনের সঙ্গে দেখা হলেই আঙুলে চাবির রিং ঘোরাতে ঘোরাতে পণ্ডিতমশাই বলেন : 'কী রে জিতু মিঞা, নামাজ পড়া শেষ হল?' আর অন্যদিকে স্কুলগেটের সামনে আনোয়ারকে ঠেসে ধরেন মৌলবিসাহেব, রক্তচোখে তাকান আর বলেন : 'হিঁদুয়ানি করার শখ হয়েছে?'

আনোয়ার অবশ্য চুপ করে থাকবার ছেলে নয়। সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয়, বলে: 'না'।

'না তো পণ্ডিতমশাইয়ের ক্লাসে যাস কেন? ছেড়ে দিবি সংস্কৃত।'

'না।'

'আবার 'না'? কেন 'না'?

'বাবা বলেছেন, ভালো করে বাংলা জানতে হলে সংস্কৃত শেখাটাই ভালো। আর তাছাড়া—তাছাড়া, শহীদুল্লাহ্ সাহেবও তো সংস্কৃতের পণ্ডিত।'

'বেতমিজ!'— বলে আনোয়ারের হাত ছেড়ে গেট পেরিয়ে চলে যান মৌলবি সাহেব।

এসব কথা পৌঁছয় এসে হেডমাস্টারমশাইয়ের কানে। ছেলেদের সাহস দিয়ে বলেন তিনি : 'ওসব হল রাগের কথা, ভয় পাস না তোরা।'

না, ভয় পায় না জিতেন বা আনোয়ার, শেষ পর্যন্ত তারা বজায় রাখে তাদের জেদ। কিন্তু ছোটো সেই ইস্কুলের বাইরে বড়ো পটভূমির মধ্যে তাদের এসব জেদের দাম থাকে না আর, দাম থাকে না হেডমাস্টারমশাইয়ের ভাবনারও।

কিন্তু একেবারেই কি থাকে না কোথাও দাম? দাঙ্গায় দাঙ্গায় ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায় সমাজ, রাজনীতির কূট খেলায় ভাগ হয়ে যায় দেশ, আনোয়ার বা নুরুলকে ছেড়ে অনেক দূরে চলে আসে অরুণ বা বিমল। শুধু হেডমাস্টারমশাই থেকে যান তাঁর ইস্কুলে আরও কিছুদিন ভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে একেবারে একা, কেননা ভালোবাসার ঘের দিয়ে তারা বেঁধে রেখেছে তাঁকে। বছরখানেক পরে তাঁর উদ্‌বেগকাতর আত্মীয়জনেরা যখন নিতান্ত জোর করেই নিয়ে আসে তাঁকে এপার-বাংলায়, ইস্কুলবাড়ি থেকে কয়েক মাইল দূরে ছেলেরা তাঁকে মিছিল করে পৌঁছে দেয় স্টেশনে, জলভরা চোখে নিজেদের হাত থেকে রক্ত নিয়ে তারা লিখে দেয় অভিমানভরা বিদায়বাণী। ভাষা বা মন যে বিশেষ কোনো সম্প্রদায়ের গণ্ডিবাঁধা নয়, আরও একবার সেটা বুঝিয়ে দেয় তারা।

শঙ্খ ঘোষ (১৯৩২) : অধুনা বাংলাদেশের চাঁদপুরে। আধুনিক বাংলাসাহিত্যের একজন প্রধান কবি, প্রাবন্ধিক, অধ্যাপক। পড়াশুনো প্রেসিডেন্সি কলেজ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধগ্রন্থের মধ্যে রয়েছে 'উর্বশীর হাসি', 'এ আমির আবরণ', 'এখন সব অলীক', 'এই শহরের রাখাল', 'ঐতিহ্যের বিস্তার', 'ওকাম্পোর রবীন্দ্রনাথ', 'কবির অভিপ্রায়', 'কালের মাত্রা ও রবীন্দ্র নাটক', 'ছন্দোময় জীবন', 'ভিন্ন রুচির অধিকার', 'ছন্দের বারান্দা' প্রভৃতি। 'কুন্তক' ছদ্মনামে লিখেছেন 'শব্দ নিয়ে খেলা' ও 'কথা নিয়ে খেলা'। তাঁর রচিত প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'দিনগুলি রাতগুলি'। অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ : 'নিহিত পাতাল ছায়া', 'বাবরের প্রার্থনা', 'পাঁজরে দাঁড়ের শব্দ', 'জলই পাষাণ হয়ে আছে', 'মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে', 'মূর্খ বড়ো, সামাজিক নয়', 'ধূম লেগেছে হৃৎ কমলে', 'গোটা দেশজোড়া জউঘর', 'প্রতি প্রশ্নে কেঁপে ওঠে ভিটে', 'হাসিখুশি মুখে সর্বনাশ' ইত্যাদি। ছোটোদের জন্য লিখেছেন— 'ছোট্ট একটা স্কুল', 'অল্পবয়স কল্পবয়স', 'সকালবেলার আলো', 'সুপুরিবনের সারি', 'শহর পথের ধুলো' ইত্যাদি। তাঁর প্রাপ্ত নানা পুরস্কারের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার, রবীন্দ্র পুরস্কার, কবীর সম্মান, সরস্বতী সম্মান এবং পদ্মভূষণ।

কবিতা

কান্ডারি হুঁশিয়ার!

কাজী নজরুল ইসলাম

দুর্গম গিরি, কান্তার, মরু, দুস্তর পারাবার
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে, যাত্রীরা হুঁশিয়ার!
দুলিতেছে তরি, ফুলিতেছে জল, ভুলিতেছে মাঝি পথ,
ছিঁড়িয়াছে পাল, কে ধরিবে হাল, আছে কার হিম্মত?
কে আছ জোয়ান হও আগুয়ান হাঁকিছে ভবিষ্যৎ।
এ তুফান ভারী, দিতে হবে পাড়ি, নিতে হবে তরি পার।।

তিমির রাত্রি, মাতৃমন্ত্রী সান্ত্রিরা সাবধান!
যুগ-যুগান্ত সঞ্চিত ব্যথা ঘোষিয়াছে অভিযান।
ফেনাইয়া উঠে বঞ্চিত বুকে পুঞ্জিত অভিমান,
ইহাদেরে পথে নিতে হবে সাথে, দিতে হবে অধিকার।।
অসহায় জাতি মরিছে ডুবিয়া, জানে না সন্তরণ,
কান্ডারি! আজি দেখিব তোমার মাতৃমুক্তি পণ।
'হিন্দু না ওরা মুসলিম?' ওই জিজ্ঞাসে কোন জন?
কান্ডারি! বলো ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মা-র!
গিরি-সংকট, ভীরু যাত্রীরা, গুরু গরজায় বাজ,
পশ্চাৎ-পথযাত্রীর মনে সন্দেহ জাগে আজ!
কান্ডারি! তুমি ভুলিবে কি পথ? ত্যজিবে কি পথ-মাঝ?

করে হানাহানি, তবু চলো টানি, নিয়াছ যে মহাভার!
কান্ডারি! তব সম্মুখে ওই পলাশির প্রান্তর,
বাঙালির খুনে লাল হল যেথা ক্লাইভের খঞ্জর!
ওই গঙ্গায় ডুবিয়াছে হায়, ভারতের দিবাকর।
উদিবে সে রবি আমাদেরই খুনে রাঙিয়া পুনর্বার।

ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয়গান,
আসি অলক্ষে দাঁড়ায়েছে তারা, দিবে কোন বলিদান?
আজি পরীক্ষা জাতির অথবা জাতের করিবে ত্রাণ?
দুলিতেছে তরি, ফুলিতেছে জল, কান্ডারি হুঁশিয়ার!

কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯—১৯৭৬) : বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার জামুরিয়া থানার অন্তর্গত চুরুলিয়া গ্রামে জন্ম। ১৩২৬ বঙ্গাব্দে 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য' নামক পত্রিকায় তাঁর প্রথম কবিতা *মুক্তি* প্রকাশিত হয়। ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে 'সাপ্তাহিক বিজলী' পত্রিকার ৬ জানুয়ারি সংখ্যায় *বিদ্রোহী* কবিতা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র বাংলায় অভূতপূর্ব আলোড়ন সৃষ্টি হয়। এবছরই তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থ 'ব্যথার দান' এবং প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'অগ্নিবীণা' প্রকাশিত হয়। কবি তাঁর কবিতায় কেবল ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ নয়, সমস্ত অন্যায় অবিচার ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন। তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে রয়েছে *অগ্নিবীণা*, *চক্রবাক*, *চিত্তনামা*, *ছায়ানট*, *জিঞ্জীর*, *ঝড়*, *দোলনচাঁপা*, *নতুন চাঁদ*, *নির্ঝর*, *পুবের হাওয়া*, *প্রলয়শিখা*, *ফণীমনসা*, *বিষের বাঁশি*, *সর্বহারা*, *সাম্যবাদী* প্রভৃতি। 'সঞ্চিতা' তাঁর কবিতার এক অসামান্য সংকলন। *সওগাত*, *মোসলেম ভারত*, *নবযুগ*, *ধূমকেতু*, *লাঙল* প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর বহু প্রবন্ধ, কবিতা, গল্প প্রকাশিত হয়। বাংলা গানের ক্ষেত্রেও তাঁর অবদান অপরিসীম।

কাজ

অন্নদাশংকর রায়

সকলের কাজ আছে জগতে
আছে কাজ পোকা আর মাকড়ের
গাছপালা লতা আর পাতাদের
কাজ আছে শিকড়ের বাকড়ের।

প্রকৃতির সংসারে কোথাও
কেউ কি দেখেছে কোনো বেকারি
আর কোনো প্রাণীদের নয় তা
বেকারিটা মানুষের একারি।

কত শত কাজ আছে করবার
কত শত কর্মীর জন্য
কর্ম না করে কেউ খাবে না
অপরের অর্জিত অন্ন।

তোমরা নতুন যারা এসেছ
তোমরা করবে এর প্রতিকার
অকর্মা যেন কেউ না থাকে
কর্মেতে সকলেরি অধিকার।

এটাও মানতে হবে সবাকে
কর্মের সাথে আছে ঘর্ম
শ্রম থেকে নাই কারো নিস্তার
শ্রম জীবজগতের ধর্ম।

অন্নদাশঙ্কর রায় (১৯০৪—২০০২) : জন্ম ওড়িশার ঢেঙ্কানলে। প্রথম জীবনে ওড়িয়া ভাষায় সাহিত্য রচনা করলেও পরবর্তী জীবনে বাংলাভাষায় বহু মননসমৃদ্ধ উপন্যাস, গল্প, প্রবন্ধ ও ভ্রমণকাহিনি রচনা করে প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ *তারুণ্য*। তাঁর লেখা অন্যান্য বিখ্যাত গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে *পথে প্রবাসে*, *সত্যাসত্য*, *যার যেথা দেশ* প্রভৃতি। তাঁর লেখা *উড়কি ধানের মুড়কি*, *রাঙা ধানের খই* প্রভৃতি ছড়ার বই ছোটোদের কাছে অত্যন্ত প্রিয়। *দোল দোল দুলুনি*, *বিনুর বই*, *বিন্নি ধানের খই*, *রাঙা ঘোড়ার সওয়ার*, *সাত ভাই চম্পা*, *হট্টমালার দেশে* ইত্যাদি তাঁর অন্যান্য বিখ্যাত রচনা। অন্নদাশংকর রায় *লীলাময় রায়* ছদ্মনামেও বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন।

মেয়েটা

নবনীতা দেবসেন

দুঃখ তাকে তাড়া করেছিল
মেয়েটা ছুটতে, ছুটতে, ছুটতে
কী আর করে? হাতের চিরুনিটাই
ছুড়ে মারল দুঃখকে —

আর অমনি চিরুনির
একশো দাঁত থেকে
গজিয়ে উঠল হাজার হাজার বৃক্ষ
শ্বাপদসংকুল সঘন অরণ্য, বাঘের ডাকে,
ছম্ ছম্ অন্ধকারে,
কোথায় হারিয়ে গেল
দুঃখ —

ভয় তাড়া করেছিল তাকে
মেয়েটা, ছুটতে, ছুটতে, ছুটতে
কী করে? মুঠোর ছোট্ট আতরের শিশিটাই
ছুঁড়ে মারল ভয়কে —

আর অমনি সেই আতর ফুঁসে উঠল
ফেঁপে উঠল ফেনিল ঘূর্ণিতে, প্রখর কলরোলে
যোজন যোজন ব্যেপে হিংস্র গেরুয়া স্রোতের
তোড়ে কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে গেল
ভয়কে —

প্রেম যেদিন ওকে তাড়া করল
মেয়েটার হাতে কিছুই ছিল না
ছুটতে, ছুটতে, ছুটতে, কী করে?
শেষে বুক থেকে উপড়ে নিয়ে হৃদয়টাকেই

ছুঁড়ে দিল প্রেমের দিকে,
আর অমনি
শ্যামল এক শৈলশ্রেণি হয়ে মাথা তুলল
সেই একমুঠো হৃদয়
ঝরনায়, গুহায়, চড়াইতে, উতরাইতে
রহস্যময়
তার খাদে, তার উপত্যকায়
প্রতিধ্বনি কাঁপছে
ঝোড়ো বাতাসের জলপ্রপাতের —

তার ঢালুতে ছায়া, আর
চুড়োতে ঝল্সাচ্ছেন
চাঁদ সূয্যি
সেই ঝলমলে, ভরভর্তি হৃদয়টাই
বুঝি এগোতে দিলে না
তার প্রেমিকের ভীতু
প্রেমকে,
আহা
এবার ওকে তাড়া করেছে ক্লান্তি
হাত খালি, বুক খালি,
ছুটতে, ছুটতে, ছুটতে, কী করে?
এবার মেয়েটা পিছন দিকে
ছুঁড়ে মারল শুধু দীর্ঘশ্বাস —

আর অমনি
সেই নিশ্বাসের হলকায় ফস্ করে
জ্বলে উঠল তার তার সমস্ত অতীত
দশদিশিতে দাউ দাউ ছড়িয়ে পড়ল
উড়ন্ত পুড়ন্ত বালির মরুভূমি
এখন মেয়েটা নিশ্চিন্ত হয়ে ছুটছে,
দুই হাত মাথার ওপরে তোলা —

যাক
এবার তাকে তাড়া করেছে, তার
গন্তব্যটাই।

নবনীতা দেবসেন (১৯৩৮) : কবি নরেন্দ্র দেব এবং সুলেখিকা শ্রীমতী রাধারাণী দেবীর কন্যা। কবিতা, গদ্য, ভ্রমণকাহিনি—সাহিত্যের নানা শাখায় তাঁর অবাধ বিচরণ। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপিকা ছিলেন। তাঁর প্রথম প্রকাশিত বই ‘প্রথম প্রত্যয়’। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য বইগুলির মধ্যে রয়েছে— ‘স্বাগত দেবদূত’, ‘আমি, অনুপম’, ‘নটী নবনীতা’, ‘খগেনবাবুর পৃথিবী’, ‘গল্পগুজব’, ‘মঁসিয়ে হুলোর হলিডে’, ‘সমুদ্রের সন্ন্যাসিনী’, ‘ট্রাকবাহনে ম্যাকমোহনে’, ‘হে পূর্ণ তব চরণের কাছে’, ‘করুণা তোমার কোন পথ দিয়ে’, ‘স্বপ্ন কেনার সওদাগর’, ‘শব্দ পড়ে টাপুরটুপুর’, ‘শীত সাহসিক হেমন্তলোক’, ‘নাট্যারম্ভ’, ‘নব-নীতা’ প্রভৃতি। কৌতুকপ্রবণতা এবং অন্তরঙ্গ রচনাভঙ্গি তাঁর রচনার বৈশিষ্ট্য। বাংলা সাহিত্যে অসামান্য অবদানের জন্য তিনি ‘সাহিত্য অকাদেমি’ পুরস্কার এবং শিশু সাহিত্যে ‘বিদ্যাসাগর পুরস্কার’ পেয়েছেন।

নাটক

সূক্ষ্মবিচার

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

চণ্ডীচরণ ও কেবলরাম

কেবলরাম। মশায়, ভালো আছেন?

চণ্ডীচরণ। 'ভালো আছেন' মানে কী?

কেবলরাম। অর্থাৎ সুস্থ আছেন?

চণ্ডীচরণ। স্বাস্থ্য কাকে বলে?

কেবলরাম। আমি জিজ্ঞাসা করছিলেম, মশায়ের শরীর-গতিক —

চণ্ডীচরণ। তবে তাই বলো। আমার শরীর কেমন আছে জানতে চাও। তবে কেন জিজ্ঞাসা করছিলে আমি কেমন আছি? আমি কেমন আছি আর আমার শরীর কেমন আছে কি একই হল? আমি কে, আগে সেই বলো।

কেবলরাম। আজ্ঞে, আপনি তো চণ্ডীচরণবাবু।

চণ্ডীচরণ। সে বিষয়ে গুরুতর তর্ক উঠতে পারে।

কেবলরাম। তর্ক কেন উঠবে! আপনি বরঞ্চ আপনার পিতাঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করবেন।

চণ্ডীচরণ। নাম জিনিসটা কী? নাম কাকে বলে?

কেবলরাম।(বহু চিন্তার পর) নাম হচ্ছে মানুষের পরিচয়ের —

চণ্ডীচরণ। নাম কি কেবল মানুষেরই আছে, অন্য প্রাণীর নেই?

কেবলরাম। ঠিক কথা। মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণীর —

চণ্ডীচরণ। কেবল মানুষ ও প্রাণী ছাড়া আর কিছুর নাম নেই? তবে বস্তু চেনার কী উপায়?

কেবলরাম। ঠিক বটে। মানুষ, প্রাণী এবং বস্তু —

চণ্ডীচরণ। শব্দ স্বাদ বর্ণ প্রভৃতি অবস্তুর কি নাম নেই?

কেবলরাম। তাও বটে। মানুষ, প্রাণী, বস্তু এবং শব্দ, স্বাদ, বর্ণ প্রভৃতি অবস্তু —

চণ্ডীচরণ। এবং

কেবলরাম। আবার এবং!

চণ্ডীচরণ। এবং আমাদের মনোবৃত্তি ও হৃদয়বৃত্তির —

কেবলরাম। এবং আমাদের মনোবৃত্তি ও হৃদয়বৃত্তির —

চণ্ডীচরণ। এবং অন্তর ও বাহিরের যাবতীয় পরিবর্তনের ও ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার —

কেবলরাম। যাবতীয় পরিবর্তনের এবং ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার —

চণ্ডীচরণ। এবং —

কেবলরাম।(কাতরভাবে) এবং না বলে এইখানে একটা ইত্যাদি লাগানো যাক-না।

চণ্ডীচরণ। আচ্ছা বেশ। এখন সমস্তটা কী হল বলো তো। কথাটা পরিষ্কার হয়ে যাক।

কেবলরাম।(মাথা চুলকাইয়া) পরিষ্কার হবে কী না বলতে পারি নে, চেষ্টা করি। নাম হচ্ছে মানুষের এবং অবস্থার, না না — বস্তু এবং অবস্তুর, এবং বাহিরের ও অন্তরের যাবতীয় হৃদয়বৃত্তির, না মনোবৃত্তির, না না — যাবতীয় ভিন্ন ভিন্ন কিংবা পরিবর্তন ও অবস্থার ভিন্ন ভিন্ন যাবতীয় — এ তো মুশকিল হল! কিছুতেই গুছিয়ে উঠতে পারছি নে। এক কথায় নাম হচ্ছে মানুষের এবং প্রাণীর এবং — দূর হোক গে, মানুষের, প্রাণীর এবং ইত্যাদির পরিচয়ের উপায়।

চণ্ডীচরণ। এ সম্বন্ধে তর্ক আছে। পরিচয় কাকে বলে!

কেবলরাম। (জোড়হস্তে) আমি কাউকেই বলি নে। মশায়ই বলুন।

চণ্ডীচরণ। ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের প্রভেদ অবগত হয়ে তাদের স্বতন্ত্র করে জানা। এই ঠিক তো!

কেবলরাম। এ ছাড়া আর তো কিছু হতেই পারে না।

চণ্ডীচরণ। তা হলে তুমি অস্বীকার করছ না?

কেবলরাম। আজ্ঞে না।

চণ্ডীচরণ। যদিই অস্বীকার কর তা হলে এ সম্বন্ধে গুটিকতক তর্ক আছে।

কেবলরাম। না না, আমি কিছুমাত্র অস্বীকার করছি নে।

চণ্ডীচরণ। মনে কর, যদিই কর।

কেবলরাম।(ভীতভাবে), আজ্ঞে না, মনেও করতে পারি নে।

চণ্ডীচরণ। তুমি না কর, যদি আর কেউ করে।

কেবলরাম। কারো সাধ্য নেই যে করে। এতবড়ো দুঃসাহসিক কে আছে!

চণ্ডীচরণ। আচ্ছা বেশ, এটা যেন স্বীকারই করলে; তার পরে — নামই যদি পরিচয়ের একমাত্র উপায় হবে তবে কি আমার চেহারা পরিচয়ের উপায় নয়? আর আমার অন্যান্য লক্ষণগুলো—

কেবলরাম। আজ সম্পূর্ণ বুঝেছি নাম কাকে বলে তার নামগন্ধ ও জানি নে, আপনিই বলে দিন।

চণ্ডীচরণ। ভাষার দ্বারা স্বতন্ত্র পদার্থের স্বাতন্ত্র্য নির্দিষ্ট করবার একটি কৃত্রিম উপায়কে বলে নামকরণ — যদি অস্বীকার কর —

কেবলরাম। না, আমি অস্বীকার করি নে —

চণ্ডীচরণ। কেবল তর্কের অনুরোধেও যদি অস্বীকার কর —

কেবলরাম। তর্কের অনুরোধে কেন, বাবার অনুরোধেও অস্বীকার করতে পারি নে।

চণ্ডীচরণ। এর কোনো একটা অংশও যদি অস্বীকার কর।

কেবলরাম। একটি অক্ষরও অস্বীকার করতে পারি নে।

চণ্ডীচরণ। এই মনে করো, 'কৃত্রিম' কথাটা সম্বন্ধে নানা তর্ক উঠতে পারে।

কেবলরাম। ঠিক তার উল্টো, ওই কথাতেই সকল তর্ক দূর হয়ে যায়।

চণ্ডীচরণ। আচ্ছা, তাই যদি হল মীমাংসা করা যাক আমার নাম কী।

কেবলরাম। (হতাশভাবে) মীমাংসা আপনিই করুন, আমার খিদে পেয়েছে।

চণ্ডীচরণ। নাম আমার সহস্র আছে, কোন্‌টা তুমি শুনতে চাও?

কেবলরাম। যেটা আপনি সবচেয়ে পছন্দ করেন।

চণ্ডীচরণ। প্রথমে বিচার করতে হবে কীসের সঙ্গে আমার প্রভেদ জানতে চাও — যদি পশুর সঙ্গে আমার প্রভেদ নির্দেশ করতে চাও —

কেবলরাম। আজ্ঞে, তা চাই নে —

চণ্ডীচরণ। তা হলে আমার নাম মানুষ। যদি শ্বেত পীত পদার্থের সঙ্গে আমার প্রভেদ জানতে চাও তবে আমার নাম —

কেবলরাম। কালো।

চণ্ডীচরণ। শ্যামল। যদি ছেলের সঙ্গে প্রভেদ জানতে চাও তবে আমার নাম —

কেবলরাম। বুড়ো।

চণ্ডীচরণ। মধ্যবয়সি।

কেবলরাম। তবে চণ্ডীচরণ কার নাম মশায়?

চণ্ডীচরণ। একটি মনুষ্যের মধ্যে, একটি উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ মনুষ্য বিশেষের মধ্যে, একটি পূর্ণপরিণত মনুষ্যের মধ্যে, তার জন্মকাল হতে আজ পর্যন্ত যে সকল পরিবর্তন অহরহ সংঘটিত হচ্ছে এবং মৃত্যুকাল পর্যন্ত হবার সম্ভাবনা আছে, সেই পরিবর্তন ও পরিবর্তন সম্ভাবনার কেন্দ্রস্থলে যে একটি সজ্ঞান ঐক্য বিরাজ করছে, তাকেই একদল লোক অর্থাৎ সেই লোকদের সজ্ঞান ঐক্য চণ্ডীচরণ নামে নির্দেশ করে।

কেবলরাম। সর্বনাশ! মশায় বেলা হল। অত্যন্ত ক্ষুধানুভব হয়েছে, আহারও প্রস্তুত, এবার তবে —

চণ্ডীচরণ। (হাত চাপিয়ে ধরিয়া) রোসো — আসল কথাটার কিছুই মীমাংসা হয়নি। সবে আমরা তার ভূমিকা করেছি মাত্র। তুমি জিজ্ঞাসা করছিলে আমি ভালো আছি কি না; এখন প্রশ্ন এই, তুমি কী জানতে চাও। আমার অন্তর্গত প্রাণী কেমন আছে জানতে চাও, না মনুষ্য কেমন আছে জানতে চাও—

কেবলরাম। গোড়ায় কী জানতে চেয়েছিলুম তা বলা ভারি শক্ত। কিন্তু আপনার সঙ্গে এতক্ষণ কথা কয়ে এখন অনুমান হচ্ছে আপনার সজ্ঞান ঐক্য কেমন আছেন এইটে জানাই অজ্ঞান আমার অভিপ্রায় ছিল।

চণ্ডীচরণ। অত্যন্ত কঠিন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলে।

কেবলরাম। তা হলে মাপ করবেন —অপরাধ করেছি, এখন অনুতাপে এবং পেটের জ্বালায় দগ্ধ হচ্ছি। আহারের পূর্বে এরকম প্রশ্ন আমি আর কখনো আপনাকে জিজ্ঞাসা করব না।

চণ্ডীচরণ। (কর্ণপাত না করিয়া) আমি ভালো আছি কি না জিজ্ঞাসা করলে প্রথমে দেখা আবশ্যক ভালোমন্দ কাকে বলে। তার পরে স্থির করতে হবে আমার সম্বন্ধে ভালোই বা কী আর মন্দই বা কী। তার পরে দেখতে হবে বর্তমানে যা ভালো তা —

কেবলরাম। মশায়, আপনার পায়ে ধরছি এখনকার মতো ছুটি দিন। বরং 'আপনি কেমন আছেন' এই অত্যন্ত কঠিন প্রশ্নের উত্তর আপনি কবে দিতে পারবেন একটা দিন স্থির করে দিন — আমি যে নিতান্ত ব্যস্ত হয়েছি তা নয় — না হয় উত্তর পেতে কিছুদিন দেরিই হবে, না হয় উত্তর নাই পাওয়া গেল। কিন্তু আজ আমার অপরাধ ক্ষমা করুন, ভবিষ্যতে আমি সর্তক হব।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১—১৯৪১) : জন্ম কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে। ঠাকুরবাড়ি থেকে প্রকাশিত *ভারতী* ও *বালক* পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন। সংগীত, নাট্যচর্চার ঐতিহ্য ও আবহে তিনি আশৈশব লালিত হয়েছেন। দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বিভিন্ন নাটকের প্রয়োজনে তিনি কিশোর বয়স থেকেই সংগীত রচনা, সুরারোপ এবং অভিনয় করেছেন। পরবর্তীকালে তাঁর লেখা নাটকগুলিতেও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছে গান। তাঁর নাটকগুলির মধ্যে রয়েছে *রাজা, ডাকঘর, ফাল্গুনী, মুক্তধারা, রক্তকরবী, কালের যাত্রা, তাসের দেশ প্রভৃতি*। দীর্ঘ জীবনে তিনি প্রচুর কবিতা, গান, ছোটোগল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ লিখেছেন, ছবি এঁকেছেন। এশিয়ার মধ্যে তিনিই প্রথম *নোবেল* পুরস্কার পান ১৯১৩ সালে *Song Offerings* কাব্যগ্রন্থের জন্যে। তাঁর রচিত গান; দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র— ভারত আর বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত হিসেবে গৃহীত হয়েছে।

কাকচরিত্র

মনোজ মিত্র

(বাইরে একটা কাক ডাকছে। ব্যোমকেশের অবশ্য সেদিকে খেয়াল নেই—নাটক লেখায় এমনি সে ডুবে রয়েছে। রীতিমতো অ্যাকটিং করতে করতে লিখছে ব্যোমকেশ... নিঃশব্দে এক একটি সংলাপ ভেঁজে নেবার সঙ্গে হাত ছুঁড়ছে, মাথা ঝাঁকাচ্ছে, চিবুক নাচাচ্ছে। কখনো মুখখানা কাঁদো-কাঁদো, এই আবার হাসি-হাসি। আপাতত ঠেকে গেছে ব্যোমকেশ ওই হাসি নিয়ে। নায়কের মুখে হাসি বসাতে হবে... কিন্তু হাসিটা হো-হো না হি হি হবে কিছুতে স্থির করে উঠতে পারছে না। পালা করে হো-হো, হা-হা, হি-হি, চেখে চেখে দেখছে... বাইরে কাকটা থেকে থেকে ডেকে উঠেছে কা-কা। শেষ পর্যন্ত সেই অরসিক কাক তার একনিষ্ঠ সাধনায় ব্যোমকেশের কলম কাঁপিয়ে ছাড়ল।)

ব্যোমকেশ। হুস! হুস! যা! হাট হাট! হুসস....হুসস....

(কাকটা থেমেছে। ব্যোমকেশ কাজে মন দিতে আবার আচমকা ডেকে উঠল। ব্যোমকেশ জানালার দিকে ঘুরে বসে। কপালের ওপর চশমা তুলে পরিশ্রান্ত ঘোলাটে চোখে বাইরে তাকিয়ে বলে—)

এই যে, আমার এই গাছটি ছাড়া কি তোমার আর জায়গা নেই? (কাকটা ডাকল) রোজ আমার পেছনে লাগা তোমার চাই-ই চাই? (কাকটা ডাকল) কেন—এই দুপুরবেলাটা কি বন্ধ রাখা যায় না, তোমার গলাসাধা? (কাক সাড়া দিল কা-কা) বাঃ কী একাগ্র সাধনা! শোনো, ওই নিমগাছটি শিগ্‌গিরই আমি কেটে ফেলব। তোমার বাসাটি ভাঙব। হুঁ। বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে রেফিউজি হয়ে ফর্সা আকাশে তখন লাট খেয়ে বেড়াতে হবে। (নেপথ্যে কাকটা ভীষণ চেঁচামেচি শুরু করল। ব্যোমকেশের ধৈর্য লুপ্ত হল) খুন করে ফেলব শালা! মার শালাকে... মার... মার...

(ক্ষিপ্ত ব্যোমকেশ ছেড়াঁ কাগজের পিণ্ড পাকিয়ে জানালার বাইরে ছুঁড়তে লাগল। কাকের ডাক চতুর্গুণ বাড়ল। ব্যোমকেশ দুহাতে কান চেপে বসে পড়ল।)

থাম থাম ওরে বাবা... (দু'হাত জোড় করে) থাক যদ্দিন খুশি... থাক বাবা... গাছ কাটব না... ছেলেপুলে নাতিপুতি গুষ্টি নিয়ে সংসার কর বাবা... কিছু বলব না... শুধু আমায় একটু লিখতে দে!... দে না মাইরি... এই, এই নাটকটা আজ আমায় শেষ করতেই হবে! হ্যাঁরে, ডিরেকটার ছোকরা তাগাদার পর তাগাদা মারছে... আমি মাসের পর মাস ঘোরাচ্ছি!... আলটিমেটাম দিয়ে গেছে আজ স্ক্রিপ্ট না পেলে, দলের ছেলেদের দিয়ে আমার কুশপুত্তলি দাহ করবে! (কাক ডাকল) বিশ্বাস হচ্ছে না? তা হবে কি করে! তুমি তো শালা জানো না, বাংলা থিয়েটারের নাটকের কী ক্যানট্যাংকারাস্ অবস্থা!... মৌলিক নাটক... অরিজিন্যাল প্লে... বছরে দেড়খানাও পয়দা হয় না!...

পুরো ফ্যামেলি প্ল্যানিং! আর তুমি শালা বায়সপুঙ্গব... আমায় লিখতে দিচ্ছ না... একটা সৎ প্রচেষ্টায় বাগড়া মারছ! হাজার হাজার থিয়েটার গোষ্ঠীর অভিশাপ খাবি রে শালা...

(টেলিফোন বেজে উঠল। ব্যোমকেশ ফোন তোলে।)

কে?... বলছি। হ্যাঁ ভাই দেব... এই দিচ্ছি... আজই দিচ্ছি! না-না এক্ষুনি এসো না... এখনো ডেলিভারি দেবার মতো হয়নি! কেন নাও শোনো... (রিসিভারটা শূন্যে ধরল, বাইরে কাকটাও ডেকে উঠল) বুঝতে পারছ, কেন? হ্যাঁ ভাই কাক! লেম্ একস্কিউজ? কী বলছ! এইরকম হারামজাদা কাক যদি ডজন দুচ্চার এককাট্টা হয়, গীতাঞ্জলি এক্সপ্রেসও থামিয়ে দিতে পারে।... আরো ঘণ্টাকয়েক লাগবে!... এখন যত তাড়াতাড়ি তুমি ছাড়বে!... রোখো... রোখো... হো-হো... হা-হা... হি-হি... কোনটা পছন্দ? আরে হাসি হাসি। হো-হো... হা-হা... হি-হি... কোন হাসিটা পেলে তোমাদের অভিনয় করতে সুবিধে হবে। হ্যা-হ্যা-হ্যা! ও কে... ও কে... ছাড়ো... (ফোন নামাতে গিয়ে, আবার কানে তুলে) কটা হ্যা? হ্যা-হ্য, কটা হ্যা চাই... হ্যা হ্যা না হ্যা-হ্যা-হ্যা... নাকি হ্যা-হ্যা-হ্যা-হ্য...

(ব্যোমকেশের দৃষ্টিপথ আটকে জানালায় একটা ঘন কালো ছায়া এসে দাঁড়াল। ছায়া নয়, মূর্তিমান কাক। কানে চাপা রিসিভারটা মুঠির মধ্যে শিথিল হল। স্থির চোখে নিঃশব্দে ব্যোমকেশ ও কাক পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর কাকটাই নীরবতা ভাঙল। শুকনো ফ্যাসফেসে গলায় ডেকে উঠল... কা - কা—)

ব্যোমকেশ। কী... হচ্ছে কী?

কাক। ভুখা! ভুখা!

ব্যোমকেশ। ভুখা!

কাক। ভুখ লেগেছে গা... ভুখা ! ভুখা !

ব্যোমকেশ। কী করে মনে হল, তোমার জন্যে ধর্মশালা খুলে বসে আছি....

কাক। ভুখা! ভুখা!

ব্যোমকেশ। যা ওদিকে যা... ওই মাংসের দোকানের দিকে দ্যাখ। তিনটে বাজলেই পিয়ার আলি পাঁঠা কাটবে...

কাক। কাটবে না গা... কাটবে না... পাঁঠা আজ কাটবে না...

ব্যোমকেশ। কাটবে... কাটবে... রোববার... বাবুরা মাংস খাবে, প্রচুর নাড়িভুঁড়ি খেতে পাবি...

কাক।না গা... না গা... দোকান খুলবে না! ডাকাত পড়েছে গা... ডাকাত! ডাকাত!...

ব্যোমকেশ। ডাকাত! কোথায়... কখন...

কাক।গয়নার দোকানে। মস্ত ডাকাতি হয়ে গেছে। এত্তো গয়না নিয়ে ডাকাত ভাগলবা... ভাগলবা...

ব্যোমকেশ। যাব্বাবা, কখন কী হচ্ছে... কিছুই তো জানতে পারিনি....

কাক। কী করে জানবে? আছ তেতলায় বসে। নীচে নেমে দ্যাখো। গাদা গাদা লোক ছুটোছুটি করছে। দোকান বাজারে ঝাঁপ বন্ধ ! ডাকাতটা পাড়ার মধ্যে সিঁধিয়েছে গা... সিঁধিয়েছে গা...

ব্যোমকেশ। যা, তুইও যা, দেখগে কোথায় সিঁধলো ডাকাত... যা...

কাক।ভুখা... ভুখা...

ব্যোমকেশ। মহা মুশকিলে পড়লুম গা! ওরে আমার এখানে গলা ফাটালে কী হবে! যা নীচে যা! তোর বউদি আছে। বউদির কাছে যা...

কাক।বউদির ঘরের দরজা জানালা বন্ধ গা...

ব্যোমকেশ। ওরে জানালার পাশে গিয়ে জোরসে হাঁক পাড়...

কাক।দূর! কতক্ষণ ডাকলাম... বউদি সাড়াই দিচ্ছে না...

ব্যোমকেশ। তাহলে দিবানিদ্রা দিচ্ছে। আছে বেশ। আমি এদিকে লেখা নিয়ে নাজেহাল...

কাক।তুমি চলো না... বউদিকে ডেকে দেবে...

ব্যোমকেশ। মাইরি! লেখা ফেলে আমি এখন ওনার লাঞ্চের যোগাড় করব! যম এলে এখান থেকে নড়াতে পারবে না...

কাক।(খিঁচিয়ে) কী ছাইপাঁশ লিখছ গা...

ব্যোমকেশ। ছাইপাঁশ! ব্যাটা বলে কী! আরে এই, আমি কে তুই জানিস?

কাক।কে আবার! কাজ নেই কম্মো নেই... সারাদিন বসে বসে লেখো আর ছেঁড়ো...

ব্যোমকেশ। ওরে ওই লিখতে লিখতে ছিঁড়তে ছিঁড়তে ...ওই যে ...ওই দ্যাখ... রাষ্ট্রপতি পুরস্কারটি পেয়েছি...

কাক।সত্যি! ওটা রাষ্ট্রপতির পুরস্কার!

ব্যোমকেশ। ব্যোমকেশ ভৌমিক ... ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ নাটককার!

কাক।তোমায় পুরস্কার না দিয়ে রাষ্ট্রপতি আমায় যদি একখানা রুটি দিত গা!

ব্যোমকেশ। চুপ! রাষ্ট্রপতির কাজের ভুল ধরতে নেই!

কাক।(ঘরের ভেতর ঢুকে পড়ে) কই দেখি, কী লিখেছে! পড়ো তো শুনি, রাষ্ট্রপতি কী দেখে তোমায় পুরস্কার দিল... পড়ো...

ব্যোমকেশ। তুই নাটক শুনবি!

কাক। তা তুমি কষ্ট করে লিখতে পারলে, আমি দয়া করে শুনতে পারব না! শুরু করো... শুরু করো.. খেতে যখন দিলে না... শালা নাটকই শুনি...

(কাক গম্ভীর মুখে গালে হাত দিয়ে বসে।)

ব্যোমকেশ। ব্যাটা বসেছে দ্যাখো! ন্যায়রত্ন তর্কবাগীশ! ভাগ্...

কাক।(ধমকের গলায়) কা-কা!

ব্যোমকেশ। একটু শুনেই কাটবি! (পাণ্ডুলিপি হাতে নিয়ে) দূর শালা, কার কাছে পড়ছি!

কাক। (লম্বা টানে) কা-আ-কা!

ব্যোমকেশ। আচ্ছা দাঁড়া... কাকে বলে নাটক, আগে তোকে তাই বোঝাই...! শোন, নাটকে একটা গল্প থাকে... কতগুলো চরিত্র থাকে... তাদের মুখে কথা থাকে... হাতে পায়ে অ্যাকশন থাকে। কোনো কোনো নাটককার কল্পনায় এ সব বানিয়ে বানিয়ে লেখে... কিন্তু আমি ব্যোমকেশ ভৌমিক বাস্তব জীবন থেকে পরিস্থিতি তুলে এনে বসাই! যাকে বলে বাস্তববাদী...জীবনবাদী লেখা...

কাক। আরেকটু কঠিন করে বলো না... বড্ড জলভাত হয়ে যাচ্ছে...

ব্যোমকেশ। কাক না আঁতেল! (জানালায় গিয়ে) ওই যে... ওই যে ভদ্রলোক যাচ্ছেন... দ্যাখ দ্যাখ... ছোটখাট্টো মানুষটি... কাঁধে ঝোলা... মাথায় টাক... উঠে দ্যাখ না...

কাক।উঠতে হবে না। বন্ননা যা দিলে, দ্বিজবাবু ছাড়া কেউ না!... হলদে বাড়িতে থাকে...সকালে মুরগির ডিম খায়...

ব্যোমকেশ। চিনিস তুই!

কাক।কেন চিনব না! ডেইলি ওর আস্তাকুঁড়ে ডিমের খোলা পাই...

ব্যোমকেশ। ওই দ্বিজবাবুই আমার এক নতুন নাটকের হিরো...

কাক।সে কী গা! তোমার হিরো অত বেঁটে!

ব্যোমকেশ। ওরে বাইরে বেঁটে, ভেতরে যে লোকটা এতখানি লম্বারে...এমনি চওড়া ওর বুক...

কাক।মেপে দেখেছ!

ব্যোমকেশ। দেখেছি... দেখেছি বলেই বলছি অমন মানুষ একটিও দেখিনি। অমন পরোপকারী নিঃস্বার্থ মানুষ...কটা আছে এ পাড়ায়? বল, কটা লোক ওর মতো হাজার হাজার ইঁদুর মেরেছে!

কাক।ইঁদুর অবিশ্যি ও অনেক মেরেছে!

ব্যোমকেশ। শুধু ইঁদুর! আরশোলা ছারপোকা টিকটিকি কী না? বাড়ি বাড়ি ঢুকে খাটের নীচেয় হামাগুড়ি দিয়ে... ভাঁড়ার ঘরে কালিঝুলি মেখে... লোকটা পোকামাকড় সাফ করে দেয়! বিনে পয়সায়... নিজে থেকে... ডাকতে হয় না... খবর পেলেই ছুটে আসে! কাক, মহামানবকে হিরো বানিয়ে সবাই লেখে, কে খবর রাখে এদের... এইসব ছোটোখাটো মানুষের ছোটো ছোটো মহত্বের! এরা ভিড়ের মধ্যে মিশে থাকে। ধরা দেয় না, তাই এদের চেনা যায় না। এইতো আমার বুক-র‍্যাকে উই ধরল, কিছুতে ছাড়ায় না... কত পয়সা ব্যয় করি, শালা উঁই এখানে ডুব মেরে ওখানে ভেসে ওঠে... শেষে দ্বিজবাবু এলেন... সারাদিন উটকে পাটকে উঁই-এর বাসা বার করলেন... একটি একটি করে টিপে টিপে উঁই মারলেন...

(শুনতে শুনতে কাক হঠাৎ কঁকিয়ে কেঁদে উঠল।)

কী হল?

কাক।(কাঁদতে কাঁদতে) আমার কী হবে গা... আমার কী হবে গা...

ব্যোমকেশ। আরে কী হয়েছে বলবি তো...

কাক।ক্ষতি করেছি গা... অত বড়ো মানুষটার কেন এমন সর্বনাশ করলুম গা...

ব্যোমকেশ। দ্বিজবাবুর! কী করছিস তুই?

কাক।মানিব্যাগটা ঝেড়ে দিয়েছি গা...

ব্যোমকেশ। মানিব্যাগ!

কাক।পরশুদিন ওর পাঁচিলে ঠেক নিয়েছিলাম। দেখি ঘরের জানালা খোলা... টেবিলে মানিব্যাগটা পড়ে রয়েছে! (ইনিয়ে বিনিয়ে কেঁদে ওঠে) আমার মাথায় কী শয়তান চাপল গা... সাঁ করে ঢুকে পড়ে ছোঁ মেরে ব্যাগটা তুলে...

ব্যোমকেশ। ছি ছি ছি...তুই ...তুই দ্বিজবাবুর মানিব্যাগ মারলি...

কাক।চিনতে পারিনি গা... মানুষটাকে চিনতে পারিনি গা...

ব্যোমকেশ। তোকে গুলি করে মারা উচিত!

কাক।আমার কী হবে গা... কী হবে গা... কা-কা...

(কাক ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে বেরিয়ে গেল।)

ব্যোমকেশ। সাতটা খচ্চর মরে একটা কাক হয়! উফ্ এই রকম হারামি কিনা আমার নিমগাছে শেলটার নিয়েছে। দ্বিজবাবুর কাছে আমি মুখ দেখাব কী করে...(চিৎকার করে) গাছ কাটতে হবে...ও গাছ আমাকে কাটতেই হবে...

(কাক ঢোকে।)

কাক।না গা... না গা... গাছ কাটলে আমার বাচ্চাগুলো মরবে গা... ওদের মেরো না গা... ওদের কী দোষ...ধরো ব্যাগ ধরো... দ্বিজবাবুকে ফেরত দিয়ে দিয়ো...

(কাক ব্যোমকেশকে একটা মানিব্যাগ দেয়।)

ব্যোমকেশ। একী! এ কার ব্যাগ!

কাক।ওই তো দ্বিজবাবুর... তুলে এনে বাসায় রেখেছিলাম... (কান মুলতে মুলতে) আর কোনোদিন হলদে বাড়ির ধারে কাছে যাব না গা... যাব না গা...

ব্যোমকেশ। এতো আমার ব্যাগ!

কাক।তোমার!

ব্যোমকেশ। (ব্যাগ খুলে ঝাড়তে ঝাড়তে) কই, টাকা কই?

কাক।টাকা!

ব্যোমকেশ। তিনশো... তিনখানা একশোর পাত্তি... সত্যি বল কোত্থেকে তুলেছিস!

কাক।দ্বিজবাবুর ঘর থেকে! মা শেতলার দিব্যি!

ব্যোমকেশ। মার খেয়ে মরে যাবি কাক। দ্বিজবাবুর ঘরে আমার ব্যাগ যাবে কেমন করে!

কাক।তাইতো? ব্যাগের তো কাগের মতো ডানা নেই যে উড়ে যাবে।

ব্যোমকেশ। কাক!

কাক।কী ভাবছ বলোতো, আমি তোমার টাকা মারতে ব্যাগ সরিয়েছি! আমার কিছু নেই, বুঝলে! হ্যাঁ, রুটিমুটি চুরিটুরি করি...পেটের জ্বালায় করতে হয়... কিন্তু পাত্তি নিয়ে আমার কী গুষ্টির পিন্ডি হবে! আমার কাছে টাকা মাটি, মাটি-টাকা...মাটি কলম...

(কাক একটা কলম বার করে।)

ব্যোমকেশ। কলম!

কাক।কাল তুলে এনেছি...

ব্যোমকেশ। (খপ করে কলমটা নিয়ে) আরে!

কাক।বলো ওটাও তোমার!

ব্যোমকেশ। আমার ...গোল্ডক্যাপ পার্কার..

কাক।কী আশ্চয্যি! যেটাই দেখাচ্ছি সেটাই তোমার! এটাও তোমার?

(কাক একটা হাতঘড়ি ছুঁড়ে দেয়।)

ব্যোমকেশ। ওই তো... ওই তো রিস্টওয়াচ! ...এসব দ্বিজবাবুর ঘরে ছিল!

কাক।ছিল মানে কি, দ্বিজবাবুর ঘরে তো কতই থাকে...

ব্যোমকেশ। কতই থাকে...

কাক।কত! গাদা গাদা কলম মানিব্যাগ রিস্টওয়াচ... এটা ওটা সেটা... টেবিলে ডাঁই করা থাকে! রোজ দ্বিজবাবু ওই ঝুলিটা ভরতি করে নিয়ে আসে। পরের দিন দ্বিজুর বউ বেচে দেয়!... দ্বিজু আবার এনে দেয়... আবার বেচে দেয়। ওই তো আজও ঝুলি নিয়ে বেরুল... কতকি নিয়ে আসবে... কানের দুল... নাকের ফুল... গলার হার...

ব্যোমকেশ। লোকটা চোর!

কাক।না না উঁই মেরে দেয়...

ব্যোমকেশ। চুপ! শালা উঁই মারতে বাড়ি ঢুকে, ঘর ফাঁক করে বেরিয়ে যায়!

কাক।না না, মহৎ লোক!

ব্যোমকেশ। শালা এইরকম একটা পাকা জোচ্চরকে আমি মহান বানিয়েছে! হিরো বানিয়েছে!

(ব্যোমকেশ লেখা পাতা ছিঁড়ছে।)

কাক।ছিঁড়ো না... ওকি, না না ...কত গা ঘামিয়ে লিখেছে... রেখে দাও, রাষ্ট্রপতি আবার পুরস্কার দেবে...

ব্যোমকেশ। ছাড়্ ছেড়ে দে! কিচ্ছু হয়নি! অল ফলস! ব্যাটা বাইরে বেঁটে ভেতরে বামন!

কাক। কেন মরতে মানিব্যাগটা দেখালাম গা!

ব্যোমকেশ। তুই না দেখালে একটা মিথ্যে... ডাঁহা মিথ্যে... ফাঁকতালে চিরকালের মতো সত্যি হয়ে বাজারে চলত রে...

কাক। সেও তো তবু চলত গা... এ যে তোমাদের থ্যাটার অচল হয়ে যাবে গা... থ্যাটারের লোকে আমায় অভিশাপ দেবে গা... পরজন্মেও কাক হয়ে আমি যে নোংরা ঘেঁটে মরব গা!... আমার কী হবে গা... কী হবে গা...

(কাক ছটফট করতে করতে বেরিয়ে যায়। ব্যোমকেশ তখনো লেখা কাগজ ছিঁড়ছে। ছেঁড়া পাতার দিকে তাকিয়ে দুঃখে হাসছে। বাইরের দরজায় ডাক্তার দাশ এসে দাঁড়ায়।)

দাশ। মে আই ডিসটার্ব ইউ?

ব্যোমকেশ। কে?

দাশ। একটু বিরক্ত করতে পারি স্যার?

ব্যোমকেশ। আরে ডাক্তার দাশ...

দাশ। বার কয়েক ঘুরে গেছি... তা এইবার আপনার চাকর এনট্রি দিল... দাদাবাবুর লেখা এতক্ষণে নিশ্চয় খতম হয়ে গেছে।

(ব্যোমকেশ মেঝেতে ছড়ানো ছেঁড়া কাগজ দেখায়।)

দাশ। ও মশাই, রবীন্দ্রনাথ ছিন্নপত্র লিখেছিলেন, আপনি যে লিখে লিখে পত্র ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করেছেন! হ্যা...হ্যা...হ্যা করেছেন কি ও ব্যোমকেশবাবু, চতুর্ধারে যে মা সরস্বতী গড়াগড়ি যাচ্ছে... কোথায় পা ফেলি...

ব্যোমকেশ। ফেলুন...ওপরেই ফেলুন...

দাশ। না না...

ব্যোমকেশ। বলছি ফেলুন...জোরসে ফেলুন...ভুসিমাল!

(ব্যোমকেশ কাগজের ওপর নিঃসঙ্কোচে পায়চারি করছে।)

দাশ। কারো ওপর খেপে গেছেন মনে হচ্ছে!

ব্যোমকেশ। কারও ওপর না— নিজের এই চোখদুটোর ওপর... বসুন... যতক্ষণ খুশি বসতে পারেন ডাক্তার দাশ, এই মুহূর্তে হাতে আমার কোনো লেখা নেই। কলম বনধ! নতুন বিষয়বস্তুর সন্ধান না মেলা পর্যন্ত...

দাশ। লক আউট! বাঁচা গেছে! (সামলে) মানে হাত যখন ফাঁকা... সন্ধেবেলা আজ আমার গৃহে একটু পদধূলি দিন না ব্যোমকেশবাবু... বড়ো ইচ্ছে আপনাকে দিয়েই স্মৃতিস্তম্ভটি উদ্বোধন করাই...

ব্যোমকেশ। স্মৃতিস্তম্ভ!

দাশ। আজ্ঞে হ্যাঁ...শ্বেতপাথরেরই করলুম। খরচ হল, তা প্রায় সাড়ে চার হাজার। ... হ্যাঁ-হ্যাঁ-হ্যাঁ...দাঁড়িয়ে দেখবার মতো হয়েছে স্মৃতিস্তম্ভটি...

ব্যোমকেশ। কিন্তু কার স্মৃতিস্তম্ভ!

দাশ। আপনি জানেন না?

ব্যোমকেশ। না তো!

দাশ। শোনেননি!

ব্যোমকেশ। না!

দাশ। আমাদের ছেদিলালের...

ব্যোমকেশ। ছেদিলাল...

দাশ। রাজমিস্ত্রি! ওই যে অ্যাকসিডেন্টে মারা গেল... আমার বাড়ির কার্নিশ থেকে পড়ে গিয়ে...

ব্যোমকেশ। ও হ্যাঁ হ্যাঁ... মই উল্টে...

দাশ। নিয়তি! নইলে চোদ্দোতলা বাড়ির মাথায় যে ছেদিলাল অবলীলায় লাফিয়ে বেড়াত... সে কি না মাত্তর দু'তলার ওপর থেকে মই ফসকে... বিশ্বাস করা যায়! আপনি বিশ্বাস করেন?

ব্যোমকেশ। ছেদিলালের স্মৃতিস্তম্ভ গড়েছেন আপনি!

দাশ। গড়ব না? (চোখ মুছে) তার হাতের এক একটি ইট যে আমার বাড়িটা দাঁড় করিয়ে রেখেছে ব্যোমকেশবাবু... জীবন দিয়ে যে আমায় আশ্রয় গড়ে দিয়ে গেল...

ব্যোমকেশ। সত্যি ডাক্তার দাশ, গরিব মিস্ত্রিকে আপনি যে সম্মান দেখাচ্ছেন...

দাশ। কিছু না...কিছু না মশাই...ছেদি যে দরের রাজমিস্ত্রি ছিল...শিল্পী ছিল... সে তুলনায় কিছুই পেল না! এই হচ্ছে আমাদের সমাজব্যবস্থা!

ব্যোমকেশ। আপনি মহান ব্যক্তি ডাক্তার দাশ...

দাশ। না-না একী বলছেন, না না মশাই...

ব্যোমকেশ। লজ্জার কিছু নেই ডাক্তার দাশ... লজ্জা পাক তারা, যারা ছেদিলালদের ভুলে যায়। ছেদিলালেরা ঘাম ঝরিয়ে ইঁট বয়ে আমাদের ইমারত গড়ে দিয়ে যায়... আমরা তার টপ-ফ্লোরে বসে ভুলে যাই, কার ঘাড়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এ প্রাসাদ!

দাশ। বিপ্লব চাই ... খেটে খাওয়া মানুষকে মর্যাদা দিতে চাই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। এই ঘূনধরা ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার কঙ্কালের ওপর বসে সেই সাধনা করতে হবে ব্যোমকেশবাবু! কায়েমি স্বার্থ নিপাত যাক্!

ব্যোমকেশ। লিখতে হবে...আমাকে লিখতে হবে। স্মৃতিস্তম্ভ গড়ে ছেদিলালকে অমর করে রাখছেন আপনি, নাটক লিখে ছেদিলালকে অমর করে রাখব আমি!

দাশ। লিখুন, লিখুন...শ্রমিক কৃষক মজদুরের সংগ্রামী মূর্তি ফুটিয়ে তুলুন... তবেই আসবে বিপ্লব! আপনারা লেখক, আপনাদের দিকেই তাকিয়ে আছে দেশ। আমরা শত বক্তৃতা দিয়ে যা পারব না...কলমের খোঁচায় আপনারা তাই পারেন। সাবজেক্ট ম্যাটারের কী অভাব মশাই? কত ছেদিলালরা রয়েছে।

ব্যোমকেশ। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমার নতুন নাটকের বিষয়বস্তু ওই স্মৃতিস্তম্ভ...আপনিই তার হিরো!

দাশ। বলেন কী মশাই, আমি... আপনার নাটকে আসছি!

ব্যোমকেশ। প্লিজ উঠে পড়ুন, আমায় লিখতে দিন! (ব্যোমকেশ উত্তেজিত। কাগজ কলম গুছিয়ে বসে পড়ে) আর হ্যাঁ, লেখা শেষ না করে উঠব না। স্মৃতিস্তম্ভ উদ্বোধনে বোধহয় যেতে পারছি না।

দাশ। না, না, আগে লেখা, পরে ফিতে কাটা! ফিতে না হয় আমিই কেটে দেব খন। জমিয়ে লিখুন দেখি! তাহলে আমিই হিরো! আমি! ...অ্যাঁ, হুবহু আমি। ...আমি নাটকে কথা বলব!

(ব্যোমকেশ লিখতে শুরু করে।)

...শিহরিত হচ্ছি মশাই ... হি হি হি ... রোমাঞ্চিত হচ্ছি! আমি মডেল... সাহিত্যের মডেল!... আমি জীবনে...আমি নাটকে...ভাবা যায় না...এই আমি, সেই আমি... ব্যোমকেশবাবু... (ব্যোমকেশ নীরবে লিখছে) আরে, লোকটা যে কথা বলতে বলতে বাহ্যজ্ঞানরহিত!... ব্যোমকেশবাবু...ডুবে গেছে... আমারই মধ্যে তলিয়ে গেছে... হারিয়ে গেছে... (হেসে) জীবনে বাড়ি পেয়েছি... লিটারেচারেও ঠাঁই পেলুম...(ব্যোমকেশের কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিস ফিস করে) চালিয়ে যান... এ জিনিস আমি পাবলিশ করব... সাড়ে চার হাজারে স্মৃতিস্তম্ভ গড়েছি... দশ বিশ যা লাগে আমি পাবলিশ করব... মঞ্চ ভাড়া করে এ জিনিস লোককে দেখাতে হবে! খরচ আমার! আমি স্পনসর! লিখুন... লিখে যান... (বাইরে কাক ডাকে) চুপ! চেঁচাবি না! ডোন্ট ডিসটারব! ক্রিয়েশান হচ্ছে! (কাক ডাকে) দাঁড়া শালা, হুলো বেড়াল দিয়ে খাওয়াব তোকে...

(পা টিপে টিপে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল ডাক্তার দাশ। অখণ্ড নীরবতার মধ্যে লিখছে ব্যোমকেশ। সহসা কাক ঝড়ের বেগে ঢুকল।)

কাক। ডাকাত! ডাকাত!

ব্যোমকেশ। (প্রচণ্ড বিরক্তিতে) আঃ!

কাক। (থতমত খেয়ে) শিগগির চলো না...বউদির ঘরে ডাকাত ঢুকেছে গা...

ব্যোমকেশ। অ্যাঁ! ডাকাত!

কাক। (চাপা গলায়) নির্ঘাত সেই গয়নার ডাকাত! লোকজনের তাড়া খেয়ে আর জায়গা না পেয়ে বউদির ঘরে ঘুষেছে... আমি ডাকাতের গলা পেলাম গা...

ব্যোমকেশ। কী... কী বলছে...

কাক। বলছে... (মোটা গলায়) তোমায় ছেড়ে আমি বাঁচব না গা... বাঁচব না গা...

ব্যোমকেশ। বাঁচব না গা... তোমায় ছেড়ে আমি বাঁচব না গা... ডাকাত বউদিকে বলছে...!

কাক। আর বউদি বলছে, (মেয়েলি গলায়) আঃ কী করছ... ছাড়ো... ছেড়ে দাও... অসভ্য! (নিজের গলায়) এতক্ষণ ডাকাতটা ঠিক বউদির গলা টিপে ধরেছে গা...

(ব্যোমকেশ হো হো করে হেসে ওঠে।)

ব্যোমকেশ। গাধা... তুই একটা গাধা।

কাক। আমি কাক...

ব্যোমকেশ। ওরে কাক তুই যা শুনেছিস, সেটা একটা নাটকরে গাধা...

কাক। ঘরের মধ্যে নাটক!

ব্যোমকেশ। রেডিয়োর নাটক! রোববার আড়াইটের প্রোগ্রাম! আজ আমারই লেখা নাটক হচ্ছে... তোর বউদি শুনছে...

কাক। বলছ ডাকাত না?

ব্যোমকেশ। দূর পাঁঠা, ডাকাত কখনো বলে তোমায় ছেড়ে বাঁচব না...? ও ডায়লগ প্রেমের ডায়লগ, বুঝলি তো? আমারই হাতের... (থেমে) আমাকে তো কাছে পায় না... তাই আমার লেখা নিয়ে ভুলে আছে তোর বউদি... বড়ো একা...থাক্, চেঁচাসনে...

কাক। তাহলে বউদি এখন দরজা খুলবে না...

ব্যোমকেশ। নাটক শেষ না হলে খুলবে না...

কাক। আমিও খেতে পাব না?

ব্যোমকেশ। এখনো খাসনি?

কাক। দিচ্ছে কে!... বাচ্চাগুলোও না খেয়ে রয়েছে। ওঃ পোড়া পেটের জ্বালায় সারাদিন যে কী ভাবে কাটে! ভোর হতে না হতে শুরু হয় মাথা কোটাকুটি...একদলা ভাত...তোমাদের পাতের উচ্ছিষ্ট..

ব্যোমকেশ। দ্যাখ না, আর কারো বাড়ি...

কাক। কার বাড়ি যাব! সকলেরই আমি টুকটাক ক্ষেতি করে রেখেছি! যে দ্যাখে সেই দূর দূর করে! এই ভালোবাসতো ছেদিলালের বউ...তা সেও কী রকম হয়ে গেছে বরটা খুন হবার পর...

ব্যোমকেশ। (চমকে) খুন! কে খুন!

কাক। কেন, ছেদিলাল মিস্ত্রি!

ব্যোমকেশ। অ্যাকসিডেন্ট!

কাক। খুন!

ব্যোমকেশ। (জোরে) অ্যাকসিডেন্ট!

কাক। খুন!

ব্যোমকেশ। অ্যাকসিডেন্ট! ডাক্তারবাবুর দোতলা থেকে মই উল্টে পড়ে...

কাক। উল্টে না! ডাক্তার মই ঠেলে ফেলে দিয়েছে!

ব্যোমকেশ। ঠেলে ফেলে দিয়েছে! ডাক্তার দাশ!

কাক। স্বচক্ষে দেখেছি! আমি তখন পাশের বাড়ির অ্যানটেনায় বসে। সব দেখলাম...

ব্যোমকেশ। কী...কী দেখলি?

কাক। দেখলাম মিস্ত্রি আর ডাক্তারে খুব বচসা হচ্ছে! মিস্ত্রি বলছে, আপনার কালো টাকা নুকোবার চেম্বার গড়ে দিলাম...দশহাজার টাকা দেবার কথা...দিচ্ছেন মাত্তর পাঁচশো...? ডাক্তার বলছে, ওর বেশি হবে না। ...মিস্ত্রি বলছে, তাহলে লোক জানাজানি হয়ে যাবে। ডাক্তার হেসে উঠল— দেব রে দেব, যা বলেছি দেব... নে এখন কার্নিশটা গেঁথে দে। ছেদিলাল খুশি হয়ে তরতর করে মই বেয়ে উঠেছে, ডাক্তারও টুক করে মইটা ঠেলে দিল... আর ছেদিলাল হুড়মুড় করে...

ব্যোমকেশ। (বিমূঢ় গলায়) ডাক্তার দাশ...ছেদিলালের স্মৃতিস্তম্ভ গড়ছেন—

কাক। অপকম্মো ঢাকা দেবার জন্যে গড়ছেন গা!

ব্যোমকেশ। (পূর্ব্ববৎ) শ্রমিক মজদুরের বন্ধু... বিপ্লবের স্বপ্ন দেখেন...

কাক। (হেসে) ওসব তো বকুনি! খচ্চর! কালো টাকার চেম্বার গড়ে নিয়ে খুন করল মিস্ত্রিকে...

ব্যোমকেশ। খুন করব তোকে...

কাক। কেন গা!

ব্যোমকেশ। লিখতে দিবি না... তুই কি আমাকে লিখতে দিবি না ঠিক করেছিস...

কাক। বারে তুমি যা লিখছ, লেখো না...

ব্যোমকেশ। কী লিখব, যেটা ধরতে যাচ্ছি সেটা ভেঙে দিচ্ছিস! জগতের যতো মন্দ যত নোংরা যত কুৎসিত কি তোরই চোখে পড়ে, তোরই চোখে পড়ে...

(ব্যোমকেশ পেপারওয়েট নিয়ে কাকের দিকে তেড়ে যায়।)

কাক। (নিজের মাথা বাঁচিয়ে) যা সত্যি তাই পড়ে... যা পড়ে তাই তো সত্যি...

ব্যোমকেশ। কী সত্যি! শয়তান, তোর একটা কথাও সত্যি না! সব মিথ্যে! তুই ডাহা নিন্দুক। লোকের ভালো সহ্য হয় না... বেরো... বেরো তুই...

(ব্যোমকেশ হাতের কাছে যা পায়, তাই দিয়ে কাকটাকে আক্রমণ করে।)

কাক। (ছুটোছুটি করে নিজেকে বাঁচাতে বাঁচাতে) মেরো না গা.... মেরো না গা... আমার কী হবে গা...

ব্যোমকেশ। এইজন্যে তোদেরও ভালো হয় না... খেতে পাস না... তবু তোদের শিক্ষা হয় না...

কাক। কেন মরতে আমার চোখেই সব পড়ে গা... এ চোখ নিয়ে আমি কী করব গা...

(কাক ঝটপট করতে বেরিয়ে যায়। বাজখাঁই গলার হাঁক শোনা যায়—জয় নন্দিকেশ্বর... জয় জটিলেশ্বর।... দরজায় এসে দাঁড়ায় এক দশাসই সাধু, সঙ্গে এক চেলা।)

সাধু। জয় বিষাণধারী ত্রিশূলপাণি গিরিজাপতি শিবশংকর

চেলা। শংকররর...

সাধু। (থেমে, কটমট চোখে তাকিয়ে) তুই তো ব্যোমকেশ...?

ব্যোমকেশ। আজ্ঞে হ্যাঁ...

সাধু। ড্রামার বই লিখিস?

ব্যোমকেশ। আজ্ঞে হ্যাঁ...

সাধু। (ব্যোমকেশের আংটি দেখিয়ে) গোমেদ ধারণ করেছিস?

ব্যোমকেশ। আজ্ঞে হ্যাঁ...গোমেদ!

সাধু। নীচস্থ রাহু?

ব্যোমকেশ। (বিষণ্ণ গলায়) আজ্ঞে হ্যাঁ-অ্যা...

সাধু। হারাধন কবে মারা গেল?

ব্যোমকেশ। আজ্ঞে?

সাধু। কবে মারা গেল হারাধন?...সিক্সটি ফাইভে?

ব্যোমকেশ। আপনি কি বাবাকে চিনতেন?

চেলা। শিবশংকররর...

সাধু। নীলমণির তো একটি মেয়ে দুটি কুকুর... একটি নেড়ি একটি অ্যালসেসিয়ান!

ব্যোমকেশ। আমার শ্বশুরমশায়কেও চেনেন!

চেলা। শিবশংকররর...

সাধু। লাঞ্চে হেলেঞ্চা খেয়েছিস?

ব্যোমকেশ। আজ্ঞে হ্যাঁ...

সাধু। রাষ্ট্রপতির হাত থেকে অ্যাওয়ার্ড নিয়েছিস?

ব্যোমকেশ। আজ্ঞে হ্যাঁ...

সাধু। আমাশা আছে?

ব্যোমকেশ। হুঁ...

সাধু। আজ থেকে সাতবছর তেরোদিন পাঁচঘণ্টা গতে...তুই ওয়ার্লড ড্রামাটিস্ট কনফারেন্সের চেয়ারম্যান হবি...

ব্যোমকেশ। (বিস্ময়ে উত্তেজনায় সাধুর পা জড়িয়ে ধরে) কে আপনি বাবা, আমার ভূত ভবিষ্যৎ সবই অবগত?

চেলা। শিবশংকররর...

সাধু। জয় নন্দিকেশ্বর, জয় জটিলেশ্বর...মামাবাড়ি কেষ্টনগর?

ব্যোমকেশ। আজ্ঞে হ্যাঁ...

সাধু। চার মামা?

ব্যোমকেশ। আজ্ঞে না...তিন মামা!

সাধু। চার...

ব্যোমকেশ। তিন...

সাধু। (প্রচণ্ড গর্জনে) চার!

ব্যোমকেশ। (ঘাবড়ে) আজ্ঞে চার!

চেলা। শিবশংকররর...

ব্যোমকেশ। মানে ছিল চার...আছে তিন! বিশ বছর আগে মেজোমামা বাড়ি ছেড়ে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে। বোধ হয় বেঁচে নাই!

সাধু । কে বললে!

ব্যোমকেশ । অনেক খোঁজা হয়েছে!

সাধু । হিমালয়ে খুঁজেছিস!

ব্যোমকেশ । সম্ভব না।

সাধু । গৃহত্যাগ করে মেজোমামা গেছে হিমালয়ে... দুর্গম গিরিকোটরে বসেছে দুরূহ তপস্যায়!... বিশ বছরের সাধনায় সিদ্ধি ক্যাপচার করে... জয় জটিলেশ্বর... মেজোমামা এখন (নিজেকে দেখিয়ে) মহারাজ পর্বতানন্দ সিদ্ধিবাবা...

ব্যোমকেশ । মামা...আপনি...তুমি মেজোমামা!

সাধু । বাবা বল! গৃহাশ্রমে মেজোমামা...সন্ন্যাসাশ্রমে সিদ্ধিবাবা...

চেলা । শিবশংকররর...

ব্যোমকেশ । ওঃ! কদ্দিন বাদে তুমি ফিরলে সিদ্ধিমামা...সিদ্ধিবাবা...

সাধু । ফিরতুম না। গিরিকোটর ছেড়ে কোনোদিন প্লেনল্যান্ডে দর্শন দিতুম নারে... নেহাত ব্রঙ্কো নিউমোনিয়ার অ্যাটাকে...

ব্যোমকেশ । বলো কী? সাধুদের নিউমোনিয়া! হিমালয়ে তপস্যা... সে তো আবহমানকাল চলে আসছে মেজোমামা... মেজোবাবা...কোনোদিন শুনিনিতো তপস্বীদের ব্রঙ্কিয়াল ট্রাবলস...

সাধু । হয়। মেন্টাল ডিজিজও হয়...

ব্যোমকেশ । অ্যাঁ? মানসিক রোগ... মানে পাগলামি...

সাধু । পাগল...উন্মাদ...ঘোর উন্মাদ...বদ্ধ উন্মাদ...খ্যাপা...টু দি পাওয়ার ইনফিনিটি!

চেলা। শিবশংকররর...

ব্যোমকেশ । কী করে বোঝা যায়... মামা বাবা... সাধুদের কোনটা খ্যাপামি...কোনটা নরম্যাল?

সাধু । (ভয়ংকর গলায়) বুঝতে চাস? (চেলাকে) বুঝিয়ে দে।

চেলা। (বিকট লাফ ঝাঁপের সঙ্গে) হাঃ হাঃ হাঃ...হোঃ হোঃ হোঃ...হিঃ হিঃ হিঃ...

ব্যোমকেশ। (সভয়ে) থাক... কী দরকার আমার বুঝে... চুপ করতে বলো মেজোমামা... মেজোবাবা... (সাধুর নির্দেশে চেলা থামে) তোমার এই শিষ্য বোধ হয় পূর্বাশ্রমে যাত্রাদলে ছিলেন? হা-হা হো-হো হি-হি সবরকম হাসি পারে...

সাধু। আজকের রাতটা তোর ঘরে শেলটার নেব!

ব্যোমকেশ। বলার কী আছে... এতো তোমারই বাড়ি। আমি মিনুকে খবর দিই... (জোড়ে) মিনু, অমার মেজোমামা মানে বাবা সিদ্ধ...

(ব্যোমকেশ প্রস্থানোদ্যত)

সাধু। বোস বোস! —মামা বাবা গুলিয়ে ফেলছিস! বোস ! (চিৎকার করে) কাউকে ডাকবি না। নারী এবং সংসারীর সংস্পর্শ করি না আমি...!

চেলা। শিবশংকররর...

সাধু। তোর কথা স্বতন্ত্র! তুই সাধক! তুই যোগী!

ব্যোমকেশ।ঠিক আছে...। ঘরে কাউকে ঢুকতে দেব না।

সাধু। ব্যোমকেশ...আমাকে নিয়ে একটা ড্রামা লেখ না...

ব্যোমকেশ। তা লেখা যায়। তোমার লাইফ যেরকম ড্রামাটিক! তাছাড়া সারাদিন ছটফট করছি একটা বিষয়বস্তুর সন্ধানে...

সাধু। জানি... জানি... ওরে তোর জ্বালা কি জানি না? সেইজন্যেই তো অ্যাপিয়ার করলুম। তোকে ভক্তিরসের ড্রামা লিখতে হবে...ব্যোমকেশ...

ব্যোমকেশ। ভক্তিরস!

সাধু। শুকিয়ে গেছে। গিরিশচন্দ্রের পরে হেজেমেজে গেছে। তোকে আবার মজিয়ে দিতে হবে...ভক্তিরস স্রোতে সুদূর লাদাখ থেকে ভাইজাগ পর্যন্ত ভারতের মাটি ভিজিয়ে দিতে হবে ব্যোমকেশ...

ব্যোমকেশ। ...কিন্তু ভক্তিরস আমার যে আসে না মামা...

সাধু। (ঝুলি থেকে প্যাঁড়া বার করে) খা! হৃষীকেশের প্যাঁড়া খা। খেলেই আসবে! তরতরিয়ে আসবে...তোর কলম হরিপ্রেমে মেতে উঠে কাগজের ওপর নেচে নেচে বেড়াবে...

চেলা। শিবশংকররর...

(ব্যোমকেশ ভক্তিভরে প্যাঁড়া গালে দিতে যাবে, ক্ষুধার্ত কাক জানালায় এসে দাঁড়াল। লোভাতুর গলায় ডাকছে।)

কাক।কা কা...

ব্যোমকেশ। আর একটা হবে সিদ্ধিবাবা...

সাধু। প্যাঁড়া?

ব্যোমকেশ। দাও না, কাকটাকে দিই...

সাধু। হৃষীকেশের প্রসাদী প্যাঁড়া খাবে কাক!

চেলা। (চোখ রাঙিয়ে) শিবশংকররর...

ব্যোমকেশ। বেচারি সারাদিন খায়নি... বাচ্চারাও না...শোনো কিরকম কাঁদছে—

কাক।কা কা...

চেলা। (ত্রিশূল উঁচিয়ে কাকের দিকে তেড়ে যায়) শিবশংকররর...

ব্যোমকেশ। (চেলাকে বাধা দেয়) না না...

সাধু। বায়স কুক্কুট কিংবা সারমেয়... অপাঙ্‌ক্তেয় অপাঙ্‌ক্তেয়! তুই খা... কত খাবি খা... হাঁ কর...

(ব্যোমকেশ ঊর্ধ্বমুখে হাঁ করে। সাধু ব্যোমকেশের গালে প্যাঁড়া ফেলছে... কাক সব ধৈর্য হারিয়ে ভেতরে ঢুকে সাধুর ঝুলিতে ছোঁ মারে। সাধু চিৎকার করে—)

হেই...হেই...

চেলা। হালায় কাউয়া দেহি বড্ড বাড় বাড়াইছে। যাঃ পালা! শিবশংকররর...

(কাকও ঝুলি ছাড়বে না, সাধুও না। সারা ঘরে ছুটোছুটি চলছে।)

সাধু। মার...মার শালাকে মার...

ব্যোমকেশ। দাও না, একটা প্যাঁড়া দাও না... দেখি ঝুলিটা...

সাধু। না! হারামজাদা কাকের গুষ্টির তুষ্টি করব আজ!

(ব্যোমকেশের ঘর রণক্ষেত্র। সাধুর অবস্থা সঙ্কটজনক। কাক একটানা চিৎকারে এবং নানা আক্রমণে সাধুকে অস্থির করে তুলেছে। চেলা ক্রমাগত ত্রিশূল নাচিয়েও তাকে থামাতে পারছে না। শেষ পর্যন্ত কাক ঝুলি কেড়ে নিয়ে উপুড় করে ফেলল। চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল গয়না। কাক পালিয়ে গেল।)

ব্যোমকেশ। গয়না! এসব কার গয়না মামা...

(ব্যোমকেশ মুখ তুলতে দেখে—সাধুর মাথা খালি। পরচুলাটা খসে পড়ে গেছে। চেলার হাতে পিস্তল।)

কে! কে!

চেলা। (পায়ে পায়ে পিছু হটতে হটতে) চিল্লাবি না...হালায় বুক সিলাই কইর‍্যা দিমু...চুপ! চুপ কইর‍্যা দাঁড়া...

ব্যোমকেশ। মামা!

সাধু। দূর শালা!

চেলা। (পিস্তল উঁচিয়ে) ঢিস্যুম! ঢিস্যুম!

(দরজার কাছাকাছি গিয়ে সাধু ও চেলা বোঁ করে ঘুরে বেরিয়ে গেল।)

ব্যোমকেশ। ডাকাত!

(কাক ঢুকল।)

কাক। গয়না ডাকাত! বললাম না, তাড়া খেয়ে এ পাড়ায় ঢুকেছে...

ব্যোমকেশ। হ্যাঁরে আমার মামাই কি ডাকাত হয়েছে, না ডাকাতটা সব খোঁজ নিয়ে মামা সেজেছে রে!

কাক। মামাই ডাকাত... না ডাকাতই মামা...তুমি তাই নিয়ে ভাবো...আমি এখন যার জিনিস তাকে দিয়ে আসি...

(কাক ঝুলিতে গয়না ঢুকিয়ে নিচ্ছে।)

ব্যোমকেশ। কাক, একটা কথা বলবি...?

কাক।কী কথা?

ব্যোমকেশ। সত্যি করে বলতো, তুই প্যাঁড়া খুঁজতে গিয়ে ডাকাত ধরলি... নাকি ডাকাত জেনেই ডাকাত ধরেছিস!

কাক।তাইতো। কাশীর প্যাঁড়া হলদে চাঁপাফুল... হৃষীকেশের প্যাঁড়া লালচে গোলাপজাম... এ তো সাদা ফকফকে... (থেমে) নির্ঘাৎ হ্যারিসন রোড...! তক্ষুণি বুঝেছি, ঝুলিতে মাল আছে...

ব্যোমকেশ। তুই...তুই এত জানিস কাক...

কাক।বেশি জানিনে, তবে খাবারে আমায় ঠকানো যাবে না। দিনভর পেটের তাড়ায় ঘুরি, লোকের আঁস্তাকুঁড় ঘাঁটি...আঁস্তাকুঁড়ের মাল দেখলেই গেরস্ত চেনা যায় গা। যদি রোজ চাইনিজ প্যাকেট পাওয়া যায়, বোঝাই যায় মাল বাঁ হাতে আমদানি করেন...

(কাক চলে যাচ্ছে।)

ব্যোমকেশ। কাক, তুই আমাকে খবর দিবি...?

কাক।কী খবর!

ব্যোমকেশ। মানুষের খবর! তুই যাদের দেখিস তাদের খবর...

কাক।এই খেয়েছে! তুমি কি আমার কথা শুনে লিখবে নাকি গা...

ব্যোমকেশ। লিখব রে লিখব! সত্যি কথা লিখব। এই তেতলার ওপর থেকে ওই দূরের মানুষ ঠিকমতো দেখা যায় না...চেনা যায় না... কিন্তু তোর ওই চোখদুটোর কাছে কারো কিছু গোপন থাকে না...

(ব্যোমকেশের ফোন বেজে ওঠে।)

(ফোনে) কে? না...ভাই, এখনো হয়নি। তবে হবে, শিগগির হবে। এমন নাটক যা আগে কোনোদিন লিখিনি। হ্যাঁ হ্যাঁ... আমি ব্যোমকেশ ভৌমিক ...বহু পুরস্কার পাওয়ার পরও বলছি...ট্র্যাশ... অল বোগাস! মিনারের চুড়োয় বসে আমি এতকাল বাস্তববাদী লেখক হবার গর্ব করছিলাম। ভেঙে গেছে! এবার নতুন করে শুরু করব! ...আমার এক বন্ধু আমাকে মেটিরিয়ালস যোগান দেবে। তার মেটিরিয়ালস-এর কোনো অভাব নেই। ...সে কে? ...রংটা তার কালো... চোখ দুটো তার আরো কালো... দুটো বড়ো বড়ো ডানা আছে তার... সেই বেজায় কালো ডানায় ভর দিয়ে সে আমার ঘরে ভেসে আসে... আলতো করে তারা ডানা দুটো ঝাড়ে... আর ঝুরঝুর করে ঝরে পড়ে ঝকঝকে সব রত্ন ...সত্য নির্ভেজাল সত্য...রত্নের মতো উজ্জ্বল...উজ্জ্বল ধ্রুব সত্য! আর কিছু বলব না...এখন তোমরা অপেক্ষা করো...

(ফোন নামিয়ে ব্যোমকেশ কাকের দিকে ঘোরে।)

অ্যাদ্দিন যা লিখেছি ...নাটক নারে ...নাটক না...

কাক। (ঠান্ডা গম্ভীর গলায়) না...নাটক না।

ব্যোমকেশ। সত্যি নাটক না!

কাক।বউদির ঘরেরটা ...নাটক না...

ব্যোমকেশ। (অবুঝের মতো) কী নাটক না?

কাক। রেডিয়োর নাটক না। ঘরে একটা লোক রয়েছে...

ব্যোমকেশ। কী! কে?

কাক। রোজ দুপুরে তুমি যখন এখানে বসে লেখ, ও তখন নীচের তলায় বউদির ঘরে ঢোকে। তখন ওই চলে, তোমায় ছেড়ে বাঁচব না গা, বাঁচব না। এখনো আছে, চলো দেখবে...

(ব্যোমকেশ রক্তশূন্য মুখে চেয়ারে বসে পড়ে।)

কী হল? বসে পড়লে কেন গা? এই না বললে সত্যি খবর চাই? বুকে বল না থাকলে সত্য কথা জেনে কী করবে গা! সত্যি কথা লিখতে সাহস লাগে যে!

(ব্যোমকেশের মুখখানা বিকৃত হয়ে ওঠে।)

আরে কাঁদছ নাকি? এতেই এরকম করছ? আর আমায় দ্যাখো ...কত কষ্টে ডিম ফুটিয়ে বাচ্চাদের জন্ম দিই...কত যত্নে খাবার খুঁটে নিয়ে গিয়ে তাদের খাওয়াই...তারপর গলায় জোর পেতেই তারা একদিন ডেকে ওঠে, কুহুকুহু! ডাকতে ডাকতে কোথায় উড়ে চলে যায়। ...হ্যাঁগা হ্যাঁ, কোকিল এসে আমার বাসায় ডিম পেড়ে রেখে যায়! নিজের ভেবে পরের ডিমে তা দিই...ফোটাই...আদর করি...তারপর একদিন কুহুকুহু! দুখানা ডানা নাড়তে নাড়তে তারা চলে যায়... পিছু ফিরেও চায় না...কোন আকাশে হারিয়ে যায়...(থেমে গলায় বিষণ্ণতা ঝেড়ে ফেলে) তা বলে ভেঙে পড়লে চলবে কেন? যা সত্যি তার মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে...

(কাক ডানা দোলাতে দোলাতে বেরিয়ে গেল।)

মনোজ মিত্র : জন্ম ২২ ডিসেম্বর ১৯৩৮, খুলনা জেলার ধুলিহারে (বর্তমান বাংলাদেশে)। কলকাতার স্কটিশ চার্চ কলেজে পড়ার সময়েই সাহিত্য রচনায় হাতেখড়ি হয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শনশাস্ত্রে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। পঞ্চাশের দশক থেকেই অভিনয়, নাট্যপরিচালনা ও নাটক রচনা শুরু করেন। গঠন করেন নাট্যদল 'সুন্দরম'। সেইসঙ্গে দীর্ঘকাল অধ্যাপনাও করেছেন। প্রায় একশোর ওপর নাটক লিখেছেন। তাঁর প্রায় সব নাটকই মঞ্চস্থ হয়েছে। চাক ভাঙা মধু, মেষ ও রাক্ষস, কেনারাম বেচারাম, অলকানন্দার পুত্র কন্যা, পরবাস, নৈশভোজ, পুঁটিরামায়ণ তাঁর রচিত কয়েকটি বিখ্যাত পূর্ণাঙ্গ নাটক। *তাঁর রচিত* একাঙ্ক নাটকগুলির মধ্যে *মৃত্যুর চোখে জল, আঁখিপল্লব, মহাবিদ্যা, পাখি* প্রভৃতি অত্যন্ত জনপ্রিয়। বহু পুরস্কার ও সম্মানে সম্মানিত এই নাট্যকার পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরস্কারসহ সংগীত নাটক আকাদেমি পুরস্কার লাভ করেছেন। তিনি রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের নাটক বিভাগে 'শিশিরকুমার ভাদুড়ি' অধ্যাপক ছিলেন।

ভারতীয় গল্প

নেমকের দারোগা

মুনসি প্রেমচন্দ

যখন নতুন লবণ দপ্তর খোলা হল, আর বিধিদত্ত এই প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করা নিষিদ্ধ বলে জারি করা হল, তখন লোকেও লুকিয়ে চুরিয়ে নুনের কারবার শুরু করে দিল। নানা ধরনের ছল-চাতুরির সূত্রপাত হল, কেউ ঘুষ দিয়ে, কেউ চালাকি করে কাজ হাসিল করতে লাগল। আমলাদের পোয়াবারো। পাটোয়ারিগিরি মানসম্মানের কাজ, ছেড়েছুড়ে অনেকেই এই বিভাগের বরকন্দাজ হয়ে বসল। এই দপ্তরের দারোগার চারকির জন্যে অমন অনেক উকিল-মোক্তারেরও জিভে জল আসত। এ সেই সময়ের কথা, যখন ইংরেজি শিক্ষা আর খ্রিস্টধর্ম এই দুটোকে লোকে এক করে দেখত। এখন এ দেশে ফারসির প্রাবল্য। প্রেমের উপাখ্যান আর শৃঙ্গার রসের কাব্য পড়ে ফরাসি জানা লোকেরা তখন দেশের উচ্চতম পদে বহাল হতেন। মুনসি, বংশীধরও তাই জুলেখার বিরহ-বৃত্তান্ত সমাপ্ত করে, নল-নীলের যুদ্ধ কিংবা আমেরিকা-আবিষ্কারের তুলনায় মজনু বা ফরহাদের প্রেমকাহিনিকে অধিক গুরুত্ব দিতে শিখে, এবার রোজগারের সন্ধানে বেরোলেন। তাঁর পিতৃদেব অভিজ্ঞ পুরুষ ছিলেন। ছেলেকে বোঝালেন—বাবা, সংসারের দশা তো দেখতেই পাচ্ছ। ঋণের বোঝায় ডুবে রয়েছে। মেয়েগুলো যেন ঘাসপাতার মতন রোজ বেড়ে চলেছে। আর আমার কথা তো ছেড়েই দাও, ঝড়ে পড়া গাছ, আজ আছি কাল নেই। এখন তুমিই হলে বাড়ির আশা ভরসা। চাকরি সে চাকরিই, চাকরিতে পদমর্যাদার কথা মোটেই ভেবো না। চাকরি হল পিরের দরগা। চোখ কান খোলা রাখবে। এমন চাকরি খুঁজবে, যাতে দু'পয়সা উপরি আয় হয়। মাস-মাইনে পূর্ণিমার চাঁদ, মাসে একদিনই চোখে দেখা যায়, তারপর দিনে দিনে কমতে কমতে লোপ পেয়ে যায়। আর উপরি হল বহমান স্রোত যাতে সবসময়ের তেষ্টা মেটে। বেতন দেয় মানুষে, তাই তাতে বৃদ্ধি নেই। উপরি আমদানি ঈশ্বরের করুণার দান, তাই তাতে স্ফীতি আছে, উন্নতি আছে। তুমি স্বয়ং কৃতবিদ্য ছেলে, তোমাকে আমি কী বোঝাব। এ-সব বিষয়ে বিবেক বুদ্ধি বড়ো প্রয়োজনীয় বস্তু। মানুষকে দেখবে, তার প্রয়োজন বুঝতে চেষ্টা করবে, আর সুযোগের সদ্ব্যবহার করবে। উপরন্তু যা উচিত বুঝবে, করবে। যার গরজ আছে দেখবে তার প্রতি কঠোর আচরণে তোমার নির্ঘাত লাভ হবে। কিন্তু যে তেমন ঠেকায় পড়ে নেই, তার ওপর দাঁও মারার সুবিধে কম। এই কথাগুলো সবসময়ে খেয়াল রেখে চলো। এ আমার সারাজীবনের পুঁজি।

বংশীধর আজ্ঞাকারী ছেলে। বাপের উপদেশ আর আশীর্বাদ শিরোধার্য করে একদা বাড়ির বাইরে পদাপর্ণ করল। বিস্তীর্ণ সংসার-মরুপথে নিজের বুদ্ধি বিবেচনা, ধৈর্য আর আত্মপ্রত্যয় ছাড়া তার আর

কোনো সহায় সম্বল ছিল না। এরাই তার বন্ধু, সহযাত্রী পথ-প্রদর্শক। তবে বংশীধরের যাত্রাশুভ। অল্পদিনেই লবণ বিভাগের দারোগার কাজে বহাল হয়ে গেল। উত্তম বেতন, আর উপরির দিগন্ত অনন্তবিস্তারী। বৃদ্ধ মুনসিজির কাছে এই শুভ সংবাদ পৌঁছতে তাঁর খুশির আর ইয়ত্তা রইল না। স্থানীয় মহাজনের সুর নরম হল, শুঁড়ির দোকানের মালিকের আশালতা মঞ্জুরিত হল। প্রতিবেশীদের অনেকের হৃদ্‌যন্ত্রে শূলবেদনা দেখা দিল।

শীতকাল—তায় রাত্তির। নিমকদপ্তরের সেপাই, চৌকিদার সবাই নেশায় মশগুল। মুনসি বংশীধর এখানে এসেছেন মাস ছয়েকের বেশি হয় নি, কিন্তু ইতিমধ্যেই তাঁর আচরণ আর কর্মকুশলতায় অফিসারবর্গ মুগ্ধ হয়ে গেছেন। আমলারা তাঁর ওপর খুব বিশ্বাস রাখেন। নুনের আপিস থেকে পুব দিকে মাইল খানেকের মাথায় যমুনা নদী; নদীর ওপর নৌকো দিয়ে অস্থায়ী ধরনের পুল বাঁধা আছে। দারোগা সাহের ঘরের দোর বন্ধ করে মিঠে ঘুমে মগ্ন। হঠাৎ ঘুমটা ভেঙে গেল। চোখ মেললেন। যমুনার কল্লোল গানের বদলে কানে এল গাড়ির গড়গড় আওয়াজ, সেইসঙ্গে মাঝিমাল্লাদের কোলাহল। উঠে বসলেন। এত রাত্তিরে নদীর ওপারে গাড়ি যাচ্ছে কেন? কোথাও কিছু গোলমাল আছে নিশ্চয়। চিন্তায় সন্দেহ বেড়ে গেল। উর্দি পরে, পিস্তল পকেটে নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে পুলের ওপরে হাজির হলেন। গোরুর গাড়ির এক দীর্ঘ সারি পুল হয়ে ওপারে যাচ্ছিল। দারোগা চড়া সুরে প্রশ্ন করলেন—কার গাড়ি?

অল্পক্ষণ চুপচাপ। লোকজনদের মধ্যে একটু কানাকানি হল। তারপর সামনের গাড়ি থেকে জবাব এল—

‘পণ্ডিত অলোপিদিনের।’

‘কে পণ্ডিত অলোপিদিন?

‘দাতাগঞ্জের।’

মুনসি বংশীধর চমকে উঠলেন। পণ্ডিত অলোপিদিন এই এলাকার সবচেয়ে প্রভাবশালী জমিদার। লাখ লাখ টাকার লেনদেন, তেজারতির কারবার—এ অঞ্চলে ছোটো-বড়ো এমন লোক নেই যে তাঁর কাছে ঋণী নয়। এ ছাড়া বিরাট ফলাও ব্যবসা। অত্যন্ত প্রতিপত্তিসম্পন্ন পুরুষ। ইংরেজ অফিসার তাঁর এলাকায় শিকার করতে গেলে তাঁর আতিথ্য গ্রহণ করেন। তাঁর বাড়িতে বারো মাসেই সদাব্রত।

মুনসিজি আবার প্রশ্ন করেন—গাড়ি কোথায় যাবে? উত্তর এল—কানপুর। তখন জানতে চাইলেন গাড়িতে কী আছে। এবার সবাই নিরুত্তর। মৌনতা দারোগার সন্দেহ বাড়িয়ে দিল। কিছুক্ষণ উত্তরের অপেক্ষায় থেকে তিনি কড়া ধমক দিলেন—কী সবাই বোবা হয়ে গেলে নাকি? আমি জানতে চাইছি গাড়িতে কী মাল যাচ্ছে?

এবারেও উত্তর না পেয়ে দারোগা ঘোড়া এগিয়ে নিয়ে একটা গাড়ির গা ঘেঁষে দাঁড়ালেন। তারপর একটা বেরোতে খোঁচা দিতেই আর সন্দেহ রইল না। বস্তা ভরতি নুন।

দুই

সুসজ্জিত গো-শকটে শুয়েশুয়ে, কখনো জেগে, কখনো ঘুমিয়ে পথ অতিক্রম করছিলেন—পণ্ডিত অলোপিদিন। গাড়োয়ানরা আতঙ্কিত হয়ে এসে তাঁকে জানাল। বলল—মহারাজ দারোগা গাড়ি আটকে ঘাটে দাঁড়িয়ে আছে আর আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছে।

পণ্ডিত অলোপিদিনের লক্ষ্মীদেবীর ওপর অবিচল বিশ্বাস। উনি বলেন, পৃথিবী তো ছার, স্বর্গও লক্ষ্মীর পদানত। তাঁর কথা অভ্রান্ত। ন্যায়নীতি ইত্যাদি লক্ষ্মীরই খেলার সামগ্রী, ও সব নিয়ে তিনি যেমন খুশি নাড়াচাড়া ফেলাছাড়া করেন। পণ্ডিতজি শুয়েশুয়েই বললেন—চলো, আমি আসছি। বলে তিনি নিশ্চিন্ত মনে পান সাজলেন, পান মুখে দিলেন, তারপরে বালাপোষ গায়ে দিয়ে ধীরেসুস্থে দারোগার সামনে এসে বললেন—বাবুজির কল্যাণ হোক। বলুন, কী অপরাধ করেছি যে গরিবের গাড়ি আটক পড়ল। আমি ব্রাহ্মণ, আপনাদের কৃপাদৃষ্টিই আমাদের সম্বল।

দারোগা রুক্ষ ভঙ্গিতে সংক্ষেপে বলেন—সরকারি হুকুম।

অলোপিদিন হেসে ওঠেন। বলেন—আমরা সরকারি হুকুমও বুঝি না আর সরকারকেও চিনি না। আমাদের সরকার আপনিই। আর এ হল আপনার-আমার ঘরের কথা, আমি তো আপনার হাতের মুঠোর লোক। আপনি মিছিমিছি কষ্ট করলেন। এই পথে যাব আর এই ঘাটের দেবতাকে পুজো দেব না—এ কখনো হতে পারে? আমি তো আপনার দর্শনে নিজে থেকেই আসতুম। ঐশ্বর্যের মোহন বাঁশির সুর বংশীধরের কানের পাশে বাজছে। কিন্তু বংশীধর তার কুহকে ভুলল না। নীতিনিষ্ঠার এক নতুন নেশায় সে আবিষ্ট। উদ্ধত স্বরে বলল—যে-সব নেমকহারামদের পয়সা দিয়ে কেনা যায়, আমি তাদের দলে নই। আপনাকে গ্রেপ্তার করা হল। তারপর নিয়ম মাফিক আপনাকে চালান দেব। ব্যস, আমার বেশি কথা বলার ফুরসত নেই। জমাদার বদলু সিং। এঁকে হাজতে নিয়ে যাও, আমি হুকুম দিচ্ছি।

পণ্ডিত অলোপিদিন স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। গাড়োয়ানদের ভেতর সাড়া পড়ে গেল। পণ্ডিতজি জীবনে সম্ভবত এই প্রথমবার এরকম কড়া কথা শুনলেন। বদলু সিং এগিয়ে এসেছিল, কিন্তু পণ্ডিতজির প্রতাপের কথা স্মরণ করে তাঁকে গায়ে গাত দিতে তার সাহসে কুলোল না। এমন হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলতে পণ্ডিতজি কখনো কাউকে দেখেননি। অনুমান করলেন—ছেলেমানুষ, এখনো মায়ামোহের ফাঁদে পড়েনি, নিতান্ত নাবালক, তাই সংকোচ করছে। তিনি অত্যন্ত দীন ভাবে বললেন, বাবুসাহেব এরকম করবেন না, তা হলে আমি একেবারে ধুলোয় মিশে যাব। ইজ্জত মাটিতে লুটোবে। আমায় অপমান করে আপনার তো কোনো লাভ হবে না। আমি আপনার বাইরের লোক নই।

বংশীধর কঠোর স্বরে বলল—আমি এ-সব কথা শুনতে চাই না।

পাথর ভেবে যে মাটিতে অলোপিদিন পা রেখে দাঁড়িয়েছিলেন, এখন তা ভিজে বালির মতন পায়ের তলা থেকে সরে যাচ্ছে। তাঁর ধন সম্মান আভিজাত্যের অহংকারে প্রচণ্ড আঘাত লেগেছে। কিন্তু

এখনো মুদ্রার সর্বব্যাপিতার শক্তিতে তাঁর পুরোপুরি আস্থা। নিজের খাজাঞ্চিকে ডেকে বলেন—লালাজি, এক হাজার নোট এনে বাবুসাহেবকে ভেট দাও। ওঁর এখন সিংহের খিদে—বংশীধর উত্তপ্ত হয়ে বললেন—হাজার কেন লাখ টাকা দিয়েও কেউ আমায় ন্যায়ের পথ থেকে নড়াতে পারবে না।

দার্ঢ্যের এ কী রকম নির্বুদ্ধিতা! এই দেবদুর্লভ ত্যাগের চেহারা ঐশ্বর্যকে ভাবিয়ে তোলে। এবার দুই শক্তির খোলাখুলি দ্বৈরথে সংগ্রাম শুরু হয়ে গেল। অর্থের ঘন ঘন ছোবল—এক থেকে পাঁচ, পাঁচ থেকে দশ ...পনেরো ...বিশ হাজারে চড়ে গেল। তবুও ন্যায়ধর্ম একা ওই অসংখ্য শত্রুর সঙ্গে পর্বতের মতো অটল থেকে বুঝে চলল।

অলোপিদিন নৈরাশ্যের সুরে বললেন—আর এর বেশি বলার আমার সাহস নেই। আপনার যা বিচার হয় করুন।

দারোগা জমাদারকে ইশারা করলে, জমাদার মনে মনে তার মুণ্ডপাত করতে করতে সম্ভ্রান্ত আসামির দিকে এগোল। পণ্ডিত এবার সত্যি ঘাবড়ে গেলেন। দু-তিন পা পিছিয়ে কাতর মিনতি করলেন—বাবুসাহেব, আমায় দয়া করুন, ভগবানের দোহাই, আমি পঁচিশ হাজার পর্যন্ত উঠতে রাজি আছি, মিটমাট করে নিন।

‘অসম্ভব।’

‘তিরিশ হাজার!’

‘কোনো মতেই নয়।’

‘তবে, চল্লিশ হাজার, তাতেও না?’

বংশীধর জমাদারকে বলে—বদলু সিং, এই লোকটিকে এখনই হাজতে পোরো। আর একটা কথা নয়।

ধর্ম অর্থকে দুপায়ে মাড়িয়ে গেল। অলোপিদিন দেখছেন—একটা সুপুষ্ট বলিষ্ঠ হাতে হাতকড়া ধরা, আর সে হাতটা তাঁর দিকে এগিয়ে আসছে...তাঁর দিকেই। ব্যাকুল নিরাশা নিয়ে চারদিকে তাকালেন পণ্ডিতজি। তারপর হঠাৎ মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেলেন।

তিন

পৃথিবী ঘুমোয়, তার জিভ জেগে থাকে। তাই সক্কাল হতে না হতেই ছেলে বুড়ো সকলের মুখেই জিভ নড়তে দেখা গেল। সকলের মুখেই ওই এক কথা। পণ্ডিত অলোপিদিনের কুকীর্তির ওপর হাজার রকম টীকা টিপ্পনী, রাশি রাশি নিন্দা বর্ষণ, যেন ইহসংসারে আর পাপতাপ অন্য কোথাও নেই। যেন যা ঘটেছে সেটা একটা বিরল ব্যতিক্রম। যে গয়লা দুধ বলে জল বেচে, যে আমলা মিথ্যে ডায়ারি লেখে, যে মহাপুরুষ বিনা টিকিটে তীর্থযাত্রা করেন, যে শ্রেষ্ঠীর অপর নাম সাধু অথচ দলিল জাল করাই যার পেশা, আজ সকালে তারা সবাই সমবেতভাবে দেবমানবের ভঙ্গি ধরে ঘট্ ঘট্ করে ঘনঘন ঘাড় নাড়াচ্ছেন—‘তাই তো, তাই তো করছেন। পরদিন যখন অতিভুক্ত পণ্ডিতজি থানার কনস্টেবলের পাহারায়, হাতে হাতকড়ি,

হৃদয়ে গ্লানি আর ক্ষোভ নিয়ে, উঁচু মাথা হেঁট করে গিয়ে আদালতে উঠলেন, তখন তার পেছনে সারা শহর ভেঙে পড়ল। বড়ো বড়ো মেলাতেও এরকম উৎসুক জনতার ভিড় দেখা যায় না। ছাতে আর দেয়ালে তফাত ধরা যায় না।

এজলাসে পণ্ডিতজির উপস্থিতিটুকুর বিলম্বে ছিল। তারপরেই তিনি যথাপূর্বং ঐশ্বর্যের সিংহদ্বারে দাঁড়িয়ে। রাজপুরুষবর্গ তাঁর স্তাবক, আমলারা তাঁর সেবক, উকিল-মোক্তারেরা তাঁর আজ্ঞাবাহক, আর আরদালি-চাপরাসি-চৌকিদারের দল তো তাঁর বিনা মাইনেয় খাটা হুকুমের গোলাম। তাঁকে দেখবার সঙ্গে সঙ্গে লোকজন চারদিকে থেকে দৌড়ে এল। সবাই হতবাক্। বিস্ময়ের হেতু হল—এ হেন কৃতী পুরুষ কেমন করে আইনের ফাঁদে পড়লেন। যার অফুরন্ত ধনাগার অসাধ্য সাধনে সক্ষম, যার বাক্‌চাতুর্য অনন্য ও অনন্ত ক্ষমতার অধিকারী, সে কিনা কাঠগড়ায় দাঁড়াতে আসে! প্রত্যেকে সহানুভূতিপ্রবণ হয়ে ওঠে। তাঁকে এই আক্রান্ত অবস্থা থেকে ত্রাণ করার জন্য উকিলসেনা মুহূর্তে তৎপর হয়ে ওঠে। ন্যায়ের রণাঙ্গণে ধর্ম আর অর্থের দ্বিতীয় দফা সংঘর্ষ বেধে ওঠে।

বংশীধর একদিকে চুপচাপ দাঁড়িয়ে। সত্য ছাড়া আর কোনো বল নেই তার, স্পষ্টভাষণ ছাড়া নেই কোনো হাতিয়ার। সাক্ষী ছিল, কিন্তু লোভে টলবল করছে। এমন-কি, এখন ন্যায়ের রশিতেও টান পড়েছে, তারও ঝোঁক কিছুটা অন্যপক্ষের দিকে—বংশীধরের উপলব্ধি হয়। দরবার ন্যায়ের, কিন্তু কর্মীমণ্ডলীর ওপরে পক্ষপাতের নেশা তার ঘনছায়া বিস্তার করে আছে। কিন্তু পক্ষপাত আর ন্যায়ের জোড় বাঁধে কী ভাবে। এ তো অকল্পনীয় সহাবস্থান!

মামলা শেষ হতে দেরি লাগল না। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট তাঁর রায়ে লিখলেন, পণ্ডিত অলোপিদিনের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ ভিত্তিহীন ও অপ্রমাণিত। উনি একজন সম্ভ্রান্ত নাগরিক। সামান্য লাভের জন্য উনি এমন দুষ্কৃতিতে লিপ্ত হবেন এটা কল্পনাতীত। বিভাগীয় দারোগার দোষের মাত্রা যদিও বেশি নয়, তবু তাঁর হঠকারিতা ও অবিবেচকপ্রসূত কাজের ফলে একজন নির্দোষ ও সম্মানিত ব্যক্তিকে অযথা হয়রানি ভোগ করতে হয়েছে। সে তার কর্তব্যে সজাগ ও সচেতন এটা যেমন আদালতকে সন্তুষ্ট করেছে, তেমনই তার বিচারবুদ্ধির দৈন্য ও হঠকারিতার জন্যে আমি তাকে ভর্ৎসনা করা প্রয়োজন মনে করছি।

উকিলরা রায় শুনে উচ্ছল হল। পণ্ডিতজি হাসতে হাসতে বেরিয়ে এলেন। কুটুম্বস্বজন ও বন্ধু বান্ধবদের মধ্যে টাকার হরির লুঠ হল। অগাধ ধনরাশির অকৃপণ বিতরণের বীচিভঙ্গে আদালতের ভিত নড়ে গেল। বংশীধর বাইরে পা রাখতেই চারধার থেকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের ধারাপাত হতে লাগল। চাপরাসিরা ঝুঁকে পড়ে সেলাম জানাল। কিন্তু প্রতিটি পরিহাস, প্রতিটি কটুভাষ এক-একটি সাংকেতিক অপমান বংশীধরের আত্মপ্রসাদকে আরো স্ফীত, তার চিত্তের মহিমাকে আরো সংবর্ধিত করে তুলল। মামলায় ওর জিত হলেও সম্ভবত ও এমন দৃপ্ত গর্বে পথ চলতে পারত না। আজ ওর এক অপূর্ব জ্ঞানের উন্মেষ হয়েছে। ও আজ এইমাত্র উপলব্ধি করল যে, ন্যায় আর বিদ্যাবত্তা, বর্ণবহুল উপাধি, বড়ো দাড়ি আর ঢোলা আচকান—কিছুই আসলে শ্রদ্ধা-সম্মানের প্রকৃত পাত্র নয়।

বংশীধর বিত্তের সঙ্গে শত্রুতা সেধেছে, তার অনিবার্য মূল্যও তাকে ধরে দিতে হল। এক সপ্তাহ কাটতে না কাটতেই সাময়িক বরখাস্তের পরোয়ানা (সাসপেনসনের নোটিশ) এল। কর্তব্যপরায়ণতার শাস্তি। ক্ষোভে শোকে ভগ্নহৃদয় বংশীধর বাড়ি ফিরে এল। ছেলে বাড়ি ফেরার আগে থেকেই বাপ রাগে চিড়বিড় করছিলেন, এত করে বোঝালুম একটা কথা শুনল না। যা খুশি তাই করে বসল। এদিকে আমি শুঁড়ি আর কসাইয়ের তাগাদার জ্বালায় বুড়ো বয়সে ভক্ত সেজে নিরমিষ্যি মেরে বসে রয়েছি। আর ছেলে আমার সাধু। শুকনো কটা মাইনের টাকা ঠকঠক করছে। আরে বাপু আমিও তো চাকরি করেছি। আর এমন-কিছু পদস্থ উজির-নাজিরও ছিলুম না। কিন্তু যতদিন কাজ করেছি চুটিয়ে রোজগার করেছি। আর বাবু আমার ইমানদার হতে চলেছেন। সাধুতার ভূতে পেয়েছে। ঘরে আঁধার মসজিদে দেয়ালি জ্বালবেন! কী আক্কেল বিবেচনা, ঘেন্না ধরে যায়। দুর দুর, এদের লেখাপড়া শেখানো পন্ডশ্রম। আবার এর ওপর যখন কদিন বাদেই বংশীধর বাড়ি এল, আর বাপ সব খবর শুনলেন, তখন তো বুড়ো একেবারে মাথা মুড় খুঁড়তে লাগল। বলে, ইচ্ছে করছে এক নোড়ার বাড়িতে তোমার আর আমার দুটো মাথাই ফাটিয়ে ফেলি। তার আফসোস আর হাত-কামড়ানো বহুক্ষণ যাবৎ থামে না। যাচ্ছেতাই গালাগাল চলতে থাকে। শেষকালে বাপের আক্ষেপ সইতে না পেরে বংশীধর সেখান থেকে সরে আসে। বৃদ্ধা মার দুঃখও কম নয়। জগন্নাথধাম আর রামেশ্বর যাত্রার সাধু ধুলোয় মিশে গেল। বংশীধরের শ্রীমতী তো কদিন যাবত মুখ তুলে কথাই বলল না।

এইভাবে আরো এক সপ্তাহ কাটল। সেদিন সন্ধের সময় বুড়ো মুনসি বসে বসে রামনাথের মালা জপছেন। এমন সময় সদর দোরে একটা সাজানো-গোছানো রথ এসে থামল। সবুজ আর গোলাপি পরদা ঝুলছে, পশ্চিমা বদলজুড়ি, তাদের গলায় নীল ফিতে শিং পেতলে বাঁধানো। সঙ্গে লাঠি-কাঁধে চাকর বেহারা। মুনসিজি তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেলেন। গিয়ে দেখলেন পণ্ডিত অলোপিদিন। নত হয়ে সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ হলেন। তারপর পঞ্চমুখে তোষামোদ গুণকীর্তণ শুরু করলেন : আমার কী ভাগ্যোদয় হল যে আজ এই কুঁড়েঘর আপনার চরণধূলি পড়ল। আপনি আমাদের পূজ্য, আমাদের দেবতা, কিন্তু কোন্ লজ্জায় আপনাকে মুখ দেখাব। আমার অভাগা অকালকুষ্মাণ্ড কুপুত্র আমার মুখে কালি মেড়ে দিয়েছে। নইলে আজ আমার কত আনন্দের দিন যে আপনার আবির্ভাব হয়েছে। কী করব। তাই ভগবানকে বলি, সাতজন্ম নিঃসন্তান রাখুন, এমন দুর্মতি সন্তান দেবার চেয়ে—

বাধা দিয়ে অলোপিদিন বলেন— না না দাদা, অমন কথা বলবেন না।

মুনসী— এমন কুসন্তানকে আর কী বলব বলুন?

বাৎসল্যমাখা গলায় পণ্ডিতজি বললেন—কুসন্তান আপনি কাকে বলছেন? কুলতিলক বলুন। কীর্তিমান, বংশের মুখোজ্জ্বলকারী এমন ধর্মপরায়ণ কটা মানুষ এ সংসারে আছে, আমায় দেখান তো, যে ধর্মের জন্যে, ন্যায় নীতির জন্যে নিজের সর্বস্ব বিসর্জন দিতে পারে?

তারপর বংশীধরের দিকে ফিরে বললেন— দারোগা সাহেব, একে খোসামোদ বলে ভাববেন না। খোসমোদ করার জন্যে আমার এত কষ্ট করে আসার দরকার ছিল না। সেদিন রাত্তিরে আপনি আপনার

ক্ষমতাবলে আমায় কয়েদ করেছিলেন, আজ স্বেচ্ছায় আপনাদের কাছে কয়েদ হতে এসেছি। আমি জীবনে হাজার হাজার মান্য-গণ্য আমির-ওমরা দেখেছি, কয়েক হাজার রাজপুরুষের সঙ্গ করেছি। তাদের সবাইকে আমি টাকা দিয়ে বশ করেছি, আমার কেনা গোলাম বানিয়ে ছেড়েছি। একমাত্র আপনি আমায় হারিয়ে দিয়েছেন। তাই আমায় অনুমতি দিন আজ আপনার কাছে একটি প্রার্থনা নিয়ে এসেছি।

অলোপিদিনকে আসতে দেখে বংশীধর উঠে দাঁড়িয়ে আপ্যায়ন করেছিল। কিন্তু নিজের আত্মসম্ভ্রম বজায় রেখেই। মনে ভেবেছিল লোকটা তাকে লজ্জা দিয়ে অপদস্থ করতেই এসেছে। তাই ক্ষমা প্রার্থনার ধার দিয়েও যায়নি। বরং বাপের ওই রকম পায়ে-তেলানো কথাবার্তা শুনে তার গায়ে জ্বালা ধরে যাচ্ছিল। কিন্তু এখন পণ্ডিতজির কথা শুনে ওর মনের গ্লানি কেটে গেল। পণ্ডিতজির মুখের দিকে চকিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখল অকপট সৌজন্যের আভাস। বংশীধরের মন গলে গেল। এবার লজ্জা এসে তার গর্বকে ভাসিয়ে দিল। লজ্জিত কণ্ঠে বললে— এ আপনার উদারতা, আমায় লজ্জা দেবেন না। আমার ঔদ্ধত্য ক্ষমা করবেন। সেদিন যা করেছি কর্তব্যের দায়ে, নইলে এমনিতে আমি আপনার দাস। আপনার আদেশ আমার শিরোধার্য।

অলোপিদিন বিনীত স্বরে বললেন— নদীর ধারে সেদিন আপনি আমার প্রার্থনা নামঞ্জুর করেছিলেন, কিন্তু আজ মঞ্জুর করতেই হবে।

বংশীধর বলল, আমরা কীসের যোগ্যতা, তবু আমার সাধ্যমতো আপনার সেবায় ত্রুটি হবে না।

পণ্ডিতজি একটা স্ট্যাম্প লাগানো কাগজ তার সামনে রেখে বসলেন—এই পদটি আপনি গ্রহণ করুন আর কাগজে স্বাক্ষর করে দিন। আমি ব্রাহ্ম ণ, ভিক্ষা না পেলে আপনার দরজা থেকে নড়ব না।

মুনসি বংশীধর কাগজটা পড়ল, কৃতজ্ঞতায় তার চোখে জল এসে গেল। পণ্ডিত অলোপিদিন তাকে তাঁর সমগ্র সম্পত্তির স্থায়ী ম্যানেজার নিযুক্ত করছেন। বার্ষির বেতন ছ'হাজার টাকা, অতিরিক্ত দৈনিক খরচ আলাদা, যাতায়াতের জন্য ঘোড়া, বাস করার জন্যে বাংলো, চাকর-পেয়াদা। কম্পিত স্বরে বলে—আপনার উদারতার প্রশংসা ভাষায় ব্যক্ত করব, সে সাধ্য নেই। এত উঁচু পদের যোগ্যতাও আমার নেই।

অলোপিদিন হেসে বললেন—আমার এখন একটি অযোগ্য লোকেরই নিতান্ত প্রয়োজন ভাই।

বংশীধর গম্ভীর হল। বললে—দেখুন, আমি এমনিতেই আপানার সেবক। আপনার মতো কীর্তিমান সজ্জন পুরুষের সেবা করা আমার সৌভাগ্য। কিন্তু এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্যে একজন প্রকৃত গুণবান ও অভিজ্ঞ ব্যক্তি দরকার। আমার সে বিদ্যে নেই, সে বুদ্ধিও নেই আবার এমন স্বভাবও নয় যে বিদ্যেবুদ্ধির অপূর্ণতা সামলে নেব।

কলমদান থেকে কলম বের করে অলোপিদিন বংশীধরের হাতে দিয়ে বললেন—বিদ্যাবত্তা, অভিজ্ঞতা, কর্মকুশলতা এ সব কিছুর আমার চাহিদা নেই। এ সব গুণের মহত্বের পরিচয় আমি ঢের পেয়েছি। আমরা সৌভাগ্য এমন একটি রত্নের সন্ধান আমি পেয়েছি যার কাছে যোগ্যতা বা বিদ্যাবত্তার সব জলুস ম্লান হয়ে যায়। এই নিন কলম, বেশি ভাবনা চিন্তা করবেন না, নামটা সই করে দিন। পরমেশ্বরের চরণে

প্রার্থনা করি, যেন তিনি আপনাকে সারা জীবন সেই নদীর ধারের অনমনীয় উদ্ধত, কঠোর অথচ ন্যায়নিষ্ঠ দারোগা করেই রাখেন।

বংশীধরের চোখ ছলছল করতে লাগল। এতটা মহানুভবতা তার হৃদয়ের ছোটো পাত্রে ধরছিল না। সে আর-একবার পণ্ডিতজির দিকে তাকাল—সে চোখে শ্রদ্ধার নম্র মৌন ভাষা। তারপর কম্পিত হাতে নিযুক্তির স্বীকৃতি পত্রে স্বাক্ষর করে দিল।

উৎফুল্ল অন্তরে অলোপিদিন তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

মুনসি প্রেমচন্দ (১৮৮০ -১৯৩৬) : জন্ম বেনারসের কাছে লামহি। প্রকৃত নাম, ধনপত রাই, কিন্তু ছদ্মনাম প্রেমচন্দ হিসেবেই পরিচিত। তিনি বিশ শতকের প্রথম পর্বে আধুনিক হিন্দি সাহিত্যের অন্যতম রূপকার ছিলেন। তাঁর উপন্যাস ও ছোটোগল্পে দেশপ্রেম ও সমাজচেতনার প্রতিফলন বিশেষ লক্ষণীয়। হিন্দি ও উর্দুতে তিনি চোদ্দোটি উপন্যাস এবং তিনশোর কাছাকাছি ছোটোগল্প রচনা করেন। ভারতীয় কৃষকসমাজের করুণ জীবনযাত্রা তাঁর অধিকাংশ রচনার উপজীব্য। *শতরঞ্জ কি খিলাড়ি, কফন, বাড়ি ঘর কি বেটি* ইত্যাদি ছোটোগল্প; *গোদান, কর্মভূমি, নির্মলা* প্রভৃতি বেশ কিছু উপন্যাস তিনি রচনা করেন। ছোটোদের জন্য তাঁর প্রখ্যাত রচনা 'কুত্তে কী কহানী', 'জঙ্গল কী কহানিয়াঁ', 'মন মদোক'। তাঁর গল্পের অনুবাদ হিসেবে মিঠু, পাগলা হাতি, বাঘ ও বালক, কজাকী, ডাংগুলি, বড়দা, দুই বলদের গল্প, অভুজ বন্ধু, একটি কুকুরের কাহিনি, পৌষের রাত, নুনের দারোগা প্রভৃতি অত্যন্ত জনপ্রিয়।

ভারতীয় কবিতা

পৃথিবী আমার কবিতা

হীরেন ভট্টাচার্য

কলম আমার কামারের হাতের হাতুড়ি, ভেঙে পিটে গড়ে নিই শব্দ,
কৃষকের ফাল যেন চোখা, সীরালায় সোনার সীতা,
মিস্ত্রির করাত যেন বূঢ়, কঠিন কাঠের আঁশ ছিঁড়ে টেনে আনি
অভিজ্ঞতার রক্ত-লাগা শব্দ, সাঁওতাল মরদের ধনুকের তির যেন
লক্ষ্যভেদী এক একটা শব্দ আমার রক্ত-মাংস ইচ্ছায় তীব্র হয়ে ওঠে
ওদের কোনোটা পাহাড়ের মতো উদ্ধত, কোনোটা নদীর মতো নত,
আর কোনোটা বা হ্রদের মতো গম্ভীর—
কারো কথায় ওঠ-বস করে না।

নদ-নদী-পর্বত চিত্রিত বিপুল মহাদেশের আমি কবি,
পৃথিবী আমার কবিতা।

হীরেন ভট্টাচার্য (১৯৩২-২০১২) : জন্ম জোরহাট, অসম। তিনি ছিলেন অসমিয়া ভাষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। বহু পুরস্কার ও সম্মানে ভূষিত হয়েছেন। অসমিয়া সাহিত্যে তিনি 'প্রেম আরু রোদালির কবি' হিসেবে সুপরিচিত। পিতা তীর্থনাথ ভট্টাচার্য কারাধ্যক্ষ ছিলেন। তাঁর জীবিকার সূত্রে কবি ছোটোবেলা থেকে আসামের নানা জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছেন, যা তাঁকে কবিতা লেখার প্রেরণা জুগিয়েছে। কবিতা রচনার পাশাপাশি তিনি *চিত্রবন, মনন, আন্তরিক, প্রান্তিক* প্রভৃতি পত্র-পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ : *রৌদ্র কামনা, কবিতার রোদ, তোমার ভাই, মোর দেশ আরু মোর প্রেমর কবিতা, মোর প্রিয় বর্ণমালা, ভালপুয়ার বুকা মাটি* প্রভৃতি। তিনি ভারতীয় ভাষা পরিষদ পুরস্কার, রাজাজি পুরস্কার, সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার, আসাম উপত্যকা সাহিত্য পুরস্কারসহ বিবিধ পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন।

পূর্ণাঙ্গ সহায়ক গ্রন্থ

রবীন্দ্রনাথের গল্প

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) : জন্ম কলকাতার জোড়াসাঁকোয়। তিনি একাধারে কবি, ঔপন্যাসিক, গল্পকার, নাট্যকার, প্রাবন্ধিক ও গীতিকার। বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রধান রূপকারদের একজন। শিক্ষা বিষয়ে তাঁর বৈপ্লবিক চিন্তা জন্ম দিয়েছিল শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম বিদ্যালয়ের, যা পরে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ পায়। ১৯১৩ সালে তিনি সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান। অন্ধ গোঁড়ামির বিরোধিতা ও নতুন ভাবনাকে স্বাগত জানানো তাঁর লেখার বৈশিষ্ট্য। মাত্র ষোলো বছর বয়স থেকেই রবীন্দ্রনাথ *ভারতী*, *হিতবাদী*, *সাধনা* প্রভৃতি পত্রিকার জন্য ছোটোগল্প লিখতে শুরু করেন। শিলাইদহে (বর্তমানে বাংলাদেশে) জমিদারি পরিদর্শনকালে তিনি খুব কাছ থেকে গ্রামীণ বাংলা ও সাধারণ মানুষের জীবন পর্যবেক্ষণ করেন। গ্রামবাংলার সাধারণ জীবনের সেই অপরূপতা ফুটে উঠেছে তাঁর বিভিন্ন ছোটোগল্পে। তাঁর লেখা ছোটোগল্পগুলির মধ্যে রয়েছে *দেনাপাওনা*, *কাবুলিওয়ালা*, *গুপ্তধন*, *খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন*, *ক্ষুধিত পাষাণ*, *ছুটি*, *ল্যাবরেটরী*, *সুভা*, *নষ্টনীড়*, *অতিথি*, *খাতা*, *হৈমন্তী*, *বলাই*, *পোস্টমাস্টার*, *মধ্যবর্তিনী* প্রভৃতি। তাঁর রচিত ছোটোগল্পগুলি ‘গল্পগুচ্ছ’ সংকলনগ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। গল্পগুচ্ছ থেকে চারটি গল্প—‘গুপ্তধন’, ‘দর্পহরণ’, ‘খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন’ এবং ‘সুভা’ এখানে দেওয়া হল।

গুপ্তধন

১

অমাবস্যার নিশীথ রাত্রি। মৃত্যুঞ্জয় তান্ত্রিক মতে তাহাদের বহুকালের গৃহদেবতা জয়কালীর পূজায় বসিয়াছে। পূজা সমাধা করিয়া যখন উঠিল তখন নিকটস্থ আমবাগান হইতে প্রত্যুষের প্রথম কাক ডাকিল।

মৃত্যুঞ্জয় পশ্চাতে ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ রহিয়াছে। তখন সে একবার দেবীর চরণতলে মস্তক ঠেকাইয়া তাঁহার আসন সরাইয়া দিল। সেই আসনের নীচে হইতে একটি কাঁঠালকাঠের বাক্স বাহির হইল। পৈতায় চাবি বাঁধা ছিল। সেই চাবি লাগাইয়া মৃত্যুঞ্জয় বাক্সটি খুলিল। খুলিবা মাত্রই চমকিয়া উঠিয়া মাথায় করাঘাত করিল।

মৃতুঞ্জয়ের অন্দরের বাগান প্রাচীর দিয়া ঘেরা। সেই বাগানের এক প্রান্তে বড়ো বড়ো গাছের ছায়ার অন্ধকারে এই ছোটো মন্দিরটি। মন্দিরে জয়কালীর মূর্তি ছাড়া আর কিছুই নাই; তাহার প্রবেশদ্বার একটিমাত্র। মৃত্যুঞ্জয় বাক্সটি লইয়া অনেকক্ষণ নাড়াচাড়া করিয়া দেখিল। মৃত্যুঞ্জয় বাক্সটি খুলিবার পূর্বে তাহা বন্ধই ছিল। কেহ তাহা ভাঙে নাই। মৃত্যুঞ্জয় দশবার করিয়া প্রতিমার চারি দিকে ঘুরিয়া হাতড়াইয়া দেখিল—কিছুই পাইল না। পাগলের মতো হইয়া মন্দিরের দ্বার খুলিয়া ফেলিল—তখন ভোরের আলো ফুটিতেছে মন্দিরের চারিদিকে মৃত্যুঞ্জয় ঘুরিয়া বৃথা আশ্বাসে খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল।

সকালবেলাকার আলোক যখন পরিস্ফুট হইয়া উঠিল তখন সে বাহিরের চণ্ডীমণ্ডপে আসিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল। সমস্ত রাত্রি অনিদ্রার পর ক্লান্ত শরীরে একটু তন্দ্রা আসিয়াছে, এমন সময়ে হঠাৎ চমকিয়া উঠিয়া শুনিল, 'জয় হোক, বাবা।'

সন্মুখে প্রাঙ্গণে এক জটাজুটধারী সন্ন্যাসী। মৃত্যুঞ্জয় ভক্তিভরে তাঁহাকে প্রণাম করিল। সন্ন্যাসী তাঁহার মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ করিয়া কহিলেন, 'বাবা, তুমি মনের মধ্যে বৃথা শোক করিতেছ।'

শুনিয়া মৃত্যুঞ্জয় আশ্চর্য হইয়া উঠিল—কহিল 'আপনি অন্তর্যামী, নহিলে আমার শোক কেমন করিয়া বুঝিলেন। আমি তো কাহাকেও কিছু বলি নাই।'

সন্ন্যাসী কহিলেন, 'বৎস, আমি বলিতেছি, তোমার যাহা হারাইয়াছে সেজন্য তুমি আনন্দ করো, শোক করিয়ো না।'

মৃত্যুঞ্জয় তাঁহার দুই পা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, 'আপনি তবে তো সমস্তই জানিয়াছেন—কেমন করিয়া হারাইয়াছে, কোথায় গেলে ফিরিয়া পাইব, তাহা না বলিলে আমি আপনার চরণ ছাড়িব না।'

সন্ন্যাসী কহিলেন, 'আমি যদি তোমার অমঙ্গল কামনা করিতাম তবে বলিতাম। কিন্তু ভগবতী দয়া করিয়া যাহা হরণ করিয়াছেন সেজন্য শোক করিয়ো না।'

মৃত্যুঞ্জয় সন্ন্যাসীকে প্রসন্ন করিবার জন্য সমস্তদিন বিবিধ উপচারে তাঁহার সেবা করিল। পরদিন প্রত্যুষে নিজের গোহাল হইতে লোটা ভরিয়া সফেন দুগ্ধ দুহিয়া লইয়া আসিয়া দেখিল, সন্ন্যাসী নাই।

২

মৃত্যুঞ্জয় যখন শিশু ছিল, যখন তাহার পিতামহ হরিহর একদিন এই চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া তামাক খাইতেছিল, তখন এমনি করিয়াই একটি সন্ন্যাসী 'জয় হোক, বাবা' বলিয়া এই প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। হরিহর সেই সন্ন্যাসীকে কয়েকদিন বাড়িতে রাখিয়া বিধিমতো সেবার দ্বারা সন্তুষ্ট করিল।

বিদায়কালে সন্ন্যাসী যখন জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বৎস, তুমি কী চাও,' হরিহর কহিল, 'বাবা যদি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন তবে আমার অবস্থাটা একবার শুনুন। এতকাল এই গ্রামে আমরা সকলের চেয়ে বর্ধিষ্ণু ছিলাম। আমার প্রপিতামহ দূর হইতে কুলীন আনাইয়া তাঁহার এক কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন। তাঁহার সেই দৌহিত্রবংশ আমাদিগকেই ফাঁকি দিয়া আজকাল এই গ্রামে বড়োলোক হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের এখন অবস্থা ভালো নয়, কাজেই ইহাদের অহংকার সহ্য করিয়া থাকি। কিন্তু আর সহ্য হয় না। কী করিলে আবার আমাদের বংশ বড়ো হইয়া উঠিবে সেই উপায় বলিয়া দিন, সেই আশীর্বাদ করুন।'

সন্ন্যাসী ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, 'বাবা, ছোটো হইয়া সুখে থাকো। বড়ো হইবার চেষ্টায় শ্রেয় দেখি না।'

কিন্তু হরিহর তবু ছাড়িল না, বংশকে বড়ো করিবার জন্য সে সমস্ত স্বীকার করিতে রাজি আছে।

তখন সন্ন্যাসী তাহার ঝুলি হইতে কাপড়ে মোড়া একটি তুলট কাগজের লিখন বাহির করিলেন। কাগজখানি দীর্ঘ, কোষ্ঠীপত্রের মতো গুটানো। সন্ন্যাসী সেটি মেজের উপর খুলিয়া ধরিলেন। হরিহর দেখিল, তাহাতে নানপ্রকার চক্রে নানা সাংকেতিক চিহ্ন আঁকা; আর সকলের নিম্নে একটি প্রকাণ্ড ছড়া লেখা আছে, তাহার আরম্ভটা এইরূপ :

পায়ে ধরে সাধা।
রা নাহি দেয় রাধা।।
শেষে দিল রা,
পাগোল ছাড়ো পা।।
তেঁতুল-বটের কোলে
দক্ষিণে যাও চলে।।
ঈশানকোনে্ ঈশানী,
কহে দিলাম নিশানী।। ইত্যাদি।

হরিহর কহিল, 'বাবা কিছুই তো বুঝিলাম না।'

সন্ন্যাসী কহিলেন, 'কাছে রাখিয়া দাও, দেবীর পূজা করো। তাঁহার প্রসাদে তোমার বংশে কেহ-না কেহ এই লিখন বুঝিতে পারিবে। তখন সে এমন ঐশ্বর্য পাইবে জগতে যাহার তুলনা নাই।'

হরিহর মিনতি করিয়া কহিল, 'বাবা কি বুঝাইয়া দিবেন না।'

সন্ন্যাসী কহিলেন, 'না, সাধনা দ্বারা বুঝিতে হইবে।'

এমন সময় হরিহরের ছোটো ভাই শংকর আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া হরিহর তাড়াতাড়ি লিখনটি লুকাইবার চেষ্টা করিল। সন্ন্যাসী হাসিয়া কহিলেন, 'বড়ো হইবার পথের দুঃখ এখন হইতেই শুরু হইল। কিন্তু গোপন করিবার দরকার নাই। কারণ, ইহার রহস্য কেবল একজনমাত্রই ভেদ করিতে পারিবে,

হাজার চেষ্টা করিলেও আর-কেহ তাহা পারিবে না। তোমাদের মধ্যে সেই লোকটি যে কে, তাহা কেহ জানে না। অতএব ইহা সকলের সম্মুখেই নির্ভয়ে খুলিয়া রাখিতে পার।'

সন্ন্যাসী চলিয়া গেলেন। কিন্তু হরিহর এ কাগজটি লুকাইয়া না রাখিয়া থাকিতে পারিল না। পাছে আর কেহ ইহা হইতে লাভবান হয়, পাছে তাহার ছোটো ভাই শংকর ইহার ফলভোগ করিতে পারে, এই আশঙ্কায় হরিহর এই কাগজটি একটি কাঁঠালকাঠের বাক্সে বন্ধ করিয়া তাহাদের গৃহদেবতা জয়কালীর আসনতলে লুকাইয়া রাখিল। প্রত্যেক অমাবস্যায় নিশীথরাত্রে দেবীর পূজা সারিয়া সে একবার করিয়া সেই কাগজটি খুলিয়া দেখিত, যদি দেবী প্রসন্ন হইয়া তাহাকে অর্থ বুঝিবার শক্তি দেন।

শংকর কিছুদিন হইতে হরিহরকে মিনতি করিতে লাগিল, 'দাদা, আমাকে সেই কাগজটা একবার ভালো করিয়া দেখিতে দাও-না।'

হরিহর কহিল, 'দূর পাগল। সে কাগজ কি আছে। বেটা ভণ্ডসন্ন্যাসী কাগজে কতকগুলো হিজিবিজি কাটিয়া আমাকে ফাঁকি দিয়া গেল—আমি সে পুড়াইয়া ফেলিয়াছি।'

শংকর চুপ করিয়া রহিল। হঠাৎ একদিন শংকরকে ঘরে দেখিতে পাওয়া গেল না। তাহার পর হইতে সে নিরুদ্দেশ।

হরিহরের অন্য সমস্ত কাজকর্ম নষ্ট হইল— গুপ্ত ঐশ্বর্যের ধ্যান এক মুহূর্ত সে ছাড়িতে পারিল না।

মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে সে তাহার বড়ো ছেলে শ্যামাপদকে এই সন্ন্যাসীদত্ত কাগজখানি দিয়া গেল।

এই কাগজ পাইয়া শ্যামাপদ চাকরি ছাড়িয়া দিল। জয়কালীর পূজায় আর একান্ত মনে এই লিখনপাঠের চর্চায় তাহার জীবনটা যে কোন দিক দিয়া কাটিয়া গেল তাহা বুঝিতে পারিল না।

মৃত্যুঞ্জয় শ্যামাপদর বড়ো ছেলে। পিতার মৃত্যুর পরে সে এই সন্ন্যাসীদত্ত গুপ্তলিখনের অধিকারী হইয়াছে। তাহার অবস্থা উত্তরোত্তর যতই হীন হইয়া আসিতে লাগিল, ততই অধিকতর আগ্রহের সহিত ওই কাগজখানির প্রতি তাহার সমস্ত চিত্ত নিবিষ্ট হইল। এমন সময় গত অমাবস্যারাত্রে পূজার লিখনখানি আর দেখিতে পাইল না—সন্ন্যাসীও কোথায় অন্তর্ধান করিল।

মৃত্যুঞ্জয় কহিল, এই সন্ন্যাসীকে ছাড়া হইবে না। সমস্ত সন্ধান ইহার কাছ হইতেই মিলিবে।

এই বলিয়া সে ঘর ছাড়িয়া সন্ন্যাসীকে খুঁজিতে বাহির হইল। এক বৎসর পথে পথে কাটিয়া গেল।

৩

গ্রামের নাম ধারাগোল। সেখানে মৃত্যুঞ্জয় মুদির দোকানে বসিয়া তামাক খাইতেছিল, আর অন্যমনস্ক হইয়া নানা কথা ভাবিতেছিল। কিছু দূরে মাঠের ধার দিয়া একজন সন্ন্যাসী চলিয়া গেল। প্রথমটা মৃত্যুঞ্জয়ের মনোযোগ আকৃষ্ট হইল না। একটু পরে হঠাৎ তাহার মনে হইল, যে লোকটা চলিয়া গেল এই তো সেই সন্ন্যাসী। তাড়াতাড়ি হুঁকাটা রাখিয়া মুদিকে সচকিত করিয়া একদৌড়ে সে দোকান হইতে বাহির হইয়া গেল। কিন্তু সে সন্ন্যাসীকে দেখা গেল না।

তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। অপরিচিত স্থানে কোথায় যে সন্ন্যাসীর সন্ধান করিতে যাইবে তাহা সে ঠিক করিতে পারিল না। দোকানে ফিরিয়া আসিয়া মুদিকে জিজ্ঞেস করিল, 'ওই-যে মস্ত বন দেখা যাইতেছে, ওখানে কী আছে।'

মুদি কহিল, 'এককালে ওই বন শহর ছিল কিন্তু অগস্ত্য মুনির শাপে ওখানকার রাজা প্রজা সমস্তই মড়কে মরিয়াছে। লোকে বলে ওখানে অনেক ধনরত্ন আজও খুঁজিলে পাওয়া যায়; কিন্তু দিনদুপুরেও ওই বনে সাহস করিয়া কেহ যাইতে পারে না। যে গেছে সে আর ফেরে নাই।'

মৃত্যুঞ্জয়ের মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। সমস্ত রাত্রি মুদির দোকানে মাদুরের উপর পড়িয়া মশার জ্বালায় সর্বাঙ্গ চাপড়াইতে লাগিল, আর ওই বনের কথা, সন্ন্যাসীর কথা, সেই হারানো লিখনের কথা ভাবিতে থাকিল। বার বার পড়িয়া সেই লিখনটি মৃত্যুঞ্জয়ের প্রায় কণ্ঠস্থ হইয়া গিয়াছিল, তাই এই অনিদ্রাবস্থায় কেবলই তাহার মাথায় ঘুরিতে লাগিল—

পায়ে ধরে সাধা।
রা নাহি দেয় রাধা।।
শেষে দিল রা,
পাগোল ছাড়ো পা।।

মাথা গরম হইয়া উঠিল—কোনোমতেই এই কটা ছত্র সে মন হইতে দূর করিতে পারিল না। অবশেষে ভোরের বেলায় যখন তাহার তন্দ্রা আসিল তখন স্বপ্নে এই চারি ছত্রের অর্থ অতি সহজে তাহার নিকট প্রকাশ হইল। 'রা নাহি দেয় রাধা' অতএব 'রাধা'র 'রা' না থাকিলে 'ধা' রহিল—'শেষে দিল রা', অতএব হইল 'ধারা'—'পাগোল ছাড়ো পা'—'পাগোল'-এর 'পা' ছাড়িলে 'গোল' বাকি রহিল—অতএব সমস্তটা মিলিয়া হইল 'ধারাগোল'—এ জায়গাটার নাম তো 'ধারাগোল'—এ জায়গাটার নাম তো 'ধারাগোল' ই বটে।

স্বপ্ন ভাঙিয়া মৃত্যুঞ্জয় লাফাইয়া উঠিল।

৪

সমস্ত দিন বনের মধ্যে ফিরিয়া সন্ধ্যাবেলায় বহুকষ্টে পথ খুঁজিয়া অনাহারে মৃতপ্রায় অবস্থায় মৃত্যুঞ্জয় গ্রামে ফিরিল।

পরদিন চাদরে চিঁড়া বাঁধিয়া পুনর্বার সে বনের মধ্যে যাত্রা করিল। অপরাহ্ণে একটা দিঘির পাড়ে আসিয়া উপস্থিত হইল। দিঘির মাঝখানটা পরিষ্কার জল আর পাড়ের গায়ে গায়ে চারি দিকে পথ আর কুমুদের বন। পাথরে বাঁধানো ঘাট ভাঙিয়া-চুরিয়া পড়িয়াছে, সেইখানে জলে চিঁড়া ভিজাইয়া খাইয়া দিঘির চারি দিক প্রদক্ষিণ করিয়া দেখিতে লাগিল।

দিঘির পশ্চিমপাড়ির প্রান্তে হঠাৎ মৃত্যুঞ্জয় থমকিয়া দাঁড়াইল। দেখিল একটা তেঁতুলগাছকে বেষ্টন করিয়া প্রকাণ্ড বটগাছ উঠিয়াছে। তৎক্ষণাৎ তাহার মনে পড়িল—

তেঁতুল-বটের কোলে,
দক্ষিণে যাও চলে।।

দক্ষিণে কিছুদূর যাইতেই ঘন জঙ্গলের মধ্যে আসিয়া পড়িল। সেখানে সে বেতঝাড় ভেদ করিয়া চলা একেবারে অসাধ্য। যাহা হউক, মৃত্যুঞ্জয় ঠিক করিল, এই গাছটাকে কোনোমতে হারাইলে চলিবে না।

এই গাছের কাছে ফিরিয়া আসিবার সময় গাছের অন্তরাল দিয়া অনতিদূরে একটা মন্দিরের চূড়া দেখা গেল। সেই দিকের প্রতি লক্ষ করিয়া মৃত্যুঞ্জয় এক ভাঙা মন্দিরের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল। দেখিল, নিকটে একটা চুল্লি, পোড়া কাঠ আর ছাই পড়িয়া আছে। অতি সাবধানে মৃত্যুঞ্জয় ভগ্নদ্বার মন্দিরের মধ্যে উঁকি মারিল। সেখানে কোনো লোক নাই, প্রতিমা নাই, কেবল একটি কম্বল, কমণ্ডলু আর গেরুয়া উত্তরীয় পড়িয়া আছে। তখন সন্ধ্যা আসন্ন হইয়া আসিয়াছে; গ্রাম বহুদূরে, অন্ধকারে বনের মধ্যে পথ সন্ধান করিয়া যাইতে পারিবে কি না, তাই এই মন্দিরে মনুষ্যবসতির লক্ষণ দেখিয়া মৃত্যুঞ্জয় খুশি হইল। মন্দির হইতে একটি বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড ভাঙিয়া দ্বারের কাছে পড়িয়া ছিল; সেই পাথরের উপরে বসিয়া নতশিরে ভাবিতে ভাবিতে মৃত্যুঞ্জয় হঠাৎ পাথরের গায়ে কী যেন লেখা দেখিতে পাইল। ঝুঁকিয়া পড়িয়া একটি চক্র আঁকা, তাহার মধ্যে কতক স্পষ্ট কতক লুপ্তপ্রায়ভাবে নিম্নলিখিত সাংকেতিক অক্ষর লেখা আছে—

এই চক্রটি মৃত্যুঞ্জয়ের সুপরিচিত। কত অমাবস্যা-রাত্রে পূজাগৃহে সুগন্ধ ধূপের ধূমে ঘৃতদীপালোকে তুলট কাগজে অঙ্কিত এই চক্রচিহ্নের উপরে ঝুঁকিয়া পড়িয়া রহস্যভেদ করিবার জন্য একাগ্রমনে সে দেবীর প্রসাদ যাঞ্চা করিয়াছে। আজ অভীষ্টসিদ্ধির অত্যন্ত সন্নিকটে আসিয়া তাহার সর্বাঙ্গ যেন কাঁপিতে লাগিল। পাছে তীরে আসিয়া তরি ডোবে,পাছে সামান্য একটা ভুলে তাহার সমস্ত নষ্ট হইয়া যায়, পাছে সেই সন্ন্যাসী পূর্বে আসিয়া সমস্ত উদ্ধার করিয়া লইয়া গিয়া থাকে, সেই আশঙ্কায় তাহার বুকের মধ্যে তোলপাড় করিতে লাগিল। এখন যে তাহার কী কর্তব্য তাহা সে ভাবিয়া পাইল না। তাহার মনে হইল, সে হয়তো তাহার ঐশ্বর্যভাণ্ডারের ঠিক উপরেই বসিয়া আছে, অথচ কিছুই জানিতে পাইতেছে না।

বসিয়া বসিয়া সে কালীনাম জপ করিতে লাগিল; সন্ধ্যার অন্ধকার নিবিড় হইয়া আসিল; ঝিল্লির ধ্বনিতে বনভূমি মুখর হইয়া উঠিল।

৫

এমন সময় কিছুদূরে ঘন বনের মধ্যে অগ্নির দীপ্তি দেখা গেল। মৃত্যুঞ্জয় তাহার প্রস্তরাসন ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল আর সেই শিখা লক্ষ্য করিয়া চলিতে লাগিল।

বহুকষ্টে কিছুদূর গিয়া একটা অশথগাছের গুঁড়ির অন্তরাল হইতে স্পষ্ট দেখিতে পাইল, তাহার সেই পরিচিত সন্ন্যাসী অগ্নির আলোকে সেই তুলটের লিখন মেলিয়া একটা কাঠি দিয়া ছাইয়ের উপরে একমনে অঙ্ক কষিতেছে।

মৃত্যুঞ্জয়ের ঘরের সেই পৈতৃক তুলটের লিখন! আরে ভণ্ড, চোর! এইজন্যই সে মৃত্যুঞ্জয়কে শোক করিতে নিষেধ করিয়াছিল বটে!

সন্ন্যাসী একবার করিয়া অঙ্ক কষিতেছে আর একটা মাপকাঠি লইয়া জমি মাপিতেছে—কিয়দ্দূর মাপিয়া হতাশ হইয়া ঘাড় নাড়িয়া পুনর্বার আসিয়া অঙ্ক কষিতে প্রবৃত্ত হইতেছে।

এমনি করিয়া রাত্রি যখন অবসানপ্রায়, যখন নিশান্তের শীতবায়ুতে বনস্পতি অগ্রশাখার পল্লবগুলি মর্মরিত হইয়া উঠিল, তখন সন্ন্যাসী সেই লিখনপত্র গুটাইয়া লইয়া চলিয়া গেল।

মৃত্যুঞ্জয় কী করিবে ভাবিয়া পাইল না। ইহা সে নিশ্চয় বুঝিতে পারিল যে, সন্ন্যাসীর সাহায্য ব্যতীত এই লিখনের রহস্য ভেদ করা তাহার সাধ্য হইবে না। লুব্ধ সন্ন্যাসী যে মৃত্যুঞ্জয়কে সাহায্য করিবে না তাহাও নিশ্চিত। অতএব গোপনে সন্ন্যাসীর প্রতি দৃষ্টি রাখা ছাড়া অন্য উপায় নাই। কিন্তু দিনের বেলায় গ্রামে না গেলে তাহার আহার মিলিবে না; অতএব অন্তত কাল সকালে একবার গ্রামে যাওয়া আবশ্যক।

ভোরের দিকে অন্ধকার একটু ফিকা হইবামাত্র সে গাছ হইতে নামিয়া পড়িল। যেখানে সন্ন্যাসী ছাইয়ের মধ্যে আঁক কষিতেছিল সেখানে ভালো করিয়া দেখিল, কিছুই বুঝিল না। চতুর্দিকে ঘুরিয়া দেখিল, অন্য বনখণ্ডের সঙ্গে কোনো প্রভেদ নাই।

বনতলের অন্ধকার ক্রমে যখন ক্ষীণ হইয়া আসিল তখন মৃত্যুঞ্জয় অতি সাবধানে চারি দিক দেখিতে দেখিতে গ্রামের উদ্দেশ্য চলিল। তাহার ভয় ছিল পাছে সন্ন্যাসী তাহাকে দেখিতে পায়।

যে দোকানে মৃত্যুঞ্জয় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল তাহার নিকটে একটি কায়স্থ গৃহিণী ব্রত উদযাপন করিয়া সেদিন ব্রাহ্মণভোজন করাইতে প্রবৃত্ত ছিল। সেইখানে আজ মৃত্যুঞ্জয়ের আহার জুটিয়া গেল। কয়দিন আহারের কষ্টের পর আজ তাহার ভোজনটি গুরুতর হইয়া উঠিল। সেই গুরুভোজনের পর যেমন তামাকটি খাইয়া দোকানের মাদুরটিতে একবার গড়াইয়া লইবার ইচ্ছা করিল, অমনি গত রাত্রির অনিদ্রাকাতর মৃত্যুঞ্জয় ঘুমে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল।

মৃত্যুঞ্জয় স্থির করিয়াছিল, আজ সকাল-সকাল আহারাদি করিয়া যথেষ্ট বেলা থাকিতে বাহির হইবে। ঠিক তাহার উল্টা হইল। যখন তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল তখন সূর্য অস্ত গিয়াছে। তবু মৃত্যুঞ্জয় দমিল না। অন্ধকারেই বনের মধ্যে সে প্রবেশ করিল।

দেখিতে দেখিতে রাত্রি ঘনীভূত হইয়া আসিল। গাছের ছায়ার মধ্যে দৃষ্টি আর চলে না, জঙ্গলের মধ্যে পথ রুদ্ধ হইয়া যায়। মৃতুঞ্জয় যে কোন দিকে কোথায় যাইতেছে তাহা কিছুই ঠাহর পাইল না। রাত্রি যখন অবসান হইল তখন দেখিল, সমস্ত রাত্রি সে বনের প্রান্তে একই জায়গায় ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে।

কাকের দল কা কা শব্দে গ্রামের দিকে উড়িল। এই শব্দ মৃত্যুঞ্জয়ের কানে ব্যঙ্গপূর্ণ ধিক্কারবাক্যের মতো শুনাইল।

৬

গণনায় বারংবার ভুল আর সেই ভুল সংশোধন করিতে করিতে অবশেষে সন্ন্যাসী সুরঙ্গের পথ আবিষ্কার করিয়াছেন। সুরঙ্গের মধ্যে মশাল লইয়া তিনি প্রবেশ করিলেন। বাঁধানো ভিত্তির গায়ে স্যাঁতলা পড়িয়াছে—মাঝে মাঝে এক-এক জায়গায় জল চুঁইয়া পড়িতেছে। স্থানে স্থানে কতকগুলো ভেক গায়ে

গায়ে স্তূপাকার হইয়া নিদ্রা দিতেছে। এই পিছল পথ দিয়া কিছুদূর যাইতেই সন্ন্যাসী দেখিলেন, সম্মুখে দেয়াল উঠিয়াছে, পথ অবরুদ্ধ। কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। দেয়ালের সর্বত্র লৌহদণ্ড দিয়া সবলে আঘাত করিয়া দেখিলেন, কোথাও ফাঁকা আওয়াজ দিতেছে না, কোথাও রুন্ধ্র নাই, এই পথটার যে এইখানেই শেষ তাহা নিঃসন্দেহ।

আবার সেই কাগজ খুলিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। সে রাত্রি এমনি করিয়া কাটিয়া গেল।

পরদিন পুনর্বার গণনা সারিয়া সুরঙ্গে প্রবেশ করিলেন। সেদিন গুপ্তসংকেত অনুসরণপূর্বক একটি বিশেষ স্থান হইতে পাথর খসাইয়া এক শাখাপথ আবিষ্কার করিলেন। সেই পথে চলিতে চলিতে আবার এক জায়গায় পথ অবরুদ্ধ হইয়া গেল।

অবশেষে পঞ্চম রাত্রে প্রবেশ করিয়া সন্ন্যাসী বলিয়া উঠিলেন, 'আজ আমি পথ পাইয়াছি, আজ আর আমার কোনোমতেই ভুল হইবে না।'

পথ অত্যন্ত জটিল; তাহার শাখাপ্রশাখার অন্ত নাই—কোথাও এত সংকীর্ণ যে গুঁড়ি মারিয়া যাইতে হয়। বহু যত্নে মশাল ধরিয়া চলিতে চলিতে সন্ন্যাসী একটা গোলাকার ঘরের মতো জায়গায় আসিয়া পৌঁছিলেন। সেই ঘরের মাঝখানে একটা বৃহৎ ইঁদারা। মশালের আলোকে সন্ন্যাসী তাহার তল দেখিতে পাইলেন না। ঘরের ছাদ হইতে একটা মোটা প্রকাণ্ড লৌহশৃঙ্খল ইঁদারার মধ্যে নামিয়া গেছে। সন্ন্যাসী প্রাণপণ বলে ঠেলিয়া এই শৃঙ্খলটাকে অল্প একটুখানি নাড়াইবামাত্র ঠং করিয়া একটা শব্দ ইঁদারার গহ্বর হইতে উত্থিত হইয়া ঘরময় প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। সন্ন্যাসী উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন, 'পাইয়াছি।'

যেমন বলা অমনি সেই ঘরের ভাঙা ভিত্তি হইতে একটা পাথর গড়াইয়া পড়িল আর সেইসঙ্গে আর-একটি কী সচেতন পদার্থ ধপ্ করিয়া পড়িয়া চিৎকার করিয়া উঠিল। সন্ন্যাসী এই অকস্মাৎ শব্দে চমকিয়া উঠিতেই তাঁহার হাত হইতে মশাল পড়িয়া নিবিয়া গেল।

৭

সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কে।' কোনো উত্তর পাইলেন না। তখন অন্ধকারে হাতড়াইতে গিয়া তাঁহার হাতে একটি মানুষের দেহ ঠেকিল। তাহাকে নাড়া দিয়া জিজ্ঞেসা করিলেন, 'কে তুমি।'

কোনো উত্তর পাইলেন না। লোকটা অচেতন হইয়া গেছে।

তখন চকমকি ঠুকিয়া ঠুকিয়া সন্ন্যাসী অনেক কষ্টে মশাল ধরাইলেন। ইতিমধ্যে সেই লোকটাও সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইল, আর উঠিবার চেষ্টা করিয়া বেদনায় আর্তনাদ করিয়া উঠিল।

সন্ন্যাসী কহিলেন, 'এ কী, মৃত্যুঞ্জয় যে! তোমার এ মতি হইল কেন।'

মৃত্যুঞ্জয় কহিল, 'বাবা, মাপ করো। ভগবান আমাকে শাস্তি দিয়াছেন। তোমাকে পাথর ছুঁড়িয়া মারিতে গিয়া সামলাইতে পারি নাই—পিছলে পাথরসুদ্ধ আমি পড়িয়া গেছি। পা-টা নিশ্চয় ভাঙিয়া গেছে।'

সন্ন্যাসী কহিলেন, 'আমাকে মারিয়া তোমার কী লাভ হইত।'

মৃত্যুঞ্জয় কহিল, 'লাভের কথা তুমি জিজ্ঞাসা করিতেছ! তুমি কীসের লোভে আমার পূজাঘর হইতে লিখনখানি চুরি করিয়া এই সুরঙ্গের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছ। তুমি চোর, তুমি ভণ্ড! আমার পিতামহকে যে সন্ন্যাসী ওই লিখনখানি দিয়াছিলেন তিনি বলিয়াছিলেন, আমাদেরই বংশের কেহ এই লিখনের সংকেত বুঝিতে পারিবে। এই গুপ্ত ঐশ্বর্য আমাদের বংশের প্রাপ্য। তাই আমি এ কয়দিন না খাইয়া না ঘুমাইয়া ছায়ার মতো তোমার পশ্চাতে ফিরিয়াছি। আজ যখন তুমি বলিয়া উঠিলে 'পাইয়াছি' তখন আমি আর থাকিতে পারিলাম না। আমি তোমার পশ্চাতে আসিয়া ওই গর্তটার ভিতরে লুকাইয়া বসিয়া ছিলাম। ওখান হইতে একটা পাথর খসাইয়া তোমাকে মারিতে গেলাম, কিন্তু শরীর দুর্বল, জায়গাটাও অত্যন্ত পিছল—তাই পড়িয়া গেছি। এখন তুমি আমাকে মারিয়া ফেলো সেও ভালো—আমি যক্ষ হইয়া এই ধন আগলাইব—কিন্তু তুমি ইহা লইতে পারিবে না, কোনোমতেই না। যদি লইতে চেষ্টা কর, আমি ব্রাহ্মণ, তোমাকে অভিশাপ দিয়া এই কূপের মধ্যে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া আত্মহত্যা করিব। এ ধন তোমার ব্রহ্মরক্ত গোরক্তুল্য হইবে—এ ধন তুমি কোনোদিন সুখে ভোগ করিতে পারিবে না। আমাদের পিতা পিতামহ এই ধনের উপরে সমস্ত মন রাখিয়া মরিয়াছেন—এই ধনের ধ্যান করিতে করিতে আমরা দরিদ্র হইয়াছি—এই ধনের সন্ধানে আমি বাড়িতে অনাথা স্ত্রী ও শিশুসন্তান ফেলিয়া আহারনিদ্রা ছাড়িয়া পাগলের মতো মাঠে ঘাটে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি—এ ধন তুমি আমার চোখের সম্মুখে কখনো লইতে পারিবে না।'

৮

সন্ন্যাসী কহিলেন, 'মৃত্যুঞ্জয় , তবে শোনো। সমস্ত কথা তোমাকে বলি। তুমি জান, তোমার পিতামহের এক কনিষ্ঠ সহোদর ছিল, নাম ছিল শংকর।'

মৃত্যুঞ্জয় কহিল, 'হাঁ, তিনি নিরুদ্দেশ হইয়া গিয়াছেন।'

সন্ন্যাসী কহিলেন, 'আমি সেই শংকর।'

মৃত্যুঞ্জয় হতাশ হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। এতক্ষণ এই গুপ্তধনের উপর তাহার যে একমাত্র দাবি সে সাব্যস্ত করিয়া বসিয়াছিল, তাহারই বংশের আত্মীয় আসিয়া সে দাবি নষ্ট করিয়া দিল।

শংকর কহিলেন, 'দাদা সন্ন্যাসীর নিকট হইতে লিখন পাইয়া অবধি আমার কাছে তাহা বিধিমতে লুকাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু তিনি যতই গোপন করিতে লাগিলেন, আমার ঔৎসুক্য ততই বাড়িয়া চলিল। তিনি দেবীর আসনের নীচে বাক্সের মধ্যে ওই লিখনখানি লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন, আমি তাহার সন্ধান পাইলাম আর দ্বিতীয় চাবি বানাইয়া প্রতিদিন অল্প অল্প করিয়া সমস্ত কাগজখানা নকল করিতে লাগিলাম। যেদিন নকল শেষ হইল সেইদিনই আমি এই ধনের সন্ধানে ঘর ছাড়িয়া বাহির হইলাম। আমারও ঘরে অনাথা স্ত্রী এবং একটি শিশু সন্তান ছিল। আজ তাহারা কেহ বাঁচিয়া নাই।

'কত দেশ-দেশান্তরে ভ্রমণ করিয়াছি তাহা বিস্তারিত বর্ণনার প্রয়োজন নাই। সন্ন্যাসীদত্ত এই লিখন নিশ্চয় কোনো সন্ন্যাসী আমাকে বুঝাইয়া দিতে পারিবেন এই মনে করিয়া অনেক সন্ন্যাসীর আমি সেবা করিয়াছি। এইরূপে কত বৎসরের পর বৎসর কাটিয়াছে, আমার মনে এক মুহূর্তের জন্যও সুখ ছিল না, শান্তি ছিল না।

'অবশেযে পূর্বজন্মার্জিত পুণ্যের বলে কুমায়ুন পর্বতে বাবা স্বরূপানন্দ স্বামীর সঙ্গ পাইলাম। তিনি আমাকে কহিলেন, 'বাবা, তৃষ্ণা দূর করো তাহা হইলেই বিশ্বব্যাপী অক্ষয় সম্পদ আপনি তোমাকে ধরা দিবে।

'তিনি আমার মনের দাহ জুড়াইয়া দিলেন। তাঁহার প্রসাদে আকাশের আলোক আর ধরণীর শ্যামলতা আমার কাছে রাজসম্পদ হইয়া উঠিল। একদিন পর্বতের শিলাতলে শীতের সায়াহ্নে পরমহংস বাবার ধুনিতে আগুন জ্বলিতেছিল—সেই আগুনে আমার কাগজখানা সমর্পণ করিলাম। বাবা ঈষৎ একটু হাসিলেন। সে হাসির অর্থ তখন বুঝি নাই, আজ বুঝিয়াছি। তিনি নিশ্চয় মনে মনে বলিয়াছিলেন, কাগজখানা ছাই করিয়া ফেলা সহজ কিন্তু বাসনা এত সহজে ভস্মসাৎ হয় না।

'কাগজখানার যখন কোনো চিহ্ন রহিল না তখন আমার মনের চারি দিক হইতে একটা নাগপাশ-বন্ধন যেন সম্পূর্ণরূপে খুলিয়া গেল। মুক্তির অপূর্ব আনন্দে আমার চিত্ত পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। আমি মনে করিলাম এখন হইতে আমার আর-কোনো ভয় নাই—আমি জগতে কিছুই চাহি না।

'ইহার অনতিকাল পরে পরমহংস-বাবার সঙ্গ হইতে চ্যুত হইলাম। তাঁহাকে অনেক খুঁজিলাম, কোথাও তাঁহার দেখা পাইলাম না।

'আমি তখন সন্ন্যাসী হইয়া নিরাসক্তচিত্তে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। অনেক বৎসর কাটিয়া গেল—সেই লিখনের কথা প্রায় ভুলিয়াই গেলাম।

'এমন সময় একদিন এই ধারাগোলের বনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া একটি ভাঙা মন্দিরের মধ্যে আশ্রয় লইলাম। দুই-একদিন থাকিতে থাকিতে দেখিলাম, মন্দিরের ভিতে স্থানে স্থানে নানাপ্রকার চিহ্ন আঁকা আছে। এই চিহ্নগুলি আমার পূর্ব-পরিচিত।

'এককালে বহুদিন যাহার সন্ধানে ফিরিয়াছিলাম তাহার যে নাগাল পাওয়া যাইতেছে তাহাতে আমার সন্দেহ রহিল না। আমি কহিলাম, 'এখানে আর থাকা হইবে না, এ বন ছাড়িয়া চলিলাম।'

'কিন্তু ছড়িয়া যাওয়া ঘটিল না। মনে হইল, দেখাই যাক-না, কী আছে। কৌতূহল একেবারে নিবৃত্ত করিয়া যাওয়াই ভালো। চিহ্নগুলো লইয়া অনেক আলোচনা করিলাম; কোনো ফল হইল না। বারবার মনে হইতে লাগিল, কেন সে কাগজখানা পুড়াইয়া ফেলিলাম। সেখানা রাখিলেই বা ক্ষতি কী ছিল।

'তখন আবার আমার সেই জন্মগ্রাম গেলাম। আমাদের পৈতৃক ভিটার নিতান্ত দুরবস্থা দেখিয়া মনে করিলাম, আমি সন্ন্যাসী আমার ধনরত্নে কোনো প্রয়োজন নাই, কিন্তু এই গরিবরা তো গৃহী, সেই গুপ্ত সম্পদ ইহাদের জন্য উদ্ধার করিয়া দিলে তাহাতে দোষ নাই।

'সেই লিখন কোথায় আছে জানিতাম, তাহা সংগ্রহ করা আমার পক্ষে কিছুমাত্র কঠিন হইল না।

'তাহার পরে একটি বৎসর ধরিয়া এই কাগজখানা লইয়া এই নির্জন বনের মধ্যে গণনা করিয়াছি আর সন্ধান করিয়াছি। মনে আর কোনো চিন্তা ছিল না। যত বারংবার বাধা পাইতে লাগিলাম ততই উত্তরোত্তর আগ্রহ আরও বাড়িয়া চলিল—উন্মত্তের মতো অহোরাত্র এই এক অধ্যবসায়ে নিবিষ্ট রহিলাম।

'ইতিমধ্যে কখন তুমি আমায় অনুসরণ করিতেছ তাহা জানিতে পারি নাই। আমি সহজ অবস্থায় থাকিলে তুমি কখনোই নিজেকে আমার কাছে গোপন রাখিতে পারিতে না; কিন্তু আমি তন্ময় হইয়া ছিলাম, বাহিরের ঘটনা আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিত না।

'তাহার পরে, যাহা খুঁজিতেছিলাম আজ এইমাত্র তাহা আবিষ্কার করিয়াছি। এখানে যাহা আছে পৃথিবীতে কোনো রাজরাজেশ্বরের ভাণ্ডারেও এত ধন নাই। আর একটিমাত্র সংকেত ভেদ করিলে সেই ধন পাওয়া যাইবে।

'এই সংকেতটিই সর্বাপেক্ষা দুরূহ। কিন্তু এই সংকেতও আমি মনে মনে ভেদ করিয়াছি। সেইজন্যই 'পাইয়াছি' বলিয়া মনের উল্লাসে চিৎকার করিয়া উঠিয়াছিলাম। যদি ইচ্ছা করি তবে আর-এক দণ্ডের মধ্যে সেই স্বর্ণমাণিক্যের ভাণ্ডারের মাঝখানে গিয়া দাঁড়াইতে পারি।'

মৃত্যুঞ্জয় শংকরের পা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, 'তুমি সন্ন্যাসী, তোমার তো ধনের কোনো প্রয়োজন নাই—আমাকে সেই ভাণ্ডারের মধ্যে লইয়া যাও। আমাকে বঞ্চিত করিয়ো না।'

শংকর কহিলেন, 'আজ আমার শেষ বন্ধন মুক্ত হইয়াছে। তুমি ওই-যে পাথর ফেলিয়া আমাকে মারিবার জন্য উদ্যত হইয়াছিলে, তাহার আঘাত আমার শরীরে লাগে নাই, কিন্তু তাহা আমার মোহাবরণকে ভেদ করিয়াছে। তৃষ্ণার করালমূর্তি আজ আমি দেখিলাম। আমার গুরু পরমহংসদেবের নিগূঢ় প্রশান্ত হাস্য এতদিন পরে আমার অন্তরের কল্যাণদীপে অনির্বাণ আলোকশিখা জ্বালাইয়া তুলিল।' মৃত্যুঞ্জয় শংকরের পা ধরিয়া পুনরায় কাতর স্বরে কহিল, 'তুমি মুক্ত পুরুষ, আমি মুক্ত নহি, আমি মুক্তি চাহি না, আমাকে এই ঐশ্বর্য হইতে বঞ্চিত করিতে পারিবে না।'

সন্ন্যাসী কহিলেন, 'বৎস, তবে তুমি তোমার এই লিখনটি লও। যদি ধন খুঁজিয়া লইতে পার তবে লইয়ো।'

এই বলিয়া তাঁহার যষ্টি ও লিখনপত্র মৃত্যুঞ্জয়ের কাছে রাখিয়া সন্ন্যাসী চলিয়া গেলেন। মৃত্যুঞ্জয় কহিল, 'আমাকে দয়া করো, আমাকে ফেলিয়া যাইয়ো না—আমাকে দেখাইয়া দাও।'

কোনো উত্তর পাইল না।

তখন মৃত্যুঞ্জয় যষ্টির উপর ভর করিয়া হাতড়াইয়া সুরঙ্গ হইতে বাহির হইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু পথ অত্যন্ত জটিল, গোলকধাঁধার মতো, বারবার বাধা পাইতে লাগিল। অবশেষে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ক্লান্ত হইয়া এক জায়গায় শুইয়া পড়িল এবং নিদ্রা আসিতে বিলম্ব হইল না।

ঘুম হইতে যখন জাগিল তখন রাত্রি কি দিন কি কত বেলা তাহা জানিবার কোনো উপায় ছিল না। অত্যন্ত ক্ষুধা বোধ হইলে মৃত্যুঞ্জয় চাদরের প্রান্ত হইতে চিঁড়া খুলিয়া লইয়া খাইল। তাহার পর আর-একবার হাতড়াইয়া সুরঙ্গ হইতে বাহির হইবার পথ খুঁজিতে লাগিল। নানা স্থানে বাধা পাইয়া বসিয়া পড়িল। তখন চিৎকার করিয়া ডাকিল, 'ওগো সন্ন্যাসী, তুমি কোথায়।'

তাহার সেই ডাক সুরঙ্গের সমস্ত শাখাপ্রশাখা হইতে বারংবার প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। অনতিদূর হইতে উত্তর আসিল, 'আমি তোমার নিকটেই আছি—কী চাও বলো।'

মৃত্যুঞ্জয় কাতর স্বরে কহিল, 'কোথায় ধন আছে আমাকে দয়া করিয়া দেখাইয়া দাও।'

তখন আর কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। মৃত্যুঞ্জয় বারংবার ডাকিল, কোনো সাড়া পাইল না।

দণ্ডপ্রহরের দ্বারা অবিভক্ত এই ভূতলগত চিররাত্রির মধ্যে মৃত্যুঞ্জয় আর-একবার ঘুমাইয়া লইল। ঘুম হইতে আবার সেই অন্ধকারের মধ্যে জাগিয়া উঠিল। চিৎকার করিয়া ডাকিল, 'ওগো, আছ কি।'

নিকট হইতেই উত্তর পাইল, 'এইখানে—আছি, কী চাও।'

মৃত্যুঞ্জয় কহিল, 'আমি আর-কিছু চাই না—আমাকে এই সুরঙ্গ হইতে উদ্ধার করিয়া লইয়া যাও।'

সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি ধন চাও না?'

মৃত্যুঞ্জয় কহিল, 'না, চাহি না।'

তখন চক্‌মকি ঠোকার শব্দ উঠিল এবং কিছুক্ষণ পরে আলো জ্বলিল।

সন্ন্যাসী কহিলেন, 'তবে এসো মৃত্যুঞ্জয়, এই সুরঙ্গ হইতে বাহিরে যাই।'

মৃত্যুঞ্জয় কাতরস্বরে কহিল, 'বাবা, নিতান্তই কি সমস্ত ব্যর্থ হইবে। এত কষ্টের পরেও ধন কি পাইব না।'

তৎক্ষণাৎ মশাল নিবিয়া গেল। মৃত্যুঞ্জয় কহিল, 'কী নিষ্ঠুর।' বলিয়া সেইখানে বসিয়া পড়িয়া ভাবিতে লাগিল। সময়ের কোনো পরিমাণ নাই, অন্ধকারের কোনো অন্ত নাই। মৃত্যুঞ্জয়ের ইচ্ছা করিতে লাগিল তাহার সমস্ত শরীর-মনের বলে এই অন্ধকারটাকে ভাঙিয়া চূর্ণ করিয়া ফেলে। আলোক আকাশ আর বিশ্বছবির বৈচিত্র্যের জন্য তাহার প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিল কহিল, 'ওগো নিষ্ঠুর সন্ন্যাসী, আমি ধন চাই না, আমাকে উদ্ধার করো।'

সন্ন্যাসী কহিলেন, 'ধন চাও না? তবে আমার হাত ধরো। আমার সঙ্গে চলো।'

এবার আর আলো জ্বলিল না। এক হাতে যষ্টি আর এক হাতে সন্ন্যাসীর উত্তরীয় ধরিয়া মৃত্যুঞ্জয় ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল। বহুক্ষণ ধরিয়া অনেক আঁকাবাঁকা পথ দিয়া অনেক ঘুরিয়া ফিরিয়া এক জায়গায় আসিয়া সন্ন্যাসী কহিলেন 'দাঁড়াও।'

মৃত্যুঞ্জয় দাঁড়াইল। তাহার পরে একটা মরিচা-পড়া লোহার দ্বার খোলার উৎকট শব্দ শোনা গেল। সন্ন্যাসী মৃত্যুঞ্জয়ের হাত ধরিয়া কহিলেন, 'এসো।'

মৃত্যুঞ্জয় অগ্রসর হইয়া যেন একটা ঘরে প্রবেশ করিল। তখন আবার চক্‌মকি ঠোকার শব্দ শোনা গেল। কিছুক্ষণ পরে যখন মশাল জ্বলিয়া উঠিল তখন, এ কী আশ্চর্য দৃশ্য! চারি দিকে দেয়ালের গায়ে মোটা মোটা সোনার পাত ভূগর্ভরুদ্ধ কঠিন সূর্যালোকপুঞ্জের মতো স্তরে স্তরে সজ্জিত। মৃত্যুঞ্জয়ের চোখ দুটা জ্বলিতে লাগিল। সে পাগলের মতো বলিয়া উঠিল, 'এ সোনা আমার—এ আমি কোনোমতেই ফেলিয়া যাইতে পারিব না।'

সন্ন্যাসী কহিলেন, 'আচ্ছা ফেলিয়া যাইয়ো না; এই মশাল রহিল—আর এই ছাতু, চিঁড়া আর বড়ো এক ঘটি জল রাখিয়া গেলাম।'

দেখিতে দেখিতে সন্ন্যাসী বাহির হইয়া আসিলেন, আর এই স্বর্ণভাণ্ডারের লৌহদ্বারে কপাট পড়িল।

মৃত্যুঞ্জয় বারবার করিয়া এই স্বর্ণপুঞ্জ স্পর্শ করিয়া ঘরময় ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। ছোটো ছোটো স্বর্ণখণ্ড টানিয়া মেজের উপর ফেলিতে লাগিল, কোলের উপর তুলিতে লাগিল, একটার উপরে আর-একটা আঘাত করিয়া শব্দ করিতে লাগিল, সর্বাঙ্গের উপর বুলাইয়া তাহার স্পর্শ লইতে লাগিল। অবশেষে শ্রান্ত হইয়া সোনার পাত বিছাইয়া তাহার উপর শয়ন করিয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

জাগিয়া উঠিল দেখিল, চারিদিকে সোনা ঝক্‌মক্ করিতেছে। সোনা ছাড়া আর কিছুই নাই। মৃত্যুঞ্জয় ভাবিতে লাগিল, পৃথিবীর উপরে হয়তো এতক্ষণে প্রভাত হইয়াছে, সমস্ত জীবজন্তু আনন্দে জাগিয়া উঠিয়াছে।—তাহাদের বাড়িতে পুকুরের ধারের বাগান হইতে প্রভাতে যে একটি স্নিগ্ধ গন্ধ উঠিত তাহাই কল্পনায় তাহার নাসিকায় যেন প্রবেশ করিতে লাগিল। সে যেন স্পষ্ট চোখে দেখিতে পাইল, পাতিহাঁসগুলি

দুলিতে দুলিতে কলরব করিতে করিতে সকালবেলায় পুকুরের জলের মধ্যে আসিয়া পড়িতেছে, আর বাড়ির ঝি বামা কোমরে কাপড় জড়াইয়া ঊর্ধ্বোত্থিত দক্ষিণহস্তের উপর একরাশি পিতলকাঁসার থালা বাটি লইয়া ঘাটে আনিয়া উপস্থিত করিতেছে।

মৃত্যুঞ্জয় দ্বারে আঘাত করিয়া ডাকিতে লাগিল, 'ওগো সন্ন্যাসীঠাকুর, আছ কি।' দ্বার খুলিয়া গেল। সন্ন্যাসী কইলেন, 'কী চাও।'

মৃত্যুঞ্জয় কহিল, 'আমি বাহিরে যাইতে চাই—কিন্তু সঙ্গে এই সোনার দুটো একটা পাতও কি লইয়া যাইতে পারিব না।'

সন্ন্যাসী তাহার কোনো উত্তর না দিয়া নূতন মশাল জ্বালাইলেন—পূর্ণ কমণ্ডলু একটি রাখিলেন আর উত্তরীয় হইতে কয়েক মুষ্টি চিঁড়া মেজের উপর রাখিয়া বাহির হইয়া গেলেন। দ্বার বন্ধ হইয়া গেল।

মৃত্যুঞ্জয় পাতলা একটা সোনার পাত লইয়া তাহা দোমড়াইয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ভাঙিয়া ফেলিল। সেই খণ্ড সোনাগুলোকে লইয়া ঘরের চারিদিকে লোষ্ট্রখণ্ডের মতো ছড়াইতে লাগিল। কখনো বা দাঁত দিয়া দংশন করিয়া সোনার পাতের উপর দাগ করিয়া দিল। কখনো বা একটা সোনার পাত মাটিতে ফেলিয়া তাহার পরে বারংবার পদাঘাত করিতে লাগিল। মনে মনে বলিতে লাগিল, পৃথিবীতে এমন সম্রাট কয়জন আছে যাহারা সোনা লইয়া এমন করিয়া ফেলাছড়া করিতে পারে। মৃত্যুঞ্জয়ের যেন একটা প্রলয়ের রোখ চাপিয়া গেল। তাহার ইচ্ছা করিতে লাগিল এই রাশীকৃত সোনাকে চূর্ণ করিয়া ধূলির মতো সে ঝাঁটা দিয়া উড়াইয়া ফেলে—আর এইরূপে পৃথিবীর সমস্ত সুবর্ণলুব্ধ রাজা-মহারাজকে সে অবজ্ঞা করিতে পারে।

এমনি করিয়া যতক্ষণ পারিল মৃত্যুঞ্জয় সোনাগুলাকে লইয়া টানাটানি করিয়া শ্রান্তদেহে ঘুমাইয়া পড়িল। ঘুম হইতে উঠিয়া সে আবার তাহার চারিদিকে সেই সোনার স্তূপ দেখিতে লাগিল। সে তখন দ্বারে আঘাত করিয়া চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, 'ওগো সন্ন্যাসী, আমি এ সোনা চাই না—সোনা চাই না!'

কিন্তু দ্বার খুলিল না। ডাকিতে ডাকিতে মৃত্যুঞ্জয়ের গলা ভাঙিয়া গেল, কিন্তু দ্বার খুলিল না—এক-একটা সোনার পিণ্ড লইয়া দ্বারের উপর ছুঁড়িয়া মারিতে লাগিল, কোনো ফল হইল না। মৃত্যুঞ্জয়ের বুক দমিয়া গেল—তবে আর কি সন্ন্যাসী আসিবে না। এই স্বর্ণকারাগারের মধ্যে তিলে তিলে পলে পলে শুকাইয়া মরিতে হইবে!

তখন সোনাগুলোকে দেখিয়া তাহার আতঙ্ক হইতে লাগিল। বিভীষিকার নিঃশব্দ কঠিন হাস্যের মতো ওই সোনার স্তূপ চারিদিকে স্থির হইয়া রহিয়াছে—তাহার মধ্যে স্পন্দন নাই, পরিবর্তন নাই—মৃত্যুঞ্জয়ের যে হৃদয় এখন কাঁপিতেছে, ব্যাকুল হইতেছে, তাহার সঙ্গে উহাদের কোনো সম্পর্ক নাই, বেদনার কোনো সম্বন্ধ নাই। এই সোনার পিণ্ডগুলো আলোক চায় না, আকাশ চায় না, বাতাস চায় না, প্রাণ চায় না, মুক্তি চায় না। ইহারা এই চির-অন্ধকারের মধ্যে চিরদিন উজ্জ্বল হইয়া কঠিন হইয়া স্থির হইয়া রহিয়াছে।

পৃথিবীতে এখন কি গোধূলি আসিয়াছে। আহা, সেই গোধূলির স্বর্ণ! যে স্বর্ণ কেবল ক্ষণকালের জন্য চোখ জুড়াইয়া অন্ধকারের প্রান্তে কাঁদিয়া বিদায় লইয়া যায়। তাহার পরে কুটিরের প্রাঙ্গণতলে

সন্ধ্যাতারা একদৃষ্টে চাহিয়া থাকে। গোষ্ঠ প্রদীপ জ্বালাইয়া বধূ ঘরের কোণে সন্ধ্যাদীপ স্থাপন করে। মন্দিরে আরতির ঘণ্টা বাজিয়া উঠে।

গ্রামের ঘরের অতি ক্ষুদ্রতম তুচ্ছতম ব্যাপার আজ মৃত্যুঞ্জয়ের কল্পনাদৃষ্টির কাছে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তাহাদের সেই-যে-ভোলা কুকুরটা লেজে মাথায় এক হইয়া উঠানের প্রান্তে সন্ধ্যার পর ঘুমাইতে থাকিত, সে কল্পনাও তাহাকে যেন ব্যথিত করিতে লাগিল। ধারাগোল গ্রামের কয়দিন সে যে মুদির দোকানে আশ্রয় লইয়াছিল সেই মুদি এতক্ষণ রাত্রে প্রদীপ নিবাইয়া দোকানে ঝাঁপ বন্ধ করিয়া ধীরে ধীরে গ্রামে বাড়িমুখে আহার করিতে চলিয়াছে, এই কথা স্মরণ করিয়া তাহার মনে হইতে লাগিল, মুদি কী সুখেই আছে। আজ কী বার কে জানে। যদি রবিবার হয় তবে এতক্ষণে হাটের লোক যে যার আপন আপন বাড়ি ফিরিয়েছে, সঙ্গচ্যুত সাথিকে উর্ধ্বস্বরে ডাক পাড়িতেছে, দল বাঁধিয়া খেয়ানৌকায় পার হইতেছে; মেঠো রাস্তা ধরিয়া, শষ্যক্ষেত্রের আল বাহিয়া পল্লির শুষ্কবংশপত্রখচিত অঙ্গনপার্শ্ব দিয়া চাষি লোক হাতে দুটো-একটা মাছ ঝুলাইয়া মাথায় একটা চুপড়ি লইয়া অন্ধকারে আকাশভরা তারার ক্ষীণালোকে গ্রামে গ্রামান্তরে চলিয়াছে।

ধরণীর উপরিতলে এই বিচিত্র বৃহৎ চিরচঞ্চল জীবনযাত্রার মধ্যে তুচ্ছতম দীনতম হইয়া নিজের জীবন মিশাইবার জন্য শতস্তর মৃত্তিকা ভেদ করিয়া তাহার কাছে লোকালয়ের আহ্বান আসিয়া পৌঁছিতে লাগিল। সেই জীবন, সেই আকাশ, সেই আলোক, পৃথিবীর সমস্ত মণিমানিক্যের চেয়ে তাহার কাছে দুর্মূল্য বোধ হইতে লাগিল। তাহার মনে হইতে লাগিল, কেবল ক্ষণকালের জন্য একবার যদি আমার সেই শ্যামজননী ধরিত্রীর ধূলিক্রোড়ে, সেই উন্মুক্ত আলোকিত নীলাম্বরের তলে, সেই তৃণপত্রের গন্ধ বাসিত বাতাস বুক ভরিয়া একটিমাত্র শেষ নিশ্বাসে গ্রহণ করিয়া মরিতে পারি তাহা হইলেও জীবন সার্থক হয়।

এমন সময় দ্বার খুলিয়া গেল। সন্ন্যাসী ঘরে প্রবেশ করিয়া কহিলেন, 'মৃত্যুঞ্জয়, কী চাও'।

সে বলিয়া উঠিল 'আমি আর কিছুই চাই না—আমি এই সুরঙ্গ হইতে, অন্ধকার হইতে, গোলকধাঁধা হইতে, এই সোনার গারদ হইতে, বাহির হইতে চাই। আমি আলোক চাই, আকাশ চাই, মুক্তি চাই।'

সন্ন্যাসী কহিলেন, 'এই সোনার ভাণ্ডারের চেয়ে মূল্যবান রত্নভাণ্ডার এখানে আছে। একবার যাইবে না?'

মৃত্যুঞ্জয় কহিল, 'না যাইব না।'

সন্ন্যাসী কহিলেন, 'একবার দেখিয়া আসিবার কৌতূহলও নাই?'

মৃত্যুঞ্জয় কহিল, 'না আমি দেখিতেও চাই না। আমাকে যদি কৌপীন পরিয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতে হয় তবু আমি এখানে এক মহূর্তও কাটাইতে ইচ্ছা করি না।'

সন্ন্যাসী কহিলেন, 'আচ্ছা, তবে এসো।'

মৃত্যুঞ্জয়ের হাত ধরিয়া সন্ন্যাসী তাহাকে সেই গভীর কূপের সম্মুখে লইয়া গেলেন। তাহার হাতে সেই লিখনপত্র দিয়া কহিলেন, 'এখানি লইয়া তুমি কী করিবে?'

মৃত্যুঞ্জয় সে পত্রখানি টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করল।

দর্পহরণ

কী করিয়া গল্প লিখিত হয়, তাহা সম্প্রতি শিখিয়াছি। বঙ্কিমবাবু এবং সার ওয়ালটার স্কট পড়িয়া আমার বিশেষ ফল হয় নাই। ফল কোথা হইতে কেমন করিয়া হইল, আমার এই প্রথম গল্পেই সেই কথাটা লিখিতে বসিলাম।

আমার পিতার মতামত অনেকরকম ছিল; কিন্তু বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে কোনো মত তিনি কেতাব বা স্বাধীনবুদ্ধি হইতে গড়িয়া তোলেন নাই। আমার বিবাহ যখন হয় তখন সতেরো উত্তীর্ণ হইয়া আঠারোয় পা দিয়াছি; তখন আমি কলেজে থার্ড ইয়ারে পড়ি—এবং তখন আমার চিত্তক্ষেত্রে যৌবনের প্রথম দক্ষিণবাতাস বহিতে আরম্ভ করিয়া কত অলক্ষ্য দিক হইতে অনির্বচনীয় গীতে এবং গন্ধে, কম্পনে এবং মর্মরে আমার তরুণ জীবনকে উৎসুক করিয়া তুলিতেছিল, তাহা এখনও মনে হইলে বুকের ভিতরে দীর্ঘনিশ্বাস ভরিয়া উঠে।

তখন আমার মা ছিলেন না—আমাদের শূন্যসংসারের মধ্যে লক্ষ্মীস্থাপন করিবার জন্য আমার পড়াশুনা শেষ হইবার অপেক্ষা না করিয়াই, বাবা বারো বৎসরের বালিকা নির্ঝরিণীকে আমাদের ঘরে আনিলেন।

নির্ঝরিণী নামটি হঠাৎ পাঠকদের কাছে প্রচার করিতে সংকোচবোধ করিতেছি। কারণ, তাঁহাদের অনেকেরই বয়স হইয়াছে—অনেক ইস্কুল-মাস্টারি মুন্‌সেফি এবং কেহ কেহ বা সম্পাদকীয় করেন, তাঁহারা শ্বশুরমহাশয়ের নাম নির্বাচনরুচির অতিমাত্র লালিত্য এবং নূতনত্বে হাসিবেন এমন আশঙ্কা আছে। কিন্তু আমি তখন অর্বাচীন ছিলাম, বিচারশক্তির কোনো উপদ্রব ছিল না, তাই নামটি বিবাহের সম্বন্ধ হইবার সময়েই যেমনি শুনিলাম অমনি—

কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো,
আকুল করিল মোর প্রাণ।

এখন বয়স হইয়াছে এবং ওকালতি ছাড়িয়া মুনসেফি-লাভের জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছি, তবু হৃদয়ের মধ্যে ওই নামটি পুরাতন বেহালার আওয়াজের মতো আরও বেশি মোলায়েম হইয়া বাজিতেছে।

প্রথম বয়সের প্রথম প্রেম অনেকগুলি ছোটোখাটো বাধার দ্বারা মধুর। লজ্জার বাধা, ঘরের লোকের বাধা, অনভিজ্ঞতার বাধা — এইগুলির অন্তরাল হইতে প্রথম পরিচয়ের যে আভাস দিতে থাকে তাহা ভোরের আলোর মতো রঙিন — তাহা মধ্যাহ্নের মতো সুস্পষ্ট, অনাবৃত এবং বর্ণচ্ছটাবিহীন নহে।

আমাদের সেই নবীন পরিচয়ের মাঝখানে বাবা বিন্ধ্যগিরির মতো দাঁড়াইলেন। তিনি আমাকে হস্টেলে নির্বাসিত করিয়া দিয়া তাঁহার বউমাকে বাংলা লেখাপড়া শিখাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। আমার এই গল্পের শুরু হইল সেইখানে।

শ্বশুরমহাশয় কেবল তাঁহার কন্যার নামকরণ করিয়াই নিশ্চেষ্ট ছিলেন না, তিনি তাহাকে শিক্ষাদানেরও প্রভূত আয়োজন করিয়াছিলেন। এমনকী, উপক্রমণিকা তাহার মুখস্থ শেষ হইয়াছিল। মেঘনাদবধ কাব্য পড়িতে হেমবাবুর টীকা তাহার প্রয়োজন হইত না।

হস্টেলে গিয়া তাহার পরিচয় পাইয়াছিলাম। আমি সেখানে থাকিতে নানা উপায়ে বাবাকে লুকাইয়া নববিরহতাপে অত্যন্ত উত্তপ্ত দুই-একখানা চিঠি তাহাকে পাঠাইতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। তাহাতে কোটেশন-মার্কা না দিয়া আমাদের নব্য কবিদের কাব্য ছাঁকিয়া অনেক কবিতা ঢালিয়াছিলাম; ভাবিয়াছিলাম — প্রণয়িনীর কেবল প্রেম আকর্ষণ করাই যথেষ্ট নহে, শ্রদ্ধাও চাই। শ্রদ্ধা পাইতে হইলে বাংলা ভাষায় যেরূপ রচনাপ্রণালীর আশ্রয় লওয়া উচিত সেটা আমার স্বভাবত আসিত না, সেইজন্য, মণৌ বজ্রসমুৎকীর্ণে সূত্রস্যেবাস্তি মে গতিঃ। অর্থাৎ, অন্য জহুরিরা যে-সকল মণি ছিদ্র করিয়া রাখিয়াছিলেন, আমার চিঠি তাহা সূত্রের মতো গাঁথিয়া পাঠাইত। কিন্তু, ইহার মধ্যে মণিগুলি অন্যের, কেবলমাত্র সূত্রটুকুই আমার, এ বিনয়টুকু স্পষ্ট করিয়া প্রচার করা আমি ঠিক সংগত মনে করি নাই — কালিদাসও করিতেন না, যদি সত্যই তাঁহার মণিগুলি চোরাই মাল হইত।

চিঠির উত্তর যখন পাইলাম তাহার পর হইতে যথাস্থানে কোটেশন-মার্কা দিতে আর কার্পণ্য করি নাই। এটুকু বেশ বোঝা গেল, নববধূ বাংলা ভাষাটি বেশ জানেন। তাঁহার চিঠিতে বানান-ভুল ছিল কি না তাহার উপযুক্ত বিচারক আমি নই — কিন্তু সাহিত্যবোধ ও ভাষাবোধ না থাকিলে এমন চিঠি লেখা যায় না, সেটুকু আন্দাজে বুঝিতে পারি।

স্ত্রীর বিদ্যা দেখিয়া সৎস্বামীর যতটুকু গর্ব ও আনন্দ হওয়া উচিত তাহা আমার হয় নাই এমন কথা বলিলে আমাকে অন্যায় অপবাদ দেওয়া হইবে, কিন্তু তারই সঙ্গে একটু অন্য ভাবও ছিল। সে ভাবটুকু উচ্চদরের না হইতে পারে, কিন্তু স্বাভাবিক। মুশকিল এই যে, যে উপায়ে আমার বিদ্যার পরিচয় দিতে পারিতাম সেটা বালিকার পক্ষে দুর্গম। সে যেটুকু ইংরেজি জানে তাহাতে বার্ক-মেকলের ছাঁদের চিঠি তাহার উপরে চালাইতে হইলে মশা মারিতে কামান দাগা হইত — মশার কিছুই হইত না, কেবল ধোঁয়া এবং আওয়াজই সার হইত।

আমার যে তিনটি প্রাণের বন্ধু ছিল তাহাদিগকে আমার স্ত্রী চিঠি না দেখাইয়া থাকিতে পারিলাম না। তাহারা আশ্চর্য হইয়া কহিল, 'এমন স্ত্রী পাইয়াছ, ইহা তোমার ভাগ্য।' অর্থাৎ ভাষান্তরে বলিতে গেলে এমন স্ত্রীর উপযুক্ত স্বামী আমি নই।

নির্ঝরিণীর নিকট হইতে পত্রোত্তর পাইবার পূর্বেই যে কখানি চিঠি লিখিয়া ফেলিয়াছিলাম তাহাতে হৃদয়োচ্ছ্বাস যথেষ্ট ছিল, কিন্তু বানান-ভুলও নিতান্ত অল্প ছিল না। সতর্ক হইয়া লেখা যে দরকার তাহা তখন মনেও করি নাই। সতর্ক হইয়া লিখিলে বানান ভুল হয়তো কিছু কম পড়িত, কিন্তু হৃদয়োচ্ছ্বাসটাও মারা যাইত।

এমন অবস্থায় চিঠির মধ্যস্থতা ছাড়িয়া মোকাবিলায় প্রেমালাপই নিরাপদ। সুতরাং বাবা আপিসে গেলেই আমাকে কালেজ পালাইতে হইত। ইহাতে আমাদের উভয় পক্ষেরই পাঠচর্চা যে ক্ষতি হইত, আলাপচর্চায় তাহা সুদসুদ্ধ পোষণ করিয়া লইতাম। বিশ্বজগতে যে কিছুই একেবারে নষ্ট হয় না, এক আকারে যাহা ক্ষতি অন্য আকারে তাহা লাভ —বিজ্ঞানের এই তথ্য প্রেমের পরীক্ষাশালায় বারংবার যাচাই করিয়া লইয়া একেবারে নিঃসংশয় হইয়াছি।

এমন সময়ে আমার স্ত্রীর জাঠতুতো বোনের বিবাহকাল উপস্থিত — আমরা তো যথানিয়মে আইবুড়ো ভাত দিয়া খালাস, কিন্তু আমার স্ত্রী স্নেহের আবেগে এক কবিতা রচনা করিয়া লাল কাগজে লাল কালি দিয়া লিখিয়া তাহার ভগিনীকে না পাঠাইয়া থাকিতে পারিল না। সেই রচনাটি কেমন করিয়া বাবার হস্তগত হইল। বাবা তাঁহার বধূমাতার কবিতায় রচনানৈপুণ্য, সদ্ভাবসৌন্দর্য, প্রসাদগুণ, প্রাঞ্জলতা ইত্যাদি শাস্ত্রসম্মত নানা গুণের সমাবেশ দেখিয়া অভিভূত হইয়া গেলেন। তাঁহার বৃদ্ধ বন্ধুদিগকে দেখাইলেন, তাঁহারাও তামাক টানিতে টানিতে বলিলেন, 'খাসা হইয়াছে!' নববধূর যে রচনাশক্তি আছে এ কথা কাহারও অগোচর রহিল না। হঠাৎ এইরূপ খ্যাতিবিকাশে রচয়িত্রীর কর্ণমূল এবং কপোলদ্বয় অরুণবর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল; অভ্যাসক্রমে তাহা বিলুপ্ত হইল। পূর্বেই বলিয়াছি, কোনো জিনিস একেবারে বিলুপ্ত হয় না — কী জানি, লজ্জার আভাটুকু তাহার কোমল কপোল ছাড়িয়া আমার কঠিন হৃদয়ের প্রচ্ছন্ন কোণে হয়তো আশ্রয় লইয়া থাকিবে।

কিন্তু তাই বলিয়া স্বামীর কর্তব্যে শৈথিল্য করি নাই। অপক্ষপাত সমালোচনার দ্বারা স্ত্রীর রচনার দোষ সংশোধনে আমি কখনোই আলস্য করি নাই। বাবা তাহাকে নির্বিচারে যতই উৎসাহ দিয়াছেন, আমি ততই সতর্কতার সহিত ত্রুটি নির্দেশ করিয়া তাহাকে যথোচিত সংযত করিয়াছি। আমি ইংরেজি বড়ো বড়ো লেখকের লেখা দেখাইয়া তাহাকে অভিভূত করিতে ছাড়ি নাই। সে কোকিলের উপর একটা কী লিখিয়াছিল, আমি শেলির স্কাইলার্ক ও কিটসের নাইটিঙ্গেল শুনাইয়া তাহাকে একপ্রকার নীরব করিয়া দিয়াছিলাম। তখন বিদ্যার জোরে আমিও যেন শেলি ও কিটসের গৌরবের কতকটা ভাগী হইয়া পড়িতাম। আমার স্ত্রীও ইংরেজি সাহিত্য হইতে ভালো ভালো জিনিস তাহাকে তর্জমা করিয়া শুনাইবার জন্য আমাকে পীড়াপীড়ি করিত, আমি গর্বের সহিত তাহার অনুরোধ রক্ষা করিতাম। তখন ইংরেজি সাহিত্যের মহিমায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়া আমার স্ত্রীর প্রতিভাকে কি ম্লান করি নাই। স্ত্রীলোকের কমনীয়তার পক্ষে এই একটু ছায়ার আচ্ছাদন দরকার, বাবা এবং বন্ধুবান্ধবেরা তাহা বুঝিতেন না— কাজেই আমাকে এই কঠোর কর্তব্যের ভার লইতে হইয়াছিল। নিশীথের চন্দ্র মধ্যাহ্নের সূর্যের মতো হইয়া উঠিলে দুই দণ্ড বাহবা দেওয়া চলে, কিন্তু তাহার পরে ভাবিতে হয়, ওটাকে ঢাকা দেওয়া যায় কী উপায়ে।

আমার স্ত্রীর লেখা বাবা এবং অন্যান্য অনেকে কাগজে ছাপাইতে উদ্যত হইয়াছিলেন। নির্ঝরিণী তাহাতে লজ্জাপ্রকাশ করিত — আমি তাহার সে লজ্জা রক্ষা করিয়াছি। কাগজে ছাপিয়ে দিই নাই, কিন্তু বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে প্রচার বন্ধ করিতে পারা গেল না।

ইহার কুফল যে কতদূর হইতে পারে, কিছুকাল পরে তাহার পরিচয় পাইয়াছিলাম। তখন উকিল হইয়া আলিপুরে বাহির হই। একটা উইল-কেস লইয়া বিরুদ্ধ পক্ষের সঙ্গে খুব জোরের সহিত লড়িতেছিলাম। উইলটি বাংলায় লেখা। স্বপক্ষের অনুকূলে তাহার অর্থ যে কীরূপ স্পষ্ট তাহা বিধিমতে প্রমাণ করিতেছিলাম, এমন সময় বিরোধী পক্ষের উকিল উঠিয়া বলিলেন, 'আমার বিদ্বান বন্ধু যদি তাঁহার বিদূষী স্ত্রীর কাছে এই উইলটি বুঝিয়া লইয়া আসিতেন, তবে এমন অদ্ভুত ব্যাখ্যা দ্বারা মাতৃভাষাকে ব্যথিত করিয়া তুলিতেন না।'

চুলায় আগুন ধরাইবার বেলা ফুঁ দিতে দিতে নাকের জলে চোখের জলে হইতে হয়, কিন্তু গৃহদাহের আগুন নেবানোই দায়। লোকের ভালো কথা চাপা থাকে, আর অনিষ্টকর কথাগুলো মুখে মুখে হু হু শব্দে

ব্যাপ্ত হইয়া যায়। এ গল্পটিও সর্বত্র প্রচারিত হইল। ভয় হইয়াছিল, পাছে আমার স্ত্রীর কানে ওঠে। সৌভাগ্যক্রমে ওঠে নাই — অন্তত এ সম্বন্ধে তাহার কাছ হইতে কোনো আলোচনা কখনও শুনি নাই।

একদিন একটি অপরিচিত ভদ্রলোকের সহিত আমার পরিচয় হইতেই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনিই কি শ্রীমতী নির্ঝরিণী দেবীর স্বামী।' আমি কহিলাম, 'আমি তাঁহার স্বামী কি না সে কথার জবাব দিতে চাহি না, তবে তিনিই আমার স্ত্রী বটেন।' বাহিরের লোকের কাছে স্ত্রীর স্বামী বলিয়া খ্যাতিলাভ করা আমি গৌরবের বিষয় বলিয়া জ্ঞান করি না।

সেটা যে গৌরবের বিষয় নহে, সে কথা আমাকে আর এক ব্যক্তি অনাবশ্যক স্পষ্ট ভাষায় স্মরণ করাইয়া দিয়াছিল। পূর্বেই পাঠকগণ সংবাদ পাইয়াছেন, আমার স্ত্রীর জাঠ্‌তুতো বোনের বিবাহ হইয়াছে। তাহার স্বামীটা অত্যন্ত বর্বর দুর্বৃত্ত। স্ত্রীর প্রতি তাহার অত্যাচার অসহ্য। আমি এই পাষণ্ডের নির্দয়াচরণ লইয়া আত্মীয়সমাজে আলোচনা করিয়াছিলাম, সে কথা অনেক বড়ো হইয়া তাহার কানে উঠিয়াছিল। সে তাহার পর হইতে আমার প্রতি লক্ষ্য করিয়া সকলের কাছে বলিয়া বেড়াইতেছে যে, নিজের নাম হইতে আরম্ভ করিয়া শ্বশুরের নামে পর্যন্ত উত্তম-মধ্যম-অধম অনেকরকম খ্যাতির বিবরণ শাস্ত্রে লিখিয়াছে, কিন্তু নিজের স্ত্রীর খ্যাতিতে যশস্বী হওয়ার কল্পনা কবির মাথাতেও আসে নাই।

এমন সব কথা লোকের মুখে মুখে চলিতে আরম্ভ করিলে স্ত্রীর মনে তো দম্ভ জন্মিতেই পারে। বিশেষত বাবার একটা বদ্‌ অভ্যাস ছিল, নির্ঝরিণীর সামনেই তিনি আমাদের পরস্পরের বাংলাভাষাজ্ঞান লইয়া কৌতুক করিতেন। একদিন তিনি বলিলেন, 'হরিশ যে বাংলা চিঠিগুলো লেখে তাহার বানানটা তুমি দেখিয়া দাও না কেন, বউমা — আমাকে এক চিঠি লিখিয়াছে, তাহাতে সে 'জগদিন্দ্র' লিখিতে দীর্ঘ ঈ বসাইয়াছে।' শুনিয়া বাবার বউমা নীরবে একটুখানি স্মিতহাস্য করিলেন। আমিও কথাটাকে ঠাট্টা বলিয়া হাসিলাম, কিন্তু এরকম ঠাট্টা ভালো নয়।

স্ত্রীর দম্ভের পরিচয় পাইতে আমার দেরি হইল না। পাড়ার ছেলেদের এক ক্লাব আছে; সেখানে একদিন তাহারা এক বিখ্যাত বাংলা-লেখককে বক্তৃতা দিতে রাজি করিয়াছিল। অপর একটি বিখ্যাত লোককে সভাপতিও ঠিক করা হয়; তিনি বক্তৃতার পূর্বরাত্রে অস্বাস্থ্য জানাইয়া ছুটি লইলেন। ছেলেরা উপায়ান্তর না দেখিয়া আমাকে আসিয়া ধরিল। আমার প্রতি ছেলেদের এই অহৈতুকী শ্রদ্ধা দেখিয়া আমি কিছু উৎফুল্ল হইয়া উঠিলাম; বলিলাম, 'তা বেশ তো, বিষয়টা কী বলো তো।'

তাহারা কহিল, 'প্রাচীন ও আধুনিক বঙ্গসাহিত্য।'

আমি কহিলাম, 'বেশ হইবে, দুটোই আমি ঠিক সমান জানি।'

পরদিন সভায় যাইবার পূর্বে জলখাবার এবং কাপড়চোপড়ের জন্য স্ত্রীকে কিছু তাড়া দিতে লাগিলাম। নির্ঝরিণী কহিল, 'কেন গো, এত ব্যস্ত কেন — আবার কি পাত্রী দেখিতে যাইতেছ।'

আমি কহিলাম, 'একবার দেখিয়াই নাকে-কানে খত দিয়াছি; আর নয়।'

'তবে এত সাজসজ্জার তাড়া যে।'

স্ত্রীকে সগর্বে সমস্ত ব্যাপারটা বলিলাম। শুনিয়া সে কিছুমাত্র উল্লাস প্রকাশ না করিয়া ব্যাকুলভাবে আমার হাত চাপিয়া ধরিল। কহিল, 'তুমি পাগল হইয়াছ? না, না, সেখানে তুমি যাইতে পারিবে না।'

আমি কহিলাম, 'রাজপুতনারী যুদ্ধসাজ পরাইয়া স্বামীকে রণক্ষেত্রে পাঠাইয়া দিত — আর বাঙালির মেয়ে কি বক্তৃতাসভাতেও পাঠাইতে পারে না।'

নির্ঝরিণী কহিল, 'ইংরেজি বক্তৃতা হইলে আমি ভয় করিতাম না, কিন্তু — থাক-না, অনেক লোক আসিবে, তোমার অভ্যাস নাই — শেষকালে—'

শেষকালের কথাটা আমিও কি মাঝে মাঝে ভাবি নাই। রামমোহন রায়ের গানটা মনে পড়িতেছিল—

মনে করো শেষের সে দিন ভয়ংকর,
অন্যে বাক্য কবে কিন্তু তুমি রবে নিরুত্তর।

বক্তার বক্তৃতা-অন্তে উঠিয়া দাঁড়াইবার সময় সভাপতি যদি হঠাৎ 'দৃষ্টিহীন নাড়িক্ষীণ হিমকলেবর' অবস্থায় একেবারে নিরুত্তর হইয়া পড়েন, তবে কী গতি হইবে। এই সকল কথা চিন্তা করিয়া পূর্বোক্ত পলাতক সভাপতি মহাশয়ের চেয়ে আমার স্বাস্থ্য যে কোনো অংশে ভালো ছিল, এমন কথা আমি বলিতে পারি না।

বুক ফুলাইয়া স্ত্রীকে কহিলাম, 'নির্ঝর, তুমি কী মনে কর —'

স্ত্রী কহিল, 'আমি কিছুই মনে করি না— কিন্তু আজ আমার ভারী মাথা ধরিয়া আসিয়াছে, বোধ হয় জ্বর আসিবে, তুমি আজ আমাকে ফেলিয়া যাইতে পারিবে না।'

আমি কহিলাম, 'সে আলাদা কথা। তোমার মুখটা একটু লাল দেখাইতেছে বটে।'

সেই লালটা সভাস্থলে আমার দুরবস্থা কল্পনা করিয়া লজ্জায়, অথবা আসন্ন জ্বরের আবেশে, সে কথা নিঃসংশয়ে পর্যালোচনা না করিয়াই আমি ক্লাবের সেক্রেটারিকে স্ত্রীর পীড়ার কথা জানাইয়া নিষ্কৃতিলাভ করিলাম।

বলা বাহুল্য, স্ত্রীর জ্বরভাব অতি সত্বর ছাড়িয়া গেল। আমার অন্তরাত্মা কহিতে লাগিল, 'আর-সব ভালো হইল, কিন্তু তোমার বাংলা বিদ্যা সম্বন্ধে তোমার স্ত্রীর মনে এই-যে সংস্কার, এটা ভালো নয়। তিনি নিজেকে মস্ত বলিয়া ঠাওরাইয়াছেন— কোনোদিন বা মশারির মধ্যে নাইটস্কুল খুলিয়া তিনি তোমাকে বাংলা পড়াইবার চেষ্টা করিবেন।'

আমি কহিলাম, 'ঠিক কথা — এই বেলা দর্প চূর্ণ না করিলে ক্রমে আর তাহার নাগাল পাওয়া যাইবে না।'

সেই রাত্রেই তাহার সঙ্গে একটু খিটিমিটি বাধাইলাম। অল্প শিক্ষা যে কিরূপ ভয়ংকর জিনিস, পোপের কাব্য হইতে তাহার উদাহরণ উদ্ধার করিয়া তাহাকে শুনাইলাম। ইহাও বুঝাইলাম, কোনোমতে বানান এবং ব্যাকরণ বাঁচাইয়া লিখিলেই যে লেখা হইল তাহা নহে— আসল জিনিসটা হইতেছে আইডিয়া। কাশিয়া বলিলাম, 'সেটা উপক্রমণিকায় পাওয়া যায় না— সেটার জন্য মাথা চাই।' মাথা যে কোথায় আছে সে কথা তাহাকে স্পষ্ট করিয়া বলি না, কিন্তু তবু বোধ হয় কথাটা অস্পষ্ট ছিল না। আমি কহিলাম, 'লিখিবার যোগ্য কোনো লেখা কোনো দেশে কোনোদিন কোনো স্ত্রীলোক লেখে নাই।'

শুনিয়া নির্ঝরিণীর মেয়েলি তার্কিকতা চড়িয়া উঠিল। সে বলিল, 'কেন মেয়েরা লিখিতে পারিবে না। মেয়েরা এতই কি হীন।'

আমি কহিলাম, ‘রাগ করিয়া কী করিবে। দৃষ্টান্ত দেখাও না।’

নির্ঝরিণী কহিল, ‘তোমার মতো যদি আমার ইতিহাস পড়া থাকিত তবে নিশ্চয়ই আমি ঢের দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারিতাম।’

এ কথাটা শুনিয়া আমার মন একটু নরম হইয়াছিল, কিন্তু তর্ক এখানেই শেষ হয় নাই। ইহার শেষ যেখানে সেটা পরে বর্ণনা করা যাইতেছে।

‘উদ্দীপনা’ বলিয়া মাসিকপত্রে ভালো গল্প লিখিবার জন্য পঞ্চাশ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছিল। কথা এই স্থির হইল, আমরা দুজনেই সেই কাগজে দুটা গল্প লিখিয়া পাঠাইব, দেখি কাহার ভাগ্যে পুরস্কার জোটে।

রাত্রের ঘটনা তো এই। পরদিন প্রভাতের আলোকে বুদ্ধি যখন নির্মল হইয়া আসিল তখন দ্বিধা জন্মিতে লাগিল। কিন্তু প্রতিজ্ঞা করিলাম, এ অবসর ছাড়িয়া দেওয়া হইবে না— যেমন করিয়া হউক, জিতিতেই হইবে। হাতে তখনও দুই মাস সময় ছিল।

প্রকৃতিবাদ অভিধান কিনিলাম, বঙ্কিমের বইগুলাও সংগ্রহ করিলাম। কিন্তু বঙ্কিমের লেখা আমার চেয়ে আমার অন্তঃপুরে অধিক পরিচিত, তাই সে মহদাশ্রয় পরিত্যাগ করিতে হইল। ইংরেজি গল্পের বই দেদার পড়িতে লাগিলাম। অনেকগুলো গল্প ভাঙিয়া-চুরিয়া একটা প্লট দাঁড় করাইলাম। প্লটটা খুবই চমৎকার হইয়াছিল, কিন্তু মুশকিল এই হইল, বাংলা-সমাজে সে সকল ঘটনা কোনো অবস্থাতেই ঘটিতে পারে না। অতিপ্রাচীন কালের পাঞ্জাবের সীমান্তদেশে গল্পের ভিত্তি ফাঁদিলাম; সেখানে সম্ভব-অসম্ভবের সমস্ত বিচার একেবারে নিরাকৃত হওয়াতে কলমের মুখে কোনো বাধা রহিল না। উদ্দাম প্রণয়, অসম্ভব বীরত্ব, নিদারুণ পরিণাম সার্কাসের ঘোড়ার মতো আমার গল্প ঘিরিয়া অদ্ভুত গতিতে ঘুরিতে লাগিল।

রাত্রে আমার ঘুম হইত না; দিনে আহারকালে ভাতের থালা ছাড়িয়া মাছের ঝোলের বাটিতে ডাল ঢালিয়া দিতাম। আমার অবস্থা দেখিয়া নির্ঝরিণী আমাকে অনুনয় করিয়া কহিল, ‘আমার মাথা খাও, তোমাকে আর গল্প লিখিতে হইবে না— আমি হার মানিতেছি।’

আমি উত্তেজিত হইয়া বলিলাম, ‘তুমি কি মনে করিতেছ আমি দিনরাত্রি কেবল গল্প ভাবিয়াই মরিতেছি। কিছুই না। আমাকে মক্কেলের কথা ভাবিতে হয়— তোমার মতো গল্প এবং কবিতা চিন্তা করিবার অবসর পড়িয়া থাকিলে আমার ভাবনা কী ছিল।’

যাহা হউক, ইংরেজি প্লট এবং সংস্কৃত অভিধানে মিলাইয়া একটা গল্প খাড়া করিলাম। মনের কোণে ধর্মবুদ্ধিতে একটু পীড়াবোধ করিতে লাগিলাম— ভাবিলাম, বেচারা নির্ঝর ইংরেজি সাহিত্য পড়ে নাই, তাহার ভাব সংগ্রহ করিবার ক্ষেত্র সংকীর্ণ; আমার সঙ্গে তাহার এই লড়াই নিতান্ত অসমকক্ষের লড়াই।

উপসংহার

লেখা পাঠানো হইয়াছে। বৈশাখের সংখ্যায় পুরস্কারযোগ্য গল্পটি বাহির হইবে। যদিও আমার মনে কোনো আশঙ্কা ছিল না, তবু সময় যত নিকটবর্তী হইল, মনটা তত চঞ্চল হইয়া উঠিল।

বৈশাখ মাসও আসিল। একদিন আদালত হইতে সকাল-সকাল ফিরিয়া আসিয়া খরব পাইলাম, বৈশাখের ‘উদ্দীপনা’ আসিয়াছে, আমরা স্ত্রী তাহা পাইয়াছে।

ধীরে ধীরে নিঃশব্দপদে অন্তঃপুরে গেলাম। শয়নঘরে উঁকি মারিয়া দেখিলাম, আমার স্ত্রী কড়ায় আগুন করিয়া একটা বই পুড়াইতেছে। দেয়ালের আয়নায় নির্ঝরিণীর মুখের যে প্রতিবিম্ব দেখা যাইতেছে তাহাতে স্পষ্ট বুঝা গেল, কিছু পূর্বে সে অশ্রুবর্ষণ করিয়া লইয়াছে।

মনে আনন্দ হইল, কিন্তু সেইসঙ্গে একটু দয়াও হইল। আহা, বেচারার গল্পটি 'উদ্দীপনায়' বাহির হয় নাই। কিন্তু এই সামান্য ব্যাপারে এত দুঃখ। স্ত্রীলোকের অহংকারে এত অল্পেই ঘা পড়ে।

আবার আমি নিঃশব্দপদে ফিরিয়া গেলাম। উদ্দীপনা-আপিস হইতে নগদ দাম দিয়া একটা কাগজ কিনিয়া আনাইলাম। আমার লেখা বাহির হইয়াছে কি না দেখিবার জন্য কাগজ খুলিলাম। সূচিপত্রে দেখিলাম, পুরস্কারযোগ্য গল্পটির নাম 'বিক্রমনারায়ণ' নহে, তাহার নাম 'ননদিনী' এবং তাহার রচয়িতার নাম — এ কী! এ যে নির্ঝরিণী দেবী!

বাংলাদেশে আমার স্ত্রী ছাড়া আর কাহারও নাম নির্ঝরিণী আছে কি। গল্পটি খুলিয়া পড়িলাম। দেখিলাম, নির্ঝরের সেই হতভাগিনী জাঠতুতো বোনের বৃত্তান্তটিই ডালপালা দিয়ে বর্ণিত। একেবারে ঘরের কথা — সাদা ভাষা, কিন্তু সমস্ত ছবির মতো চোখে পড়ে এবং চক্ষু জলে ভরিয়া যায়। এ নির্ঝরিণী যে আমারই 'নির্ঝর' তাহাতে সন্দেহ নাই।

তখন আমার শয়নঘরের সেই দাহদৃশ্য এবং ব্যথিত রমণীর সেই ম্লানমুখ অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম।

রাত্রে শুইতে আসিয়া স্ত্রীকে বলিলাম, 'নির্ঝর, যে খাতায় তোমার লেখাগুলি আছে সেটা কোথায়।'

নির্ঝরিণী কহিল, 'কেন, সে লইয়া তুমি কী করিবে।'

আমি কহিলাম, 'আমি ছাপিতে দিব।'

নির্ঝরিণী। আহা আর ঠাট্টা করিতে হইবে না।

আমি। না, ঠাট্টা করিতেছি না। সত্যই ছাপিতে দিব।

নির্ঝরিণী। সে কোথায় গেছে জানি না।

আমি কিছু জেদের সঙ্গেই বলিলাম 'না নির্ঝর, সে কিছুতেই হইবে না। বলো, সেটা কোথায় আছে।'

নির্ঝরিণী কহিল, 'সত্যই সেটা নাই।'

আমি। কেন, কী হইল।

নির্ঝরিণী। সে আমি পুড়াইয়া ফেলিয়াছি।

আমি চমকিয়া উঠিয়া কহিলাম, 'অ্যাঁ, সে কী। কবে পুড়াইলে।'

নির্ঝরিণী। আজই পুড়াইয়াছি। আমি কি জানি না যে, আমার লেখা ছাই লেখা। স্ত্রীলোকের রচনা বলিয়া লোকে মিথ্যা করিয়া প্রশংসা করে।

ইহার পর হইতে এ পর্যন্ত নির্ঝরকে সাধ্যসাধনা করিয়াও একছত্র লিখাইতে পারি নাই। ইতি শ্রীহরিশচন্দ্র হালদার।

উপরে যে গল্পটি লেখা হইয়াছে তাহার পনেরো আনাই গল্প। আমার স্বামী যে বাংলা কত অল্প জানেন, তাহা তাঁহার রচিত উপন্যাসটি পড়িলেই কাহারো বুঝিতে বাকি থাকিবে না। ছিছি নিজের স্ত্রীকে লইয়া এমনি করিয়া কি গল্প বানাইতে হয়? ইতি নির্ঝরিনি দেবী।

স্ত্রীলোকের চাতুরি সম্বন্ধে দেশি-বিদেশি শাস্ত্রে-অশাস্ত্রে অনেক কথা আছে — তাহাই স্মরণ করিয়া পাঠকেরা ঠকিবেন না। আমার রচনাটুকুর ভাষা ও বানান কে সংশোধন করিয়া দিয়াছেন, সে কথা আমি বলিব না — না বলিলেও বিজ্ঞ অনুমান করিতে পারিবেন। আমার স্ত্রী যে কয়-লাইন লিখিয়াছেন তাহার বানান-ভুলগুলি দেখিলেই পাঠক বুঝিবেন, সেগুলি ইচ্ছাকৃত; তাঁহার স্বামী যে বাংলায় পরমপণ্ডিত এবং গল্পটা যে আষাঢ়ে, ইহাই প্রমাণ করিবার এই অতি সহজ উপায়। তিনি বাহির করিয়াছেন — এই জন্যই কালিদাস লিখিয়াছেন, স্ত্রীণামশিক্ষিতপটুত্বম্। তিনি স্ত্রীচরিত্র বুঝিতেন। আমিও সম্প্রতি চোখ-ফোটার পর হইতে বুঝিতে শুরু করিয়াছি। কালে হয়তো কালিদাস হইয়া উঠিতেও পারিব। কালিদাসের সঙ্গে আরও একটু সাদৃশ্য দেখিতেছি। শুনিয়াছি, কবিবর নববিবাহের পর তাঁহার বিদুষী স্ত্রীকে যে শ্লোক রচনা করিয়া শোনান তাহাতে উষ্ট্রশব্দ হইতে রফলাটা লোপ করিয়াছিলেন — শব্দপ্রয়োগ সম্বন্ধে এরূপ দুর্ঘটনা বর্তমান লেখকের দ্বারাও অনেক ঘটিয়াছে —অতএব, সমস্ত গভীরভাবে পর্যালোচনা করিয়া আশা হইতেছে, কালিদাসের যেরূপ পরিণাম হইয়াছিল, আমার পক্ষেও তাহা অসম্ভব নহে। ইতি শ্রীহঃ

এ গল্প যদি ছাপানো হয়, আমি বাপের বাড়ি চলিয়া যাইব। শ্রীমতী নিঃ

আমিও তৎক্ষণাৎ শ্বশুরবাড়ি যাত্রা করিব। শ্রীহঃ

খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন

প্রথম পরিচ্ছেদ

রাইচরণ যখন বাবুদের বাড়ি প্রথম চাকরি করিতে আসে তখন তাহার বয়স বারো। যশোহর জিলায় বাড়ি, লম্বা চুল, বড়ো বড়ো চোখ, শ্যামচিক্কণ ছিপছিপে বালক। জাতিতে কায়স্থ। তাহার প্রভুরাও কায়স্থ। বাবুদের এক-বৎসর-বয়স্ক একটি শিশুর রক্ষণ ও পালন-কার্যে সহায়তা করা তাহার প্রধান কর্তব্য ছিল।

সেই শিশুটি কালক্রমে রাইচরণের কক্ষ ছাড়িয়া স্কুলে, স্কুল ছাড়িয়া কলেজে অবশেষে কলেজ ছাড়িয়া মুনসেফিতে প্রবেশ করিয়াছে। রাইচরণ এখনো তাঁহার ভৃত্য।

তাহার আর একটি মনিব বাড়িয়াছে। মাঠাকুরানি ঘরে আসিয়াছেন; সুতরাং অনুকূলবাবুর উপর রাইচরণের পূর্বে যতটা অধিকার ছিল তাহার অধিকাংশই নূতন কর্ত্রীর হস্তগত হইয়াছে।

কিন্তু কর্ত্রী যেমন রাইচরণের পূর্বাধিকার কতকটা হ্রাস করিয়া লইয়াছেন তেমনি একটি নূতন অধিকার দিয়া অনেকটা পূরণ করিয়া দিয়াছেন। অনুকূলের একটি পুত্রসন্তান অল্পদিন হইল জন্মলাভ করিয়াছে এবং রাইচরণ কেবল নিজের চেষ্টা ও অধ্যবসায়ে তাহাকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিয়া লইয়াছে।

তাহাকে এমনি উৎসাহের সহিত দোলাইতে আরম্ভ করিয়াছে, এমনি নিপুণতার সহিত তাহাকে দুই হাতে ধরিয়া আকাশে উৎক্ষিপ্ত করে, তাহার মুখের কাছে আসিয়া এমনি সশব্দে শিরশ্চালন করিতে থাকে, উত্তরের কোনো প্রত্যাশা না করিয়া এমন সকল সম্পূর্ণ অর্থহীন অসংগত প্রশ্ন সুর করিয়া শিশুর প্রতি প্রয়োগ করিতে থাকে যে, এই ক্ষুদ্র আনুকৌলবটি রাইচরণকে দেখিলে একেবারে পুলকিত হইয়া উঠে।

অবশেষে ছেলেটি যখন হামাগুড়ি দিয়া অতি সাবধানে চৌকাঠ পার হইত এবং কেহ ধরিতে আসিলে খিলখিল হাস্যকলবর তুলিয়া দ্রুতবেগে নিরাপদ স্থানে লুকাইতে চেষ্টা করিত, তখন রাইচরণ তাহার অসাধারণ চাতুর্য ও বিচারশক্তি দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া যাইত। মার কাছে গিয়া সগর্ব সবিস্ময়ে বলিত, 'মা তোমার ছেলে বড়ো হলে জজ হবে, পাঁচ হাজার টাকা রোজগার করবে।'

পৃথিবীতে আর কোনো মানবসন্তান যে এই বয়সে চৌকাঠ লঙ্ঘন প্রভৃতি অসম্ভব চাতুর্যের পরিচয় দিতে পারে তাহা রাইচরণের ধ্যানের অগম্য, কেবল ভবিষ্যৎ জজেদের পক্ষে কিছুই আশ্চর্য নহে।

অবশেষে শিশু যখন টল্‌মল্‌ করিয়া চলিতে আরম্ভ করিল সে এক আশ্চর্য ব্যাপার — এবং যখন মাকে মা, পিসিকে পিচি এবং রাইচরণকে চন্ন বলিয়া সম্ভাষণ করিল, তখন রাইচরণ সেই প্রত্যয়াতীত সংবাদ যাহার তাহার কাছে ঘোষণা করিতে লাগিল।

সব চেয়ে আশ্চর্যের বিষয় এই যে 'মাকে মা বলে, পিসিকে পিসি বলে, কিন্তু আমাকে বলে চন্ন।' বাস্তবিক, শিশুটির মাথায় এ বুদ্ধি কী করিয়া জোগাইল বলা শক্ত। নিশ্চয়ই কোনো বয়স্ক লোক কখনো এরূপ অলোকসামান্যতার পরিচয় দিত না, এবং দিলেও তাহার জজের পদপ্রাপ্তি সম্ভাবনা সম্বন্ধে সাধারণের সন্দেহ উপস্থিত হইত।

কিছুদিন বাদে মুখে দড়ি দিয়া রাইচরণকে ঘোড়া সাজিতে হইল। এবং মল্ল সাজিয়া তাহাকে শিশুর সহিত কুস্তি করিতে হইত — আবার পরাভূত হইয়া ভূমিতে পড়িয়া না গেলে বিষম বিপ্লব বাধিত।

এই সময়ে অনুকূল পদ্মাতীরবর্তী এক জিলায় বদলি হইলেন। অনুকূল তাঁহার শিশুর জন্য কলিকাতা হইতে এক ঠেলাগাড়ি লইয়া গেলেন। সাটিনের জামা এবং মাথায় জরির টুপি, হাতে সোনার বালা এবং পায়ে দুইগাছি মল পরাইয়া রাইচরণ নবকুমারকে দুইবেলা গাড়ি করিয়া হাওয়া খাওয়াইতে লইয়া যাইত।

বর্ষাকাল আসিল। ক্ষুধিত পদ্মা উদ্যান গ্রাম শস্যক্ষেত্র এক-এক গ্রাসে মুখে পুরিতে লাগিল। বালুকাচরের কাশবন এবং বনঝাউ জলে ডুবিয়া গেল। পাড় ভাঙার অবিশ্রাম ঝুপঝাপ শব্দ এবং জলের গর্জনে দশ দিক মুখরিত হইয়া উঠিল, এবং দ্রুত বেগে ধাবমান ফেনরাশি নদীর তীব্র গতিকে প্রত্যক্ষগোচর করিয়া তুলিল।

অপরাহ্ণে মেঘ করিয়াছিল, কিন্তু বৃষ্টির কোনো সম্ভাবনা ছিল না। রাইচরণের খামখেয়ালি ক্ষুদ্র প্রভু কিছুতেই ঘরে থাকিতে চাহিল না। গাড়ির উপর চড়িয়া বসিল। রাইচরণ ধীরে ধীরে গাড়ি ঠেলিয়া ধান্যক্ষেত্রের প্রান্তে নদীর তীরে আসিয়া উপস্থিত হইল। নদীতে একটিও নৌকা নাই, মাঠে একটিও লোক নাই — মেঘের ছিদ্র দিয়া দেখা গেল, পরপারে জনহীন বালুকাতীরে শব্দহীন দীপ্ত সমারোহের সহিত সূর্যাস্তের আয়োজন হইতেছে। সেই নিস্তব্ধতার মধ্যে শিশু সহসা এক দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিল, 'চন্ন, ফু।'

অনতিদূরে সজল পঙ্কিল ভূমির উপর একটি বৃহৎ কদম্ববৃক্ষের উচ্চশাখায় গুটিকতক কদম্বফুল ফুটিয়াছিল, সেই দিকে শিশুর লুব্ধ দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল। দুই-চারি দিন হইল রাইচরণ কাঠি দিয়া বিদ্ধ করিয়া তাহাকে কদম্বফুলের গাড়ি বানাইয়া দিয়াছিল, তাহাতে দড়ি বাঁধিয়া টানিতে এত আনন্দ বোধ হইয়াছিল যে সেদিন রাইচরণকে আর লাগাম পরিতে হয় নাই; ঘোড়া হইতে সে একেবারেই সহিসের পদে উন্নীত হইয়াছিল।

কাদা ভাঙিয়া ফুল তুলিতে যাইতে চন্নর প্রবৃত্তি হইল না — তাড়াতাড়ি বিপরীত দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিল, 'দেখো দেখো ও — ই দেখো পাখি — ওই উড়ে — এ গেল। আয় রে পাখি আয় আয়।' এইরূপ অবিশ্রান্ত বিচিত্র কলরব করিতে করিতে সবেগে গাড়ি ঠেলিতে লাগিল।

কিন্তু যে ছেলের ভবিষ্যতে জজ হইবার কোনো সম্ভাবনা আছে তাহাকে এরূপ সামান্য উপায়ে ভুলাইবার প্রত্যাশা করা বৃথা — বিশেষত চারি দিকে দৃষ্টি আকর্ষণের উপযোগী কিছুই ছিল না এবং কাল্পনিক পাখি লইয়া অধিকক্ষণ কাজ চলে না।

রাইচরণ বলিল, ' তবে তুমি গাড়িতে বসে থাকো, আমি চট করে ফুল তুলে আনছি। খবরদার, জলের ধারে যেয়ো না।' বলিয়া হাঁটুর উপর কাপড় তুলিয়া কদম্ববৃক্ষের অভিমুখে চলিল।

কিন্তু, ওই-যে জলের ধারে যাইতে নিষেধ করিয়া গেল, তাহাতে শিশুর মন কদম্বফুল হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া সেই মুহূর্তেই জলের দিকে ধাবিত হইল। দেখিল, জল খল্ খল্ ছল্ ছল্ করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে; যেন দুষ্টামি করিয়া কোন্ এক বৃহৎ রাইচরণের হাত এড়াইয়া এক লক্ষ শিশুপ্রবাহ সহাস্য কলরবে নিষিদ্ধ স্থানাভিমুখে দ্রুত বেগে পলায়ন করিতেছে।

তাহাদের সেই অসাধু দৃষ্টান্তে মানবশিশুর চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। গাড়ি হইতে আস্তে আস্তে নামিয়া জলের ধারে গেল, একটা দীর্ঘ তৃণ কুড়াইয়া লইয়া তাহাকে ছিপ কল্পনা করিয়া ঝুঁকিয়া মাছ ধরিতে লাগিল — দুরন্ত জলরাশি অস্ফুট কলভাষায় শিশুকে বার বার আপনাদের খেলাঘরে আহ্বান করিল।

একবার ঝপ করিয়া একটা শব্দ হইল, কিন্তু বর্ষার পদ্মাতীরে এমন শব্দ কত শোনা যায়। রাইচরণ আঁচল ভরিয়া কদম্বফুল তুলিল। গাছ হইতে নামিয়া সহাস্য মুখে গাড়ির কাছে আসিয়া দেখিল, কেহ নাই। চারি দিকে চাহিয়া দেখিল কোথাও কাহারও কোনো চিহ্ন নাই।

মুহূর্তে রাইচরণের শরীরের রক্ত হিম হইয়া গেল। সমস্ত জগৎসংসার মলিন বিবর্ণ ধোঁয়ার মতো হইয়া আসিল। ভাঙা বুকের মধ্য হইতে একবার প্রাণপণ চিৎকার করিয়া ডাকিয়া উঠিল, ‘বাবু — খোকাবাবু —লক্ষ্মী দাদাবাবু আমার।’

কিন্তু চন্ন বলিয়া কেহ উত্তর দিল না, দুষ্টামি করিয়া কোনো শিশুর কণ্ঠ হাসিয়া উঠিল না; কেবল পদ্মা পূর্ববৎ ছল্ ছল্ খল্ খল্ করিয়া ছুটিয়া চলিতে লাগিল, যেন সে কিছুই জানে না এবং পৃথিবীর এই সকল সামান্য ঘটনায় মনোযোগ দিতে তাহার যেন এক মুহূর্ত সময় নাই।

সন্ধ্যা হইয়া আসিলে উৎকণ্ঠিত জননী চারি দিকে লোক পাঠাইয়া দিলেন। লণ্ঠন হাতে নদীতীরে লোক আসিয়া দেখিল, রাইচরণ নিশীথের ঝোড়ো বাতাসের মতো সমস্ত ক্ষেত্রময় ‘বাবু’—খোকাবাবু আমার’ বলিয়া ভগ্নকণ্ঠে চিৎকার করিয়া বেড়াইতেছে। অবশেষে ঘরে ফিরিয়া রাইচরণ দড়াম করিয়া মাঠাকরুনের পায়ের কাছে আসিয়া আছাড় খাইয়া পড়িল। তাহাকে যত জিজ্ঞাসা করে সে কাঁদিয়া বলে, ‘জানি নে মা।’

যদিও সকলেই মনে মনে বুঝিল পদ্মারই এই কাজ, তথাপি গ্রামের প্রান্তে যে এক দল বেদের সমাগম হইয়াছে তাহাদের প্রতিও সন্দেহ দূর হইল না। এবং মাঠাকুরানির মনে এমন সন্দেহ উপস্থিত হইল যে রাইচরণ বা চুরি করিয়াছে; এমন কী তাহাকে ডাকিয়া অত্যন্ত অনুনয়পূর্বক বলিলেন, তুই আমার বাছাকে ফিরিয়ে এনে দে — তুই যত টাকা চাস তোকে দেব। শুনিয়া রাইচরণ কেবল কপালে করাঘাত করিল। গৃহিণী তাহাকে দূর করিয়া তাড়াইয়া দিলেন।

অনুকূলবাবু তাহার স্ত্রীর মন হইতে রাইচরণের প্রতি এই অন্যায় সন্দেহ দূর করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন রাইচরণ এমন জঘন্য কাজ কী উদ্দেশ্যে করিতে পারে। গৃহিণী বলিলেন, ‘কেন। তাহার গায়ে সোনার গহনা ছিল।’

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাইচরণ দেশে ফিরিয়া গেল। এতকাল তাহার সন্তানাদি হয় নাই, হইবার বিশেষ আশাও ছিল না। কিন্তু দৈবক্রমে, বৎসর না যাইতেই, তাহার স্ত্রী অধিক বয়সে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করিয়া লোকলীলা সম্বরণ করিল।

এই নবজাত শিশুটির প্রতি রাইচরণের অত্যন্ত বিদ্বেষ জন্মিল। মনে করিল, এ যেন ছল করিয়া খোকাবাবুর স্থান অধিকার করিতে আসিয়াছে। মনে করিল, প্রভুর একমাত্র ছেলেটি জলে ভাসাইয়া নিজে পুত্রসুখ উপভোগ করা যেন একটি মহাপাতক। রাইচরণের বিধবা ভগ্নী যদি না থাকিত তবে এ শিশুটি পৃথিবীর বায়ু বেশিদিন ভোগ করিতে পাইত না।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই ছেলেটিও কিছুদিন বাদে চৌকাঠ পার হইতে আরম্ভ করিল এবং সর্বপ্রকার নিষেধ লঙ্ঘন করিতে সকৌতুক প্রকাশ করিতে লাগিল। এমন কী, ইহার কণ্ঠস্বর হাস্যক্রন্দনধ্বনি অনেকটা সেই শিশুরই মতো। এক-একদিন যখন ইহার কান্না শুনিত রাইচরণের বুকটা সহসা ধড়াস্ করিয়া উঠিত, মনে হইত দাদাবাবু রাইচরণকে হারাইয়া কোথায় কাঁদিতেছে।

ফেল্না — রাইচরণের ভগ্নী ইহার নাম রাখিয়াছিল ফেল্না — যথাসময়ে পিসিকে পিসি বলিয়া ডাকিল। সেই পরিচিত ডাক শুনিয়া একদিন হঠাৎ রাইচরণের মনে হইল, 'তবে তো খোকাবাবু আমার মায়া ছাড়িতে পারে নাই, সে তো আমার ঘরে আসিয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছে।'

এই বিশ্বাসের অনুকূলে কতকগুলি অকাট্য যুক্তি ছিল। প্রথমত, সে যাইবার অনতিবিলম্বেই ইহার জন্ম। দ্বিতীয়ত, এতকাল পরে সহসা যে তাহার স্ত্রীর গর্ভে সন্তান জন্মে এ কখনোই স্ত্রীর নিজগুণে হইতে পারে না। তৃতীয়ত, এও হামাগুড়ি দেয়, টল্‌মল্ করিয়া চলে এবং পিসিকে পিসি বলে। যে সকল লক্ষণ থাকিলে ভবিষ্যতে জজ হইবার কথা তাহার অনেকগুলি ইহাতে বর্তিয়াছে।

তখন মাঠাকরুনের সেই দারুন সন্দেহের কথা হঠাৎ মনে পড়িল — আশ্চর্য হইয়া মনে মনে কহিল, 'আহা, মায়ের মন জানিতে পারিয়াছিল তাহার ছেলেকে কে চুরি করিয়াছে।' তখন, এতদিন শিশুকে যে অযত্ন করিয়াছে সেজন্য বড়ো অনুতাপ উপস্থিত হইল। শিশুর কাছে আবার ধরা দিল।

এখন হইতে ফেল্নাকে রাইচরণ এমন করিয়া মানুষ করিতে লাগিল যেন সে বড়ো ঘরের ছেলে। সাটিনের জামা কিনিয়া দিল। জরির টুপি আনিল। মৃত স্ত্রীর গহনা গলাইয়া চুড়ি এবং বালা তৈয়ারি হইল। পাড়ার কোনো ছেলের সহিত তাহাকে খেলিতে দিত না; রাত্রিদিন নিজেই তাহার একমাত্র খেলার সঙ্গী হইল। পাড়ার ছেলে সুযোগ পাইলে তাহাকে নবাবপুত্র বলিয়া উপহাস করিত এবং দেশের লোক রাইচরণের এইরূপ উন্মত্তবৎ আচরণে আশ্চর্য হইয়া গেল।

ফেল্নার যখন বিদ্যাভ্যাসের বয়স হইল তখন রাইচরণ নিজে জোৎজমা সমস্ত বিক্রয় করিয়া ছেলেটিকে লইয়া গেল। সেখানে বহু কষ্টে একটি চাকরি যোগাড় করিয়া ফেল্নাকে বিদ্যালয়ে পাঠাইল। নিজে যেমন তেমন করিয়া থাকিয়া ছেলেকে ভালো খাওয়া, ভালো পরা, ভালো শিক্ষা দিতে ত্রুটি করিত না। মনে মনে বলিত, 'বৎস, ভালোবাসিয়া আমার ঘরে আসিয়াছ বলিয়া যে তোমার কোনো অযত্ন হইবে, তা হইবে না।'

এমনি করিয়া বারো বৎসর কাটিয়া গেল। ছেলে পড়ে শুনে ভালো এবং দেখিতে শুনিতেও বেশ হৃষ্টপুষ্ট, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ — কেশবেশবিন্যাসের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি, মেজাজ কিছু সুখী এবং শৌখিন। বাপকে ঠিক বাপের মতো মনে করিতে পারিত না। কারণ, রাইচরণ স্নেহে বাপ এবং সেবায় ভৃত্য ছিল, এবং তাহার আর একটি দোষ ছিল সে যে ফেল্নার বাপ এ কথা সকলের কাছেই গোপন রাখিয়াছিল। যে ছাত্রনিবাসে ফেল্না বাস করিত সেখানকার ছাত্রগণ বাঙাল রাইচরণকে লইয়া সর্বদা কৌতুক করিত এবং পিতার অসাক্ষাতে ফেল্নাও যে সেই কৌতুকালাপে যোগ দিত না তাহা বলিতে পারি না। অথচ নিরীহ বৎসলস্বভাব রাইচরণকে সকল ছাত্রই বড়ো ভালোবাসিত, এবং ফেল্নাও ভালোবাসিত, কিন্তু পূর্বে বলিয়াছি ঠিক বাপের মতো নহে —তাহাতে কিঞ্চিৎ অনুগ্রহ মিশ্রিত ছিল।

রাইচরণ বৃদ্ধ হইয়া আসিয়াছে। তাহার প্রভু কাজকর্মে সর্বদাই দোষ ধরে। বাস্তবিক তাহার শরীরও শিথিল হইয়া আসিয়াছে, কাজেও তেমন মন দিতে পারে না, কেবলই ভুলিয়া যায় — কিন্তু, যে ব্যক্তি

পুরা বেতন দেয় বার্ধক্যের ওজর সে মানিতে চাহে না। এ দিকে রাইচরণের বিষয় বিক্রয় করিয়া যে নগদ টাকা সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিল তাহাও নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছে। ফেল্‌না আজকাল বসনভূষণের অভাব লইয়া সর্বদা খুঁৎ খুঁৎ করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

একদিন রাইচরণ হঠাৎ কর্মে জবাব দিল এবং ফেল্‌নাকে কিছু টাকা দিয়া বলিল, 'আবশ্যক পড়িয়াছে, আমি কিছু দিনের মতো দেশে যাইতেছি।' এই বলিয়া বারাসতে গিয়া উপস্থিত হইল। অনুকূলবাবু তখন সেখানে মুনসেফ ছিলেন।

অনুকূলের আর দ্বিতীয় সন্তান হয় নাই, গৃহিণী এখনো সেই পুত্রশোক বক্ষের মধ্যে লালন করিতেছিলেন।

একদিন সন্ধ্যার সময় বাবু কাছারি হইতে আসিয়া বিশ্রাম করিতেছেন এবং কর্ত্রী একটি সন্ন্যাসীর নিকট হইতে সন্তানকামনায় বহুমূল্যে একটি শিকড় ও আশীর্বাদ কিনিতেছেন, এমন সময়ে প্রাঙ্গণে শব্দ উঠিল 'জয় হোক মা'।

বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কে রে'।

রাইচরণ আসিয়া প্রণাম করিয়া বলিল, 'আমি রাইচরণ।'

বৃদ্ধকে দেখিয়া অনুকূলের হৃদয় আর্দ্র হইয়া উঠিল। তাহার বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে সহস্র প্রশ্ন এবং আবার তাহাকে কর্মে নিয়োগ করিবার প্রস্তাব করিলেন।

রাইচরণ ম্লান হাস্য করিয়া কহিল, 'মাঠাকরুনকে একবার প্রণাম করিতে চাই।'

অনুকূল তাহাকে সঙ্গে করিয়া অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন। মাঠাকরুন রাইচরণকে তেমন প্রসন্নভাবে সমাদর করিলেন না; রাইচরণ তৎপ্রতি লক্ষ না করিয়া জোড়হস্তে কহিল, 'প্রভু, মা, আমিই তোমাদের ছেলেকে চুরি করিয়া লইয়াছিলাম। পদ্মাও নয়, আর কেহ নয়, কৃতঘ্ন অধম এই আমি —'

অনুকূল বলিয়া উঠিলেন, 'বলিস কী রে। কোথায় সে।'

'আজ্ঞে, আমার কাছেই আছে, আমি পরশ্ব আনিয়া দিব।'

সেদিন রবিবার, কাছারি নাই। প্রাতঃকাল হইতে স্ত্রী পুরুষ দুইজনে উন্মুখভাবে পথ চাহিয়া বসিয়া আছেন। দশটার সময় ফেল্‌নাকে সঙ্গে লইয়া রাইচরণ আসিয়া উপস্থিত হইল।

অনুকূলের স্ত্রী কোনো প্রশ্ন কোনো বিচার না করিয়া, তাহাকে কোলে বসাইয়া, তাহাকে স্পর্শ করিয়া, তাহার আঘ্রাণ লইয়া, অতৃপ্তনয়নে তাহার মুখ নিরীক্ষণ করিয়া, কাঁদিয়া হাসিয়া ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। বাস্তবিক, ছেলেটি দেখিতে বেশ — বেশভূষা আকার প্রকারে দারিদ্র্যের কোনো লক্ষণ নাই। মুখে অত্যন্ত প্রিয়দর্শন বিনীত সলজ্জ ভাব। দেখিয়া অনুকূলের হৃদয়েও সহসা স্নেহ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

তথাপি তিনি অবিচলিত ভাব ধারণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কোনো প্রমাণ আছে?'

রাইচরণ কহিল, 'এমন কাজের প্রমাণ কী করিয়া থাকিবে। আমি যে তোমার ছেলে চুরি করিয়াছিলাম সে কেবল ভগবান জানেন, পৃথিবীতে আর কেহ জানে না।'

অনুকূল ভাবিয়া স্থির করিলেন যে, ছেলেটিকে পাইবামাত্র তাঁহার স্ত্রী যেরূপ আগ্রহের সহিত তাহাকে আগলাইয়া ধরিয়াছেন এখন প্রমাণসংগ্রহের চেষ্টা করা সুযুক্তি নহে; যেমনই হউক, বিশ্বাস করাই ভালো। তা ছাড়া, রাইচরণ এমন ছেলেই বা কোথায় পাইবে। এবং বৃদ্ধ ভৃত্য তাঁহাকে অকারণে প্রতারণাই বা কেন করিবে।

ছেলেটির সহিতও কথোপকথন করিয়া জানিলেন যে, সে শিশুকাল হইতে রাইচরণের সহিত আছে এবং রাইচরণকে সে পিতা বলিয়া জানিত, কিন্তু রাইচরণ কখনো তাহার প্রতি পিতার ব্যবহার করে নাই, অনেকটা ভৃত্যের ভাব ছিল।

অনুকূল মন হইতে সন্দেহ দূর করিয়া বলিলেন, 'কিন্তু রাইচরণ, তুই আর আমাদের ছায়া মাড়াইতে পাইবি না।'

রাইচরণ করজোড়ে গদ্ গদ্ কণ্ঠে বলিল, 'প্রভু বৃদ্ধবয়সে কোথায় যাইব।'

কর্ত্রী বলিলেন, 'আহা থাক। আমার বাছার কল্যাণ হউক। ওকে আমি মাপ করিলাম।'

ন্যায়পরায়ণ অনুকূল কহিলনে, 'যে কাজ করিয়াছে উহাকে মাপ করা যায় না।'

রাইচরণ অনুকূলের পা জড়াইয়া কহিল, 'আমি করি নাই, ঈশ্বর করিয়াছেন।'

নিজের পাপ ঈশ্বরের স্কন্ধে চাপাইবার চেষ্টা দেখিয়া অনুকূল আরও বিরক্ত হইয়া কহিলেন, 'যে এমন বিশ্বাসঘাতকতার কাজ করিয়াছে তাহাকে আর বিশ্বাস করা কর্তব্য নয়।'

রাইচরণ প্রভুর পা ছাড়িয়া কহিল, 'সে আমি নয় প্রভু।'

'তবে কে।'

'আমার অদৃষ্ট।'

কিন্তু, এরূপ কৈফিয়তে কোনো শিক্ষিত লোকের সন্তোষ হইতে পারে না।

রাইচরণ বলিল, 'পৃথিবীতে আমার আর-কেহ নাই।'

ফেল্না যখন দেখিল সে মুনসেফের সন্তান, রাইচরণ তাহাকে এত দিন চুরি করিয়া নিজের ছেলে বলিয়া অপমানিত করিয়াছে, তখন তাহার মনে মনে কিছু রাগ হইল। কিন্তু, তথাপি উদারভাবে পিতাকে বলিল, 'বাবা উহাকে মাপ করো। বাড়িতে থাকিতে না দাও, উহার মাসিক কিছু টাকা বরাদ্দ করিয়া দাও।'

ইহার পর রাইচরণ কোনো কথা না বলিয়া একবার পুত্রের মুখ নিরীক্ষণ করিল, সকলকে প্রণাম করিল; তাহার পর দ্বারের বাহির হইয়া পৃথিবীর অগণ্য লোকের মধ্যে মিশিয়া গেল। মাসান্তে অনুকূল যখন তাহার দেশের ঠিকানায় কিঞ্চিৎ বৃত্তি পাঠাইলেন তখন সে টাকা ফিরিয়া আসিল। সেখানে কোনো লোক নাই।

সুভা

১

মেয়েটির নাম যখন সুভাষিণী রাখা হইয়াছিল তখন কে জানিত সে বোবা হইবে। তাহার দুটি বড়ো বোনকে সুকেশিনী ও সুহাসিনী নাম দেওয়া হইয়াছিল, তাই মিলের অনুরোধে তাহার বাপ ছোটো মেয়েটির নাম সুভাষিণী রাখে। এখন সকলে তাহাকে সংক্ষেপে সুভা বলে।

দস্তুরমতো অনুসন্ধান ও অর্থব্যয়ে বড়ো দুটি মেয়ের বিবাহ হইয়া গেছে, এখন ছোটোটি পিতামাতার নীরব হৃদয়ভারের মতো বিরাজ করিতেছে।

যে কথা কয় না সে যে অনুভব করে, ইহা সকলের মনে হয় না, এইজন্য তাহার সাক্ষাতেই সকলে তাহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে দুশ্চিন্তা প্রকাশ করিত। সে যে বিধাতার অভিশাপস্বরূপে তাহার পিতৃগৃহে আসিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে, এ কথা সে শিশুকাল হইতে বুঝিয়া লইয়াছিল। তাহার ফল এই হইয়াছিল, সাধারণের দৃষ্টিপথ হইতে সে আপনাকে গোপন করিয়া রাখিতে সর্বদাই চেষ্টা করিত। মনে করিত, আমাকে সবাই ভুলিলে বাঁচি। কিন্তু বেদনা কি কেহ কখনো ভোলে। পিতামাতার মনে সে সর্বদাই জাগরূক ছিল।

বিশেষত, তাহার মা তাহাকে নিজের একটা ত্রুটিস্বরূপ দেখিতেন। কেননা, মাতা পুত্র অপেক্ষা কন্যাকে নিজের অংশরূপ দেখেন — কন্যার কোনো অসম্পূর্ণতা দেখিলে সেটা যেন বিশেষরূপে নিজের লজ্জার কারণ বলিয়া মনে করেন। বরঞ্চ, কন্যার পিতা বাণীকণ্ঠ সুভাকে তাঁহার অন্য মেয়েদের অপেক্ষা যেন একটু-বেশি ভালোবাসিতেন, কিন্তু মাতা তাহাকে নিজের গর্ভের কলঙ্ক জ্ঞান করিয়া তাহার প্রতি বড়ো বিরক্ত ছিলেন।

সুভার কথা ছিল না, কিন্তু তাহার সুদীর্ঘপল্লববিশিষ্ট বড়ো বড়ো দুটি কালো চোখ ছিল — এবং তাহার ওষ্ঠাধর ভাবের আভাসমাত্রে কচি কিশলয়ের মতো কাঁপিয়া উঠিত।

কথায় আমরা যে-ভাব প্রকাশ করি, সেটা আমাদিগকে অনেকটা নিজের চেষ্টায় গড়িয়া লইতে হয়, কতকটা করার মতো; সকল সময়ে ঠিক হয় না, ক্ষমতা-অভাবে অনেক সময়ে ভুলও হয়। কিন্তু কালো চোখকে কিছু তর্জমা করিতে হয় না— মন আপনি তাহার উপরে ছায়া ফেলে, ভাব আপনি তাহার উপরে কখনো প্রসারিত কখনো মুদিত হয়, কখনো উজ্জ্বলভাবে জ্বলিয়া উঠে, কখনো অস্তমান চন্দ্রের মতো অনিমেষভাবে চাহিয়া থাকে, কখনো দ্রুত চঞ্চল বিদ্যুতের মতো দিগ্বিদিকে ঠিকরিয়া উঠে। মুখের ভাব বই আজন্মকাল যাহার অন্য ভাষা নাই, তাহার চোখের ভাষা অসীম উদার এবং অতলস্পর্শ গভীর — অনেকটা স্বচ্ছ আকাশের মতো, উদয়াস্ত এবং ছায়ালোকের নিস্তব্ধ রঙ্গভূমি। এই বাক্যহীন মনুষ্যের মধ্যে বৃহৎ প্রকৃতির মতো একটা বিজন মহত্ত্ব আছে। এই জন্য সাধারণ বালকবালিকারা তাহাকে এক প্রকার ভয় করিত, তাহার সহিত খেলা করিত না। সে নির্জন দ্বিপ্রহরের মতো শব্দহীন এবং সঙ্গীহীন।

২

গ্রামের নাম চণ্ডীপুর। নদীটি বাংলাদেশের একটি ছোটো নদী, গৃহস্থ ঘরের আপন মেয়েটির মতো; বহুদূর পর্যন্ত তাহার প্রসার নহে; নিরলসা তন্বী নদীটি আপন কূল রক্ষা করিয়া কাজ করিয়া যায়; দুই ধারের গ্রামের সকলেরই সঙ্গে তাহার যেন একটা-না-একটা সম্পর্ক আছে। দুই ধারে লোকালয় এবং তরুচ্ছায়াঘন উচ্চতট; নিম্নতল দিয়া গ্রামলক্ষ্মী স্রোতস্বিনী আত্মবিস্মৃত দ্রুতপদক্ষেপে প্রফুল্লহৃদয়ে আপনার অসংখ্য কল্যাণকার্যে চলিয়াছে।

বাণীকণ্ঠের ঘর নদীর একেবারে উপরেই। তাহার বাঁখারির বেড়া, আটচালা, গোয়ালঘর, ঢেঁকিশালা, খড়ের স্তূপ, তেঁতুলতলা, আম কাঁঠাল এবং কলার বাগান নৌকাবাহীমাত্রেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই গার্হস্থ্য সচ্ছলতার মধ্যে বোবা মেয়েটি কাহারও নজরে পড়ে কিনা জানি না, কিন্তু কাজকর্মে যখনি অবসর পায় তখনি সে এই নদীতীরে আসিয়া বসে।

প্রকৃতি যেন তাহার ভাষার অভাব পূরণ করিয়া দেয়। যেন তাহার হইয়া কথা কয়। নদীর কলধ্বনি, লোকের কোলাহল, মাঝির গান, পাখির ডাক, তরুর মর্মর, সমস্ত মিশিয়া চারিদিকের চলাফেরা আন্দোলন কম্পনের সহিত এক হইয়া, সমুদ্রের তরঙ্গরাশির ন্যায়, বালিকার চিরনিস্তব্ধ হৃদয় উপকূলের নিকটে আসিয়া ভাঙিয়া ভাঙিয়া পড়ে। প্রকৃতির এই বিবিধ শব্দ এবং বিচিত্র গতি, ইহাও বোবার ভাষা — বড়ো বড়ো চক্ষুপল্লববিশিষ্ট সুভার যে-ভাষা তাহারই একটা বিশ্বব্যাপী বিস্তার; ঝিল্লিরবপূর্ণ তৃণভূমি হইতে শব্দাতীত নক্ষত্রলোক পর্যন্ত কেবল ইঙ্গিত, ভঙ্গি, সংগীত, ক্রন্দন এবং দীর্ঘনিশ্বাস।

এবং মধ্যাহ্ন মাঝিরা জেলেরা খাইতে যাইত, গৃহস্থেরা ঘুমাইয়া, পাখিরা ডাকিত না, খেয়া নৌকা বন্ধ থাকিত, সজন জগৎ সমস্ত কাজকর্মের মাঝখানে সহসা থামিয়া গিয়া ভয়ানক বিজন মূর্তি ধারণ করিত, তখন রুদ্র মহাকাশের তলে কেবল একটি বোবা প্রকৃতি এবং একটি বোবা মেয়ে মুখামুখি চুপ করিয়া বসিয়া থাকিত — একজন সুবিস্তীর্ণ রৌদ্রে আর একজন ক্ষুদ্র তরুচ্ছায়ায়।

সুভার যে গুটিকতক অন্তরঙ্গ বন্ধুর দল ছিল না, তাহা নহে। গোয়ালের দুটি গাভী, তাহাদের নাম সর্বশী ও পাঙ্গুলি। যে নাম বালিকার মুখে তাহারা কখনো শুনে নাই, কিন্তু তাহার পদশব্দ তাহারা চিনিত— তাহার কথাহীন একটা করুণ সুর ছিল, তাহার মর্ম তাহারা ভাষায় অপেক্ষা সহজে বুঝিত। সুভা কখন তাহাদের আদর করিতেছে, কখন ভর্ৎসনা করিতেছে, কখন মিনতি করিতেছে, তাহা তাহারা মানুষের অপেক্ষা ভালো বুঝিতে পারিত।

সুভা গোয়ালে ঢুকিয়া দুই বাহুর দ্বারা সর্বশীর গ্রীবা বেষ্টন করিয়া তাহার কানের কাছে আপনার গন্ডদেশ ঘর্ষণ করিত এবং পাঙ্গুলি স্নিগ্ধদৃষ্টিতে তাহার প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া তাহার গা চাটিত। বালিকা দিনের মধ্যে নিয়মিত তিনবার করিয়া গোয়ালঘরে যাইত, তাহা ছাড়া অনিয়মিত আগমনও ছিল; গৃহে যেদিন কোনো কঠিন কথাশুনিত, সেদিন সে অসময়ে তাহার এই মূক বন্ধু দুটির কাছে আসিত — তাহার সহিষ্ণুতাপূর্ণ বিষাদশান্ত দৃষ্টিপাত হইতে তাহার কী একটা অন্ধ অনুমানশক্তির দ্বারা বালিকার মর্মবেদনা যেন বুঝিতে পারিত, এবং সুভার গা ঘেঁষিয়া আসিয়া অল্পে অল্পে তাহার বাহুতে শিং ঘষিয়া ঘষিয়া তাহাকে নির্বাক ব্যাকুলতার সহিত সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করিত।

ইহারা ছাড়া ছাগল এবং বিড়ালশাবকও ছিল, কিন্তু তাহাদের সহিত সুভার এরূপ সমকক্ষভাবের মৈত্রী ছিল না, তথাপি তাহারা যথেষ্ট আনুগত্য প্রকাশ করিত। বিড়ালশিশুটি দিনে এবং রাত্রে যখন-তখন সুভার গরম কোলটি নিঃসংকোচে অধিকার করিয়া সুখনিদ্রার আয়োজন করিত এবং সুভা তাহার গ্রীবা ও পৃষ্ঠে কোমল অঙ্গুলি বুলাইয়া দিলে তাহার নিদ্রাকর্ষণের বিশেষ সহায়তা হয়, ইঙ্গিতে এরূপ অভিপ্রায়ও প্রকাশ করিত।

৩

উন্নত শ্রেণির জীবের মধ্যে সুভার আরও একটি সঙ্গী জুটিয়াছিল কিন্তু তাহার সহিত বালিকার ঠিক কীরূপ সম্পর্ক ছিল তাহা নির্ণয় করা কঠিন, কারণ সে ভাষাবিশিষ্ট জীব; সুতরাং উভয়ের মধ্যে সমভাষা ছিল না।

গোঁসাইদের ছোটো ছেলেটি — তাহার নাম প্রতাপ। লোকটি নিতান্ত অকর্মণ্য। সে যে কাজকর্ম করিয়া সংসারের উন্নতি করিতে যত্ন করিবে, বহু চেষ্টার পর বাপমা সে আশা ত্যাগ করিয়াছেন। অকর্মণ্য লোকের একটা সুবিধা এই যে, আত্মীয় লোকেরা তাহাদের উপর বিরক্ত হয় বটে, কিন্তু প্রায় তাহারা নিঃসম্পর্ক লোকদের প্রিয়পাত্র হয় — কারণ, কোনো কার্যে আবদ্ধ না থাকাতে তাহারা সরকারি সম্পত্তি হইয়া দাঁড়ায়। শহরে যেমন এক-আধটা গৃহসম্পর্কহীন সরকারি বাগান থাকা আবশ্যক, তেমনি গ্রামে দুই-চারিটা অকর্মণ্য সরকারি লোক থাকা বিশেষ প্রয়োজন। কাজে-কর্মে আমোদ-অবসরে যেখানে একটা লোক কম পড়ে সেখানেই তাহাদিগকে হাতের কাছে পাওয়া যায়।

প্রতাপের প্রধান শখ— ছিপ ফেলিয়া মাছ ধরা। ইহাতে অনেকটা সময় সহজে কাটানো যায়। অপরাহ্নে নদীতীরে ইহাকে প্রায় এই কাজে নিযুক্ত দেখা যাইত। এবং এই উপলক্ষ্যে সুভার সহিত তাহার প্রায় সাক্ষাৎ হইত। যে-কোনো কাজেই নিযুক্ত থাক, একটা সঙ্গী পাইলে প্রতাপ থাকে ভালো। মাছ ধরার সময় বাক্যহীন সঙ্গীই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ — এইজন্য প্রতাপ সুভার মর্যাদা বুঝিত। এইজন্য, সকলেই সুভাকে সুভা বলিত, প্রতাপ আর-একটু অতিরিক্ত আদর সংযোগ করিয়া সুভাকে 'সু' বলিয়া ডাকিত।

সুভা তেতুঁলতলায় বসিয়া থাকিত এবং প্রতাপ অনতিদূরে মাটিতে ছিপ ফেলিয়া জলের দিকে চাহিয়া থাকিত। প্রতাপের একটি করিয়া পান বরাদ্দ ছিল, সুভা তাহা নিজে সাজিয়া আনিত। এবং বোধ করি অনেকক্ষণ বসিয়া চাহিয়া চাহিয়া ইচ্ছা করিত, প্রতাপের কোনো একটা বিশেষ সাহায্য করিতে, একটা-কোনো কাজে লাগিতে, কোনোমতে জানাইয়া দিতে যে এই পৃথিবীতে সেও একজন কম প্রয়োজনীয় লোক নহে। কিন্তু কিছুই করিবার ছিল না। তখন সে মনে মনে বিধাতার কাছে অলৌকিক ক্ষমতা প্রার্থনা করিত — মন্ত্রবলে সহসা এমন একটা আশ্চর্য কাণ্ড ঘটাইতে ইচ্ছা করিত যাহা দেখিয়া প্রতাপ আশ্চর্য হইয়া যাইত, বলিত, 'তাই তো, আমাদের সুভির যে এত ক্ষমতা তাহা তো জানিতাম না।'

মনে করো, সুভা যদি জলকুমারী হইত; আস্তে আস্তে জল হইতে উঠিয়া একটা সাপের মাথার মণি ঘাটে রাখিয়া যাইত, প্রতাপ তাহার তুচ্ছ মাছধরা রাখিয়া সেই মানিক লইয়া জলে ডুব মারিত; এবং পাতালে গিয়া দেখিত, রূপার অট্টালিকায় সোনার পালঙ্কে — কে বসিয়া? — আমাদের বাণীকণ্ঠের ঘরের সেই বোবা মেয়ে সে — আমাদের সু সেই মণিদীপ্ত গভীর নিস্তব্ধ পাতালপুরীর একমাত্র রাজকন্যা।

তাহা কি হইতে পারিত না, তাহা কি এতই অসম্ভব। আসলে কিছুই অসম্ভব নয়, কিন্তু তবুও সু প্রজাশূন্য পাতালঘরের রাজবংশে না জন্মিয়া বাণীকণ্ঠের ঘরে আসিয়া জন্মিয়াছে এবং গোঁসাইদের ছেলে প্রতাপকে কিছুতেই আশ্চর্য করিতে পারিতেছে না।

৪

সুভার বয়স ক্রমেই বাড়িয়া উঠিতেছে। ক্রমে সে যেন আপনাকে অনুভব করিতে পারিতেছে। যেন কোনো একটা পূর্ণিমাতিথিতে কোনো একটা সমুদ্র হইতে একটা জোয়ারের স্রোত আসিয়া তাহার অন্তরাত্মাকে এক নতুন অনির্বচনীয় চেতনাশক্তিতে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতেছে। সে আপনাকে আপনি দেখিতেছে, ভাবিতেছে, প্রশ্ন করিতেছে এবং বুঝিতে পারিতেছে না।

গভীর পূর্ণিমারাত্রে সে এক-একদিন শয়নগৃহের দ্বার খুলিয়া ভয়ে ভয়ে মুখ বাড়াইয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া দেখে, পূর্ণিমা-প্রকৃতিও সুভার মতো একাকিনী সুপ্ত জগতের উপর জাগিয়া বসিয়া — যৌবনের রহস্যে পুলকে বিষাদে অসীম নির্জনতার একেবারে শেষ সীমা পর্যন্ত, এমন কী তাহা অতিক্রম করিয়াও থম্‌থম্‌ করিতেছে, একটি কথা কহিতে পারিতেছে না। এই নিস্তব্ধ ব্যাকুল প্রকৃতির প্রান্তে একটি নিস্তব্ধ ব্যাকুল বালিকা দাঁড়াইয়া।

এদিকে কন্যাভারগ্রস্ত পিতামাতা চিন্তিত হইয়া উঠিয়াছেন। লোকেও নিন্দা আরম্ভ করিয়াছে। এমন কী একঘরে করিবে এমন জনরবও শুনা যায়। বাণীকণ্ঠের সচ্ছল অবস্থা, দুইবেলাই মাছ ভাত খায়, এজন্য তাহার শত্রু ছিল।

স্ত্রীপুরুষে বিস্তর পরামর্শ হইল। কিছুদিনের মতো বাণী বিদেশে গেল।

অবশেষে ফিরিয়া আসিয়া কহিল, ‘চলো, কলিকাতায় চলো।’

বিদেশযাত্রার উদ্‌যোগ হইতে লাগিল। কুয়াশাঢাকা প্রভাতের মতো সুভার সমস্ত হৃদয় অশ্রুবাষ্পে একেবারে ভরিয়া গেল। একটা অনির্দিষ্ট আশঙ্কাবশে সে কিছুদিন হইতে ক্রমাগত নির্বাক জন্তুর মতো তাহার বাপমায়ের সঙ্গে সঙ্গে ফিরিত — ডাগর চক্ষু মেলিয়া তাঁহাদের মুখের দিকে চাহিয়া কী একটা বুঝিতে চেষ্টা করিত, কিন্তু তাঁহার কিছু বুঝাইয়া বলিতেন না।

ইতিমধ্যে একদিন অপরাহ্নে জলে ছিপ ফেলিয়া প্রতাপ হাসিয়া কহিল, ‘কী রে সু, তোর নাকি বর পাওয়া গেছে, তুই বিয়ে করতে যাচ্ছিস? দেখিস, আমাদের ভুলিস্‌নে।’ বলিয়া আবার মাছের দিকে মনোযোগ করিল।

মর্মবিদ্ধ হরিণী ব্যাধের দিকে যেমন করিয়া তাকায়, নীরবে বলিতে থাকে ‘আমি তোমার কাছে কী দোষ করিয়াছিলাম’, সুভা তেমনি করিয়া প্রতাপের দিকে চাহিল; সেদিন গাছের তলায় আর বসিল না; বাণীকণ্ঠ নিদ্রা হইতে উঠিয়া শয়নগৃহে তামাক খাইতেছিলেন, সুভা তাঁহার পায়ের কাছে বসিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া কাঁদিতে লাগিল। অবশেষে সান্ত্বনা দিতে গিয়া বাণীকণ্ঠের শুষ্ক কপোলে অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

কাল কালিকাতায় যাইবার দিন স্থির হইয়াছে। সুভা গোয়ালঘরে তাহার বাল্যসখীদের কাছে বিদায় লইতে গেল, তাহাদিগকে স্বহস্তে খাওয়াইয়া, গলা ধরিয়া একবার দুই চোখে যত পারে কথা ভরিয়া তাহাদের মুখের দিকে চাহিল — দুই নেত্রপল্লব হইতে টপ্‌ টপ্‌ করিয়া অশ্রুজল পড়িতে লাগিল।

সেদিন শুক্লদ্বাদশীর রাত্রি। সুভা শয়নগৃহ হইতে বাহির হইয়া তাহার সেই চিরপরিচিত নদীতটে শষ্পশয্যায় লুটাইয়া পড়িল — যেন ধরণীকে, এই প্রকাণ্ড মূক মানবমাতাকে দুই বাহুতে ধরিয়া বলিতে চাহে, 'তুমি আমাকে যাইতে দিয়ো না মা, আমার মতো দুটি বাহু বাড়াইয়া তুমিও আমাকে ধরিয়া রাখো।'

কলিকাতার এক বাসায় সুভার মা একদিন সুভাকে খুব করিয়া সাজাইয়া দিলেন। আঁটিয়া চুল বাঁধিয়া খোঁপায় জরির ফিতা দিয়া, অলংকারে আচ্ছন্ন করিয়া তাহার স্বাভাবিক শ্রী যথাসাধ্য বিলুপ্ত করিয়া দিলেন। সুভার দুই চক্ষু দিয়া অশ্রু পড়িতেছে, পাছে চোখ ফুলিয়া খারাপ দেখিতে হয়, এজন্য তাহার মাতা তাহাকে বিস্তর ভর্ৎসনা করিলেন, কিন্তু অশ্রুজল ভর্ৎসনা মানিল না।

বন্ধু সঙ্গে বর কনে দেখিতে আসিলেন — কন্যার মাবাপ চিন্তিত, শঙ্কিত, শশব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, যেন দেবতা স্বয়ং নিজের বলির পশু বাছিয়া লইতে আসিয়াছেন। মা নেপথ্য হইতে বিস্তর তর্জন গর্জন শাসন করিয়া বালিকার অশ্রুস্রোত বাড়াইয়া পরীক্ষকের সম্মুখে পাঠাইলেন।

পরীক্ষক অনেকক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, 'মন্দ নহে।'

বিশেষত বালিকার ক্রন্দন দেখিয়া বুঝিলেন, ইহার হৃদয় আছে এবং হিসাব করিয়া দেখিলেন, যে-হৃদয় আজ বাপমায়ের বিচ্ছেদসম্ভাবনায় ব্যথিত হইয়া উঠিয়াছে সেই হৃদয় আজ বাদে কাল আমারই ব্যবহারে লাগিতে পারিবে। শুক্তির মুক্তার ন্যায় বালিকার অশ্রুজল কেবল বালিকার মূল্য বাড়াইয়া দিল, তাহার হইয়া আর কোনো কথা বলিল না।

পঞ্জিকা মিলাইয়া খুব একটা শুভলগ্নে বিবাহ হইয়া গেল।

বোবা মেয়েকে পরের হস্তে সমর্পণ করিয়া বাপমা দেশে চলিয়া গেল — তাহাদের জ্ঞাতি ও পরকাল রক্ষা হইল।

বর পশ্চিমে কাজ করে। বিবাহের অনতিবিলম্বে স্ত্রীকে পশ্চিমে লইয়া গেল। সপ্তাহখানেকের মধ্যে সকলেই বুঝিল, নববধূ বোবা। তা কেহ বুঝিল না, সেটা তাহার দোষ নহে। সে কাহাকেও প্রতারণা করে নাই। তাহার দুটি চক্ষু সকল কথাই বলিয়াছিল, কিন্তু তাহা কেহ বুঝিতে পারে নাই। সে চারিদিকে চায়— ভাষা পায় না, যাহারা বোবার ভাষা বুঝিত সেই আজন্মপরিচিত মুখগুলি দেখিতে পায় না — বালিকার চিরনীরব হৃদয়ের মধ্যে একটা অসীম অব্যক্ত ক্রন্দন বাজিতে লাগিল— অন্তর্যামী ছাড়া আর কেহ তাহা শুনিতে পাইল না।

এবার তাহার স্বামী চক্ষু এবং কর্ণেন্দ্রিয়ের দ্বারা পরীক্ষা করিয়া এক ভাষাবিশিষ্ট কন্যা বিবাহ করিয়া আনিল।

বাংলা-খ পাঠক্রমের পূর্ণাঙ্গ পাঠ্যসূচি

কবিতা

১.	মাইকেল মধুসূদন দত্ত	...	কপোতাক্ষ নদ
২.	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	সবলা, আকাশভরা সূর্যতারা, বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি
৩.	কাজী নজরুল ইসলাম	...	কান্ডারি হুঁশিয়ার
৪.	জীবনানন্দ দাশ	...	অদ্ভুত আঁধার এক, ঘাস
৫.	প্রেমেন্দ্র মিত্র	...	সাগর থেকে ফেরা
৬.	অন্নদাশংকর রায়	...	কাজ
৭.	সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়	...	জননী জন্মভূমি
৮.	নবনীতা দেবসেন	...	মেয়েটা
৯.	বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	...	মানুষের নামে
১০.	মৃদুল দাশগুপ্ত	...	লিখছি আমি
১১.	জয় গোস্বামী	...	অস্ত্রের বিরুদ্ধে গান

আন্তর্জাতিক কবিতা

১.	ডেভিড দিয়োপ	...	আফ্রিকা (আমার মাকে)
২.	জাক প্রেভের	...	পারিবারিক

ভারতীয় কবিতা

১.	হীরেন ভট্টাচার্য	...	পৃথিবী আমার কবিতা
২.	জগন্নাথপ্রসাদ দাস	...	কালাহান্ডি

গল্প

১.	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	অপরিচিতা, স্ত্রীর পত্র
২.	রমেশচন্দ্র সেন	...	শাদা ঘোড়া
৩.	বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	...	গল্প নয়
৪.	বনফুল	...	পৌরাণিক-আধুনিক
৫.	শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়	...	অবিকল
৬.	আশাপূর্ণা দেবী	...	ঈর্ষা
৭.	সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়	...	নাম নেই
৮.	শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়	...	দেখা হবে

প্রবন্ধ

১.	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	আত্মপরিচয়, সত্য ও সুন্দর, সম্ভাষণ
২.	সুভাষ মুখোপাধ্যায়	...	পাতালপুরীর রাজ্যে
৩.	শঙ্খ ঘোষ	...	সম্প্রদায়ের ভাষা
৪.	বুদ্ধদেব বসু	...	আড্ডা
৫.	সত্যজিৎ রায়	...	ডিটেল সম্বন্ধে দু-একটি কথা
৬.	প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত	...	নানারকম নানাসাহেব
৭.	শিবশংকর মিত্র	...	এক যে ছিল সুন্দরবন
৮.	সত্যেন্দ্রনাথ বসু	...	আচার্য প্রফুলচন্দ্র
৯.	শ্রীপান্থ	...	মুনশিজি
১০.	চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়	...	মুদ্রণ ও সংবাদপত্র
১১.	সৈয়দ মুজতবা আলী	...	বই কেনা
১২.	সুকুমার রায়	...	সমুদ্র বন্ধন

আন্তর্জাতিক গল্প

১.	জুল ক্লারেতি	...	বুমবুম
২.	আমা আটা আইডু	...	মুকুল ফুটল দেরিতে

ভারতীয় গল্প

১.	মুনসি প্রেমচন্দ	...	নেমকের দারোগা
২.	অশোক মিত্র	...	বাঘ

পূর্ণাঙ্গ সহায়ক গ্রন্থ

রবীন্দ্রনাথের গল্প

১. দেনাপাওনা
২. গুপ্তধন
৩. খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন
৪. কাবুলিওয়ালা
৫. অনধিকার প্রবেশ
৬. ইচ্ছাপূরণ
৭. দর্পহরণ
৮. ফেল
৯. চিত্রকর
১০. সুভা